বিবিধ প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় ভাগ।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

চুঁচুড়া
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।
মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

—*—

প্রথম অধ্যায়।

পুরাবৃত্তের কথা—

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বিবিধ প্রবন্ধ।

উত্তরচরিত।

(১)

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সমালোচনা এক্ষণে প্রায় হয় না। অনেক দিন হইল, বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিতের এক উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অদ্য আমরা তাহাই অবলম্বস্বরূপ করিয়া উত্তরচরিত বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ অভিমতি প্রকাশ করিব।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিষমপদব্যাখ্যাসমেত উত্তরচরিতের এক সংস্করণ করেন। তিনি ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্ব শক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত নহে।" কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তকের এক স্থলে (৩য় সংস্করণ ৬৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছিলেন, "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নামনির্দ্দেশ হওয়া উচিত।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুই সময়ের এই দুই প্রকার অভিমতি দেখিয়া আমরা বুঝিলাম যে,—

কালান্তরাদ্বা বয়সোঽন্তরাদ্বা
প্রায়ো ভবেদ্ ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

উত্তর চরিত বৃহৎ পুস্তক, তাহার আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে

তাহা অতি বৃহৎ হইয়া উঠিবে। এই জন্য আমরা পুস্তকের তৃতীয় অঙ্কটী মাত্র সমালোচ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। ঐ অঙ্কটীকেই গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের বোধে—

ভবভূতেস্তু সর্ব্বস্বমুত্তরং চরিতং কবেঃ,
তত্রাপি চ তৃতীয়োঽঙ্কশ্ছায়া যত্র প্রদর্শিতা॥

তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে একটী বিষ্কম্ভক * আছে। তাহাতে তমসা ও মুরলা নামে দুই নদী প্রবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করে। মুরলা কহে, ভগবতী লোপামুদ্রা রামচন্দ্রের অবস্থা অনুভব করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি ভাবিয়াছেন,—

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশোরামস্য করুণোরসঃ॥

সীতা বিরহজনিত রামের শোক পুটপাকের ন্যায় হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, অথচ তাঁহার একান্ত গম্ভীর প্রকৃতি নিবন্ধন তদীয় অন্তঃকরণের গূঢ় কঠিন বেদনা বাহিরে কেহই কিছু জানিতে পারিতেছে না। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন, তখন পথিমধ্যে সীতা-সহবাসবিশ্রম্ভসাক্ষী পঞ্চবটীর সেই সেই প্রদেশ সকল অবশ্যই তাঁহার নেত্রগোচর হইবে, তাহা হইলে রাম যতই ধীর ও গম্ভীর হউন, সে অবস্থায় কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না, পদে পদে তাঁহার বিপদ আশঙ্কনীয় হইবে। অতএব তিনি গোদাবরীকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—

বীচিবাতৈঃ শীকরক্ষোদশীতৈ
রাকর্ষদ্ভিঃ পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধান্।

---

* বৃত্তবর্ত্তিষ্যমানানাংকথাংশানাংনিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ॥

অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্তৃত ঘটনার সংক্ষেপে বর্ণন যেখানে হয়, তাহাকে বিষ্কম্ভক কহে।

মোহে মোহে রামভদ্রস্য জীবং
স্বৈরং স্বৈরং প্রেষিতৈস্তর্পয়েতি ॥

হে গোদাবরি! তত্তৎসময়ে রামচন্দ্রের মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে তুমি জলশীকর শীতল কমলকিঞ্জল্কসুরভি মন্দ মন্দ পরিচালিত তরঙ্গপবন দ্বারা তাঁহার মোহের অপনয়ন করিও। মুরলার এই কথা শুনিয়া তমসা কহিল, ভগবতী লোপামুদ্রার স্নেহ যেরূপ, তাহার অনুরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছে, কিন্তু আজি সে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতেছে না; কারণ রামচন্দ্রের মৌলিক যে সঞ্জীবনোপায়, তাহা ছায়াময়ীমূর্ত্তিস্বরূপে অদ্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

পাঠকগণ জানিবেন যে, সীতার ঐ ছায়াময়ী মূর্ত্তি এই তৃতীয় অঙ্কের প্রাণ। এই অঙ্কে ছায়াময়ী সীতা তমসার সহিত, এবং রাম বনদেবী বাসন্তীর সহিত কথোপকথন করেন। সীতা, তিন জনকেই দেখিতে পান, কিন্তু তমসা ভিন্ন স্বয়ং আর কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হয়েন না। রাম নিরন্তর সীতাচিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। তিনি সীতাসহবাস বিশ্রম্ভ-সাক্ষী পদার্থসমূহকে চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতার শরীর স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন; এমন কি; এক সময়ে সীতার হস্ত ধারণ করিয়া বাসন্তীর হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অথচ কবির ঐ সীতা ছায়াময়ী।

এ স্থলে লোকলোচনের অদৃশ্যা রামের সহবনবিহারিণী ও আশ্বাস-প্রদায়িনী ঐ ছায়াময়ী মূর্ত্তি কিরূপ পদার্থ, তাহা বিচার্য্য বিষয় বলিয়া সহজেই উপলব্ধ হয়। অতএব তাহা বুঝিবার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাউক। ছায়াময়ী সীতামূর্ত্তি যে একটী অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যসৃষ্টি, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ওকথা বলায় অর্থবোধের কিছু আধিক্য হয় না। উহা কবির কল্পনা একথা বলিয়াও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকল কাব্যেরই সারাংশ কবির কল্পিত বস্তু বই আর কিছুই নহে; এবং কোন কবির কোন কল্পিত বস্তু কোন কালে বাস্তব উপাদানের বিনাভাবে সংঘটিত

হয় নাই—হইতেও পারে না। অতএব ভবভূতির ঐ ছায়াময়ী সীতার প্রকৃত উপাদান কি, তাহা অনুসন্ধেয় হইতেছে।

পাঠকবর্গ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, রামের এবং ছায়াময়ী সীতার পঞ্চবটী প্রবেশ এবং তথা হইতে উভয়ের তিরোধান একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

যেই মুরলা বলিলেন,

"রামভদ্রোঽপ্যাগত এব তর্কয়ামি।"

রামভদ্রও আগতপ্রায় বোধ হইতেছে। অমনি তমসা উত্তর করিলেন—

পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরম্
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথৈব বনমেতি জানকী॥

যেন শরীরধারিণী বিরহব্যথা এবং করুণ রসের মূর্ত্তিস্বরূপা জানকী বনে আসিতেছেন। বিরহে তাঁহার কপোল পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে; এবং কবরীবন্ধন আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে।

মুরলাও দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—

"ইয়ংহি সা
কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনম্
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণোদীর্ঘশোকঃ
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদিজইব ঘর্ম্মঃ কেতকী গর্ভপত্রম্॥

"তিনিই বটেন, আহা! শরৎকালীন উত্তাপ কেতকী পুষ্পের গর্ভস্থ পত্রদলকে যেমন ম্লান করে, সেইরূপ হৃদয়কুসুমশোষণকারী নিদারুণ দীর্ঘ শোক বন্ধন হইতে ছিন্ন নবকিসলয়ের ন্যায় ইহাঁর পাণ্ডুবর্ণ শরীরকে গ্লানিযুক্ত করিতেছে।

আবার অঙ্কের শেষে তমসা এবং বাসন্তী রাম এবং সীতার পঞ্চবটী

পরিত্যাগ সময়ে নিম্নলিখিত একই শ্লোকদ্বারা উভয়কে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বিদায় করিতেছেন।

অবনিরমরসিন্ধুঃ সার্দ্ধমস্মদ্বিধাভিঃ
স চ কুলপতিরাদ্যশ্ছন্দসাং যঃ প্রয়োক্তা।
স চ মুনিরনুযাতারুন্ধতীকোবশিষ্ঠ-
স্ত্বয়ি বিতরতু ভদ্রং ভূয়সে মঙ্গলায়॥

পৃথিবী, সুরনদী এবং অস্মদাদির ন্যায় অপরাপরে, এবং যিনি ছন্দের প্রবর্ত্তক, সেই আদ্যকুলপতি বাল্মীকি ও সেই সারুন্ধতীক বশিষ্ঠ তোমার প্রভূত মঙ্গল করুন্।

---

(২)

ভবভূতির ছায়াময়ী সীতা কিরূপ পদার্থ, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে ছায়াময়ীর এবং রামের পঞ্চবটী প্রবেশ তথায় অবস্থান এবং সেখান হইতে যাওয়া যে একই সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল, কবি তাহার স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন।

তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত প্রাথমিক কার্য্যকলাপেরও সংঘটনকাল সম্বন্ধে অপর একটী বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। সীতা পঞ্চবটী প্রবেশমাত্রে বনদেবী বাসন্তীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন, যথা—

প্রমাদঃ প্রমাদঃ
সীতাদেব্যাঃ স্বকর কলিতৈঃ শল্লকীপল্লবাগ্রৈ
রগ্রে লোলঃ করিকরভকো যঃ পুরা পোষিতোঽভূৎ
বধ্বা সার্দ্ধং পয়সি বিহরন সোঽয়মন্যেন দর্পাৎ
উদ্দামেন দ্বিরদপতিনা সন্নিপত্যাভিযুক্তঃ॥

বিপদ্ বিপদ্!

সীতাদেবীর স্বকরাবচিত নব শল্লকীপল্লবাগ্রদ্বারা যে করি-শাবক প্রতি-

পালিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার হস্ত হইতে সেই পল্লব গ্রহণার্থ যে লোলুপ হইত সেই করি-শাবক বধূর সহিত জল-কেলি করিতেছে, এমন সময়ে অন্য এক উচ্ছৃঙ্খল দ্বিরদপতিদ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াছে।

—রামও পঞ্চবটী প্রবেশমাত্র যে মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই মোহের অপগমে অবিকল ঐ স্বর ও ঐ কথা অর্থাৎ "প্রমাদঃ প্রমাদঃ—"সীতা-দেব্যাঃ" ইত্যাদি শুনিতে পাইলেন।

যৎকিঞ্চিৎমাত্র অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, দুই বিভিন্ন সময়ে বাসন্তী ঐ কথাগুলি কহিয়াছিলেন, এরূপ ভাব ব্যক্ত করা কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ ঐ প্রকার উক্তি নিতান্ত উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহের ব্যঞ্জক। ঐরূপ কথা স্বভাবতঃই অনন্তরভাবে উপর্য্যুপরি উচ্চরিত হইয়া থাকে। কেহ কাহাকেও মারিতেছে বা মারিতে যাইতেছে দেখিয়া উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ নিবন্ধন লোকে "মারিলে রে মারিলে রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এক বার মাত্র "মারিলে রে" বলিয়া, তাহার দণ্ডৈক পরে পুনর্ব্বার "মারিলে রে" বলে না। অতএব বাসন্তীর "প্রমাদঃ প্রমাদঃ সীতাদেব্যাঃ" প্রভৃতি নাটকের দুই স্থানে যে দুই বারের উক্তি আছে, তাহার মধ্যে কালাত্যয় হইয়াছিল, ইহা মনে করা ভ্রম। কবি নিজেও পাছে পাঠকের ঐ ভ্রম হয়, তাহার সম্যক্ প্রতিবিধান করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে, সীতা পঞ্চবটীর যে স্থানে, রামও পঞ্চবটীর সেই স্থানে ছিলেন। সীতা রামের কথা শুনিতে এবং রামকে দেখিতে পাইতেছিলেন। আবার তাহা অপেক্ষাও যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত কবি সীতাদেবীর মুখ দিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, বাসন্তীর ঐ দুই বারের উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র কালাতিপাত হয় নাই—প্রত্যুত উহা এক-বারেরই উক্তি, এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। সীতা যখন বাসন্তীর উক্তি প্রথম শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন সেই পুত্রবৎ পালিত করি-শাবকের প্রতি বিপৎপাত আশঙ্কায় একান্ত বিহ্বলা হইয়া বলেন—

অজ্জউত্ত পরিত্তাহি পরিত্তাহি মম তং পুত্তঅং। হদ্ধী হদ্ধী তাইং এব্ব

চিরপরিচিদাইং অক্খরাইং পঞ্চবটী দংসণেণ পুণো বি মং মন্দভাইণিং অণুরুন্ধন্তি। হা অজ্জউত্ত। ইতি মূর্চ্ছতি।

আর্য্যপুত্র আমার সেই পুত্রকে পরিত্রাণ করুন্ পরিত্রাণ করুন্। হা ধিক্ হা ধিক্ অদ্য পঞ্চবটীদর্শনে সেই চিরপরিচিত কথাগুলি পুনরায় মন্দভাগিনী আমার মুখে আসিতেছে। হা আর্য্যপুত্র!

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

আবার বাসন্তীর দ্বিতীয়বৎ প্রতীয়মান ঐ উক্তির পর বলিলেন,—

কো দানিং অহিউজ্জিস্সদি

কে এক্ষণে রক্ষা করিবে?

এই দ্বিতীয় উক্তি যে প্রথম উক্তিরই উপসংহারমাত্র তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইবার নিমিত্ত যত্ন পাইতে হইবে না। কারণ এ বারে রাম সাক্ষাৎ রহিয়াছেন এবং তিনিও করুণা ও ঔৎসুক্য সহকারে বলিয়াছেন—

"কিং তস্য বৎসস্য"

বাছা কি হইয়াছে?

সুতরাং কে এক্ষণে রক্ষা করিবে এরূপ কথা প্রথম উক্তির উপসংহার না হইলে সঙ্গতই হইতে পারে না। বাস্তবিক সীতা পূর্ব্বে হা আর্য্যপুত্র! বলিয়া কাতর সম্বোধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কে আর রক্ষা করিবে বলিয়া বাক্য সমাপন করিয়াছেন।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সীতাদেবীর উল্লিখিত দুই উক্তির মধ্যে কালাত্যয় হয় নাই। অপিচ উহারই মধ্যে বহুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সীতা হা আর্য্যপুত্র বলিয়া মূর্চ্ছিত হইল, তমসা-কর্তৃক আশ্বস্তা হইয়া যেই রামের কণ্ঠস্বর শুনিলেন, অমনি ঐ স্বর যে কাহার তাহা চিনিয়া বলিলেন,—

অম্মহে জলভরিদমেহথণিদগম্ভীর মংসলো কুদোণু এসা ভারদীণিগ্ঘোসো ভরিজ্জমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তিউস্সাবেদি।

জলপূর্ণ মেঘশব্দের ন্যায় গম্ভীর এবং মাংসল এই বাক্যধ্বনিতে আমার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইল, এবং মন্দভাগিনী আমাকে ঝটিতি উচ্ছ্বাসিত করিল।

তমসা বলিলেন —

অয়ি বৎসে!

কিমব্যক্তেঽসি নিনদে কুতস্ত্যেঽপি ত্বমীদৃশী।

স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতং স্থিতা॥

যেমন মেঘের শব্দে ময়ূরী উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ কোথায় হইতে আগত এই অব্যক্ত শব্দে কেন তুমি এরূপ চকিত এবং উৎকণ্ঠিত হইলে?

সীতা কহিলেন,—

ভঅবদি কিং ভণাসি অপরিপ্ফুড়ংত্তি ম এউণ সরসঞ্জোএণ পচ্চভিআণিদং অজ্জউত্তো এব্ব বাহরদি।

ভগবতি! ইহা কি অপরিস্ফুট? আমি কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছি, আর্য্যপুত্রই কথা কহিতেছেন।

এ স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রণয়ীর কণ্ঠস্বর এবং পদশব্দাদি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার সকল অন্যের অপরিচিত হইলেও ঘনিষ্ঠহৃদয়গ্রাহিতানিবন্ধন যে প্রণয়িনীর অতিপরিচিত হইয়া থাকে, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। আমরা এস্থলে ভবভূতির মানবচিত্তাভিজ্ঞতার বিষয় কিছু বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয়, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সীতা অত স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া যদি "ভঅবদি কিংভণাসি অপরিপ্ফুড়ং ত্তি" ভগবতি! কি বলিলে ইহা অপরিস্ফুট? এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অবনতমুখে থাকিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত—তাঁহাদিগের মতে অধিকতর রমণীয়ই হইত। কারণ

তমসা পরেই বলিতেছেন,

"শ্রূয়তে তপস্যতঃ শূদ্রস্য দণ্ডধারণার্থমৈক্ষ্বাকো রাজা জনস্থানমাগতইতি।"

শুনিয়াছি তপস্যাকারী শূদ্রকের প্রতি দণ্ডদানার্থ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা জনস্থানে আগত হইয়াছেন।

এস্থলে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য এই, তমসার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বলিয়া রামের নির্দ্দেশ করার কারণ কি হইতে পারে? যাহার নাম করিলে কাহারও শোক দুঃখ প্রভৃতি মনোবিকার প্রতীয়মান হইয়া উঠে, তাহার সমক্ষে লোকে স্পষ্ট করিয়া তদীয় নাম উচ্চারণ করে না, প্রয়োজন হইলে যথাসম্ভব ঘুরাইয়াই বলিয়া থাকে। তমসা সেই জন্যই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বলিয়া রামের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা যদি পূর্ব্বেই আত্মীয়তা-সূচক "আর্য্যপুত্র" বলিয়া রামের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে তমসার ঐরূপ ঘোর ফের করিয়া বলা সুসঙ্গত হয় না। তাঁহারা এ কথাও বলিয়া থাকেন। উহার পরেই সীতাও বলিয়াছিলেন —

"দিট্‌ঠিআ অপরিহীণরাঅধর্ম্মো কৃখু সো রাআ।"

ভাগ্যক্রমে সেই রাজার রাজধর্ম্মপালনের ব্যতিক্রম হয় নাই।

তাঁহাদিগের বিবেচনায় এ স্থলে রামকে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করা অবশ্যই আন্তরিক অভিমানব্যঞ্জক; সুতরাং প্রথমে তাঁহার প্রতি আর্য্যপুত্র সম্বোধন অসঙ্গত। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় কবির রচনাই সমীচীন হইয়াছে। সীতার মনোমধ্যে যতই অভিমান থাকুক, রামের প্রতি সে অভিমান কখনই স্বতঃ ব্যক্ত হয় না। অন্যের কথায় তাদৃশ অভিমানের হেতু উদ্বোধ ব্যতিরেকে তিনি নিয়তই রামপ্রেমমুগ্ধা হইয়া থাকেন। অতএব যখন প্রথমে রামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাকে চিনিলেন, অমনি প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া ফেলিলেন। যাহাদের ওরূপ কোমলপ্রকৃতি অপরে তাহাদিগের হইয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই জন্যই তমসার অ-প্রণয়ব্যঞ্জক 'ঐক্ষ্বাকো রাজা' এবং তাহার পর সীতার নিজের উক্তিতে 'রাআ'। ভবভূতি সীতার প্রকৃতি কেমন সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া-ছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সপ্তম অঙ্কে সীতার ঐ ভাব অধিকতর সুব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অরণ্যে পরিত্যক্তা

এবং প্রসববেদনায় কাতরা হইয়া ভাগীরথীজলে শরীর বিসর্জ্জন করিলে পৃথিবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভাগীরথীকে বলেন,—

যুক্তমেতদ্ বা রামভদ্রস্থ
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে বালেন পীড়িতঃ।
নাহং ন জনকোনাগ্নির্নাম্নুবৃত্তির্ন সন্ততিঃ॥

ইহা কি রামভদ্রের পক্ষে উচিত কার্য্য হইয়াছে?

বাল্যে পাণিপীড়ন, আমি, জনক, অগ্নি, চিরানুবৃত্তি এবং সন্ততি এ সকলের কিছুই প্রমাণ হইল না?

সীতা ঐ অবস্থাতেও রামের নাম শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—

হা অজ্জউত্তং সুমরাবিদম্হি। হা! আর্য্যপুত্রকে মনে পড়িল।

সর্ব্বংসহা পৃথিবীও কন্যার এরূপ অভিমান-শূন্যতা সহিতে পারিলেন না। ধমকাইয়া উঠিলেন,—

আঃ কস্তবার্য্যপুত্রঃ—
আঃ কে তোর আর্য্যপুত্র?
সীতা অমনি জড়সড়—বলিলেন,—
জহ বা অম্বা ভণাদি
মা যা বল!

এও সেই সীতা—রামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর্য্যপুত্র না বলিয়া কি থাকিতে পারে? এবং তমসার মুখে "ঐক্ষ্বাকো রাজা" শুনিবার পর "রাআ" বলিবে না ত আর কি বলিবে? এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অনন্তর রাম প্রিয়াসহচর হইয়া যে পঞ্চবটীতে পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, তথাকার বৃক্ষ, মৃগ, গিরিনির্ঝর, কন্দর প্রভৃতি দর্শনে উদ্দীপিতবিরহশোক হইয়া হা প্রিয়ে জানকি! হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি, হা দেবি বিদেহরাজপুত্রি বলিয়া ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহ ও অধীরভাবে পতিত হইলে সীতা তমসার চরণে ধরিয়া বলিলেন,—

"ভঅবদি তমসে! পরিত্তাহি পরিত্তাহি জিআবেহি অজ্জউত্তং"
ভগবতি তমসে! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর আর্য্যপুত্রকে বাঁচাও।
তমসা কহিলেন,—

ত্বমেব নন্নু কল্যাণি সঞ্জীবয় জগৎপতিং।
প্রিয়স্পর্শো হি পাণিস্তে তত্রৈব নিয়তো ভবঃ।

হে কল্যাণি তুমিই জগৎপতিকে সঞ্জীবিত কর, তোমার পাণি প্রিয়স্পর্শ, তাহাতে সঞ্জীবন।

সীতা বলিলেন,

জং হোদু তং হোদু জহা ভঅবদী ভণাদি।
যা হয় হউক, ভগবতী যেরূপ বলিতেছেন।

এই জং হদু তং হোদু কথাটী কি চমৎকার ভাবপূর্ণ। এতদ্দ্বারা কবি দেখাইয়াছেন যে, অকারণপরিত্যাগজনিত গূঢ় অভিমানে এবং কোমল-প্রকৃতিসুলভ ভয়ে সীতার হৃদয় পূর্ণ ছিল। সীতা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, আমি পরিত্যক্তা পত্নী, স্বামীর শরীরস্পর্শে আমার অধিকার কি? আমি স্পর্শ করিয়াছি জানিতে পারিলে তিনি কুপিত হইতেও পারেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, যা হইবার হউক, অর্থাৎ আমার ভাগ্যে যাহা হইবার তাহা হউক বলিয়া রামের শরীর স্পর্শ করিতে গেলেন। রাম সীতাকর্তৃক শরীরস্পর্শমাত্রে আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইলেন। সীতা বলিলেন,

জাণে পুণোবি পচ্চাগদং বিঅ জীবি দংতেল্লোঅণাহস্স।
ত্রিলোকনাথের জীবন পুনরপি প্রত্যাগত বোধ করিতেছি।

পাঠক দেখুন, ইতঃপূর্ব্বেই তমসা রামকে জগৎপতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সীতাও তাহার অনুসরণে "তেল্লোঅণাহ" বলিলেন। তদ্ভিন্ন কবি ত্রিলোকনাথ এই শব্দটীর অপর সার্থকতাও দেখাইয়াছেন।

রাম—লোকনাথ—রাজা—প্রজাপালক তমসার বাক্যে এই ভাবটী

সীতার হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল। তিনি আমার ভাগ্যে জং হোহ্ তং হোহ্ মনে করিয়া রামের জীবনোপায় সাধন করিতে গিয়াছিলেন; এবং তাহা করিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ হৃষ্টমনা হইয়াছিলেন।—কবি সীতাকে "কিঞ্চিৎ" হৃষ্টমনা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সীতার মনে লোকোপকারে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু আত্মসম্বন্ধে তাঁহার ঔদাস্য রহিল। রাম চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—

হন্ত ভোঃ কিমেতৎ
প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥
স্পর্শঃ পুরা-পরিচিতো নিয়তং স এব
সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ।
সন্তাপজাং সপদি যঃ প্রতিহত্য মূর্চ্ছা-
মানন্দনেন জড়তাং পুনরাতনোতি॥

আহা এ কি!

হরিচন্দনপল্লবসমূহের রসস্রাবস্বরূপ, কি নিষ্পীড়িতচন্দ্রকরকলাপের অভিষেক, কি আমার তাপিত জীবিততরুর পরিতর্পণস্বরূপ সঞ্জীবনৌষধিরস আমার হৃদয়ে প্রসিক্ত হইল।

এই যে আমার সঞ্জীবন এবং মনোমুগ্ধকর স্পর্শ, ইহা আমার পূর্ব্ব-পরিচিত, ইহা হঠাৎ সন্তাপজন্য মূর্চ্ছা বিনাশ করিয়া আনন্দনদ্বারা আমাকে পুনরায় জড় করিয়া ফেলিতেছে।

সীতা শুনিলেন, এবং ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন; বলিলেন—

এত্তিঅং এব্ব দাণীং মে বহুদরং

এক্ষণে ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রাম উপবিষ্ট হইয়া সীতার দর্শনাভিলাষে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সীতা তমসাকে কহিলেন,

ভঅবদি তমসে!

ওসরম্ম জই দাব মং পেক্‌খিস্‌সদি তদো অণভ্যণুণ্ণাদসন্নিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্‌সদি।

ভগবতি তমসে! এস আমরা সরিয়া যাই। আমি বিনা অনুজ্ঞায় সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছি দেখিলে মহারাজ আমার প্রতি অধিকতর কুপিত হইবেন।

রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া প্রিয়ে জানকি বলিয়া ডাকিলেন। নাটকে নির্দ্দেশ না থাকিলেও আহ্বানটী বোধ হয় উচ্চৈঃস্বরেই হইয়াছিল। সীতা একটু রাগ করিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

অজ্জউত্ত অসরিসং কৃখু এদং বঅণং ইমস্স বুত্তন্তস্স।

আর্য্যপুত্র' নিশ্চয়ই এ অসদৃশ কথা—সেই সেই বৃত্তান্তের পর।

পাঠক কবির কৌশল দেখুন, রামের উপর সীতার কোপ যে অত্যল্প-ক্ষণস্থায়ী, তাহা তিনি কেমন দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রথমের "নিশ্চয়ই অসদৃশ" এই দুইটী শব্দ মাত্র ক্রোধোক্তি, এবং উহাতেই ক্রোধের বিলয়। শেষের "সেই সেই বৃত্তান্তের পর"—এই কয়টী শব্দ রামকৃত অকারণ পরিত্যাগরূপ অপরাধের আবরণ;—কেবল তাহাই নহে, ঐ শব্দগুলি সীতার স্বামিত্যাগজনিত আন্তরিক লজ্জারও পরিব্যঞ্জক। তিনি বাষ্পদিগ্ধ-নয়নে বলিতে লাগিলেন—

অহবা কিংত্তি বজ্জমইং জন্মন্তরেসম্ভাবিদদুল্লহদংসণস্‌স মং এব্ব মন্দ-ভাইণিং উদ্দিসিঅ বচ্ছলস্‌স এবংবাদিণো অজ্জউত্তস্‌স উঅরি নিরণুক্কোসা ভবিস্‌সং।

অথবা অধিক কি! আমি বজ্রময়ী!—মন্দভাগিনী আমাকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ প্রিয়ভাষী জন্মান্তরেও দুর্ল্লভদর্শন স্নেহময় আর্য্যপুত্রের উপর আমি কি নির্দ্দয় হইব!

সীতা স্বামীর প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই আপনাকে তিরস্কার করিয়া বজ্রময়ী বলিয়াছিলেন, বিরহ-বেদনায় গতপ্রাণা হয়েন নাই ভাবিয়া আপনাকে বজ্রময়ী বলেন নাই। তিনি বিগতক্রোধ হইয়া বলিলেন,—

অহং এদস্স হিদঅং আণামি মম বিএসোত্তি।

আমি উহাঁর হৃদয় জানি এবং উনিও আমার হৃদয় জানেন।

সীতার প্রেমময় হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি যেন সেই বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই তমসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভঅবদি তমসে তহা ণিকারণপরিচ্চাইণো বি এদস্স এবংবিহেণ দংসণেণ কেরিসো বিঅ মে হিঅআণুবন্ধো ত্তি ণ আণামি।

ভগবতি তমসে ইনি অকারণে সেরূপ পরিত্যাগ করিলেও ইহাঁর এবম্বিধ দর্শনে আমার হৃদয়ের যে কিরূপ অবস্থা হইতেছে, তাহা আমি জানি না।

তমসা বলিলেন,—

জানামি বৎসে জানামি,
তটস্থং নৈরাশ্যাদপিচ কলুষং বিপ্রিয়বশা-
দ্বিয়োগে দীর্ঘেঽস্মিন্ ঝটিতি ঘটনোত্তম্ভিতমিব।
প্রসন্নং সৌজন্যাদ্দয়িতকরুণৈর্গাঢ়করুণম্
দ্রবীভূতং প্রেম্না তব হৃদয়মস্মিন্ ক্ষণইব।

দীর্ঘ বিরহে তোমার হৃদয় এত দিন রাম দর্শনে নৈরাশ্য হেতু উদাসীন ছিল, এবং রামের পরিত্যাগ জন্য বিপ্রিয়বশে কলুষভাব ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে ঝটিতি রামদর্শন ঘটনায় আনন্দে যে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তদীয় সৌজন্যে প্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল, দয়িতের করুণ বাক্যে গাঢ় করুণ রসের আশ্রয় হইয়াছে, এবং প্রেমে একবারে দ্রবীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

এই শ্লোকে 'তটস্থ' 'কলুষ,' 'উত্তম্ভিত,' 'প্রসন্ন,' 'গাঢ়,' 'দ্রবীভূত,' এই সকল শব্দের দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, কবি নদীর সহিত সীতা-

হৃদয়ের রূপক কল্পনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং প্রথমে নদী তমসার "আমি জানি, আমি জানি" এই বীপ্সাত্মক বাক্যে তাহার সূচনাও করিয়াছেন। সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মনে এ কি ভাব হইল জানিতে পারিতেছি না। তমসা বলিলেন, বাছা তুমি জান না, কিন্তু আমি ইহার ভুক্তভোগী—আমি জানি। আমাতে দীর্ঘ কালের পর বর্ষাগম, এবং পর্ব্বতস্থ নীহারসংঘাত দ্রবীভূত হইলে ঐরূপ "হড়কা বাণ" আসিয়া থাকে। তমসা যে নদী, তাহা কবি নিজে ত ভুলেনই নাই, পাঠককেও ভুলিতে দিলেন না।

ভবভূতি আরও একটী কথা পাঠকের হৃদ্গত করাইতে বিস্মৃত হন নাই। নদী তমসা যেমন আপনার সাদৃশ্যে সীতার তাৎকালিক অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন, রামও সেই সময়ে স্বমুখে তাঁহার নিজের কি হইয়াছে বলিলেন। তিনি সীতাদর্শনচেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া প্রথমতঃ বলেন—

প্রসাদ ইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অদ্যাপ্যোবার্দ্রয়তি মাং ত্বং পুনঃ ক্বাসি নন্দিনি॥

তোমার মূর্ত্তিমান্ প্রসাদস্বরূপ স্নেহার্দ্র শীতল স্পর্শ এখনও আমাকে আর্দ্র করিতেছেন, কিন্তু হে আনন্দিনি! তুমি কোথায়?

সীতা রামের ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন,—

এদে ক্খু দে অগাধদংসিদসিণেহসম্ভারা আনন্দণিস্‌সন্দিণো সুদা মএ অজ্জউত্তস্‌স উল্লাবা জাণং পচ্চএণ ণিকাকরণপরিচ্চাঅসল্লিদো বি বহুমদো মে জম্মলাহো।

আমি আর্য্যপুত্রের অগাধস্নেহসম্ভৃত আনন্দনিস্তন্দী যে সকল বিলাপ শ্রবণ করিলাম, তদ্দ্বারা অকারণপরিত্যাগজনিত শল্যে বিদ্ধ হইলেও আমার জন্মলাভ সার্থক বিবেচনা করিলাম।

আর অভিমান নাই—অকারণ পরিত্যাগজনিত শল্যবিদ্ধ হইলেও আপনার জন্মলাভ সার্থক মানিলেন। ইহার পর রাম বলিলেন,—

অথবা কুতঃ প্রিয়তমা। নূনং সঙ্কল্পাভ্যাস পাটবোৎপাদ এষ রামভদ্রস্য ভ্রমঃ।

অথবা প্রিয়তমা কোথায় ? ইহা রামের কল্পনাভ্যাসপটুতাজনিত ভ্রম। অর্থাৎ কবি রামের মুখ দিয়াই বলিলেন যে, এই সমস্ত ব্যাপার রামের ভ্রম মাত্র, ইহার পরেই বাসন্তীর সেই উৎকণ্ঠোক্তি "প্রমাদঃ প্রমাদঃ সীতা দেব্যা" ইত্যাদি।

---

(৩)

তৃতীয়াঙ্কে বনদেবী বাসন্তীর প্রথমোচ্চরিত "প্রমাদঃ প্রমাদঃ" এই স্থল হইতে দ্বিতীয়োচ্চরিতবৎ প্রতীয়মান "প্রমাদঃ প্রমাদঃ" পর্য্যন্ত যে ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তৎসমস্ত ক্ষণকালমাত্রেই নির্ব্বাহিত, ইহা বুঝা গিয়াছে; এবং উপসংহারে কবিও রামের মুখ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ছায়াময়ী সীতাকর্ত্তৃক রামের অঙ্গস্পর্শ রামেরই ভ্রমমাত্র। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তৃতীয় অঙ্কের ঐ ভাগটীর সহিত সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের একটী অতি বিচিত্র সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমেত প্রকাণ্ড বনস্পতি তাহার পত্রৈক মধ্যে প্রতিভাত থাকে, যেমন এই ক্ষুদ্র পৃথিবী সুবৃহৎ সৌর জগতেরই অনুরূপ, এবং যেমন বিস্তৃত রামায়ণাদি পুরাণ তত্তৎ পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট সংক্ষিপ্ত অংশেরই বিস্তৃতিমাত্র, সেইরূপ তৃতীয়াঙ্কের এই ভাগটী সমুদায় তৃতীয়াঙ্কেরই প্রতিরূপস্বরূপ। পাঠক দেখিবেন যে, সমুদায় তৃতীয়াঙ্কে যে যে কথা আছে, তৎসমুদায় এই ভাগের বিস্তৃতি বই আর কিছুই নহে। রাম যে পঞ্চবটীবনে সীতার সহিত পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, সেই বনের পূর্ব্বপরিচিত মৃগ, পক্ষী, স্থানসন্নিবেশাদি, বিশেষতঃ সীতার পুত্রীকৃত করিশাবক, ময়ুর, মৃগ, কদম্ববৃক্ষাদি, এবং তাঁহাদের অধ্যুষিত সেই সেই শয়নীয় শিলাতল এবং লতাগৃহাদি দর্শনে সীতাবিরহশোক রামের অন্তঃকরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তাঁহার একান্ত ম্লানভাব লক্ষিত হয়, তিনি অনুতাপে মুগ্ধ হন, এবং সেই মোহে প্রসন্নহৃদয়া সীতার অনুগ্রহস্পর্শলাভ করিয়াছেন মনে করেন, এবং তাঁহার সেই অনুতাপদগ্ধ হৃদয়মধ্যে

বিগতমন্যু সীতা যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। পূর্ব্ব ভাগেও এই কথা, এবং সমুদায় তৃতীয়াঙ্কেও এই কথা। অতএব তৃতীয়াঙ্কের ঐ পূর্ব্ব ভাগকে সংক্ষিপ্তাঙ্ক বা উপাঙ্ক কহা যাইতে পারে।

উপাঙ্কের প্রথমে, পোষিত করিশাবকের প্রতি রামসীতার পুত্রভাবের অঙ্কুর আছে। পাঠক দেখিবেন, ভবভূতি ঐ অঙ্কুরটী মাত্র লইয়া কি অপূর্ব্ব কবিত্বকুসুমশোভিত বনভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন—তাহাতে প্রণয়িযুগলের স্ফটিকস্বচ্ছহৃদয় পরিদৃষ্ট, এবং দুইটী হৃদয়তন্ত্রীর এক সুরে লয়-সংযোগ আকর্ণিত হইতেছে।

পঞ্চবটী মূর্ত্তিমতী হইয়া বাসন্তীরূপে সমাগতা হইলে রাম তাহাকে সীতার পূর্ব্বসখী বলিয়াই চিনিলেন। পঞ্চবটী রামের চক্ষে সীতাময়ী হইয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। বনদেবীর কথানুসারে রাম জটায়ু শিখরীর দক্ষিণে সীতাতীর্থদ্বারা গোদাবরীতে অবতীর্ণ হইয়া সীতার পুত্রীকৃত করিশাবককে রক্ষার নিমিত্ত গমন করিলেন। গোদাবরীসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই করিশাবক শত্রুবিজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কবি তখন সীতার মুখে এই উক্তি প্রকাশ করিলেন—

"অম্মহে এরিসো এসো সো সংবুত্তো"

আহা সেটী এখন এমন হইয়াছে!

কবি রামকে দিয়াও বলাইলেন—

দেবি! দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে
যেনোদ্গচ্ছদ্বিসকিসলয়স্নিগ্ধদন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।
সোঽয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যৎকল্যাণংবয়সি তরুণে ভাজনংতস্যজাতঃ॥

দেবি! তোমার বড় সৌভাগ্য!

অচিরজাত, মৃণাল ও পল্লববৎ কোমল দন্তপ্ররোহে শোভমান যে করি-

শাবক তোমার কর্ণপূর হইতে লবলীপত্র আকর্ষণ করিত, সেই তোমার পুত্র মদস্রাবী হস্তীকে জয় করিয়া তরুণ বয়সে যাহা শুভ, তাহার আধার হইয়াছে।

পাঠক দেখুন, সীতা যেন রামের মানসচক্ষের সম্মুখীনা—দেবী সম্বোধনপূর্ব্বক রাম যেন তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বুঝা যাইবে যে, সীতার মুখে যে কথা, রামের মুখেও সেই কথা—সীতা "সে" বলিয়া করিশাবকের অতীতাবস্থার স্মরণ করিলেন, এবং "এমন হইয়াছে" বলিয়া তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন। রামোক্ত "যেনোদ্গচ্ছদ্" ইত্যাদি শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে করিশাবকের অতীতাবস্থার স্মরণ, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার প্রত্যক্ষীভাব। অতএব সীতার উক্তি যেন রামেরই 'মন-কথা' বা কণ্ঠোক্তি মনে করিলেও করা যাইতে পারে।

আবার সীতার মুখের কথা—

অবিউত্তো দাণীং অঅং দীহাউ ইমাএ
সোম্মদংসণাএ সমং হোদু।

এক্ষণে এই দীর্ঘায়ু সৌম্যদর্শনা করিণীর সহিত অবিযুক্ত হইয়া থাকুক।

রামও বাসন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

পশ্য পশ্য কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যমপি শিক্ষিতং বৎসেন—

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্যৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষসংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃশীকরিণাকরেণবিহিতঃকামং বিরামে পুন—
র্যৎস্নেহাদনরালনাল নলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্॥

দেখ দেখ, বৎস কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যও শিখিয়াছে।

ক্রীড়োৎখাত মৃণালসমূহের খণ্ড মুখে তুলিয়া দিয়া প্রস্ফুটনোন্মুখ পদ্ম-বাসিত জলদ্বারা মুখে গণ্ডূষ দিতেছে, এবং জলকণস্রাবী শুণ্ডদ্বারা পর্য্যাপ্ত-

রূপে গাত্র ধৌত করিয়া দিয়া সেকবিসানে অবক্রনাল-নলিনী-পত্র আত-পত্ররূপে ধারণ করিতেছে।

কাব্যে এমন অনেক স্থল থাকে, যেথানে কিছু বলা অপেক্ষা কিছু না বলায় বা অল্পমাত্র বলায় অধিকতর ভাব ব্যক্ত হয়। এইটী সেইরূপ একটী স্থল। করিকরভের কান্তানুবৃত্তিদর্শনে রামের বিরহ উপলক্ষ করিয়া কত কথাই বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ভবভূতি সীতার উক্তিতে করিণীর সহিত "অবিযুক্ত" থাকুক, করিকরভের প্রতি এই আশীর্ব্বচন প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহাতেই অন্যে যাহা কিছু বলিতে পারিত, তাহা সমুদয় বলা হইয়াছে—আর অন্যে যাহা বলিতে পারিত না, এমন একটু বিশেষ কথাও বলা হইয়াছে। বিবেচক পাঠক অবশ্যই ভাবিবেন যে, স্বয়ং বিরহিণী সীতা আশীর্ব্বচন মুখ্যতঃ বধূর প্রতি প্রয়োগ না করায় কবি কি দেখাইবার চেষ্টা করিলেন—তিনি সীতার হৃদয়ে নিজের দুঃখানুভব অপেক্ষা রামের সহিত অধিক-তর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, না ছায়াময়ীর মুখদিয়া রামেরই আর একটী কণ্ঠোক্তি ব্যক্ত করিলেন?

ভবভূতি এ স্থলে যে সকল ভাব অব্যক্ত রাখিলেন এবং পাঠকের নিজের শক্তির উপর অনুভব করিবার অধিকার দিলেন, তাহা বুঝি-বার জন্য চেষ্টা না করিয়া থাকিবার যো নাই। কবি রামের পূর্ব্বগত দুইটী উক্তিতে স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সীতার মনে যে ভাব সমুদিত হইতেছে, রামের মনেও সেই সেই ভাব উঠিতেছে। কবি ইহাও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ সময়ে রামের মানস চক্ষে সীতা প্রত্যক্ষবৎ উপস্থিতা হইয়াছেন। কিন্তু কবি এই পর্য্যন্ত করিয়াই কিয়ৎ-ক্ষণ রামের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির করিলেন না, তাঁহাকে একবারে নীরব করিয়া রাখিলেন। রাম আর বহিঃস্থ বনদেবীকে সম্বোধন করিয়া কিম্বা অন্তরস্থ সীতামূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া একটী কথাও বলিলেন না। তাদৃশভাবাপন্ন রামকে তাদৃশ বাক্‌শূন্য করিয়া রাখায়

কবি যেন পাঠককে 'মাথার দিব্য' দিয়াই ঐ সময়ে রামের মনে কি হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম তখন করিশাবকের কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্য দর্শন করিয়াছেন, সেটী যে সীতার পালিত এবং তাঁহার পুত্রভাবপ্রাপ্ত, তাহা জানিয়াছেন; বহুবর্ষ পূর্ব্বে সীতা যখন তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সময়ের মূর্ত্তিও রামের মনে সমুদিত হইয়াছে—তখন রাম নীরব হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?—রামের মনে—নিজের কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যের প্রথম শিক্ষা হইতে কোটি কোটি অত্যদ্ভুত ঘটনাবলীর পর সীতার গর্ব্ভধারণ, এবং তাঁহার গর্ব্ভজাত সন্ততি এক্ষণে কেমন হইত, ইত্যাদিরূপ অনুস্মৃতি কি আলোড়িত হইতেছিল?—হইতেও পারে, কারণ দেখা গিয়াছে যে, সীতা এবং রাম উভয়ের মনেই একই ভাব একই সময়ে সমুদিত হইতেছিল, এবং এই সময়ে সীতা তমসাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—

অঅং দাব এরিসো জাদো দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিকেণ কালেণ কেরিসা বিঅ হোন্তি।

এত এই প্রকার হইয়াছে, সেই কুশ লব এত কালে না জানি কিরূপ হইয়াছে।

তমসা উত্তর করিলেন,

যাদৃশোঽয়ং তাদৃশৌ তাবপি

এ যে প্রকার, তাহারাও সেইরূপ হইয়াছে।

তমসার এই উক্তিতে রামের অন্তরাত্মার কর্ণকুহরে এক বার আশাদেবীর সান্ত্বনাবাক্য সঞ্চার করা কি কবির ইচ্ছা?—হইতেও পারে যে, ইহার পরেই রামের মনে প্রসূতপুত্রা সীতার ছবি অধিকতর প্রোজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি মনে মনে অনেক ভাঙ্গিতে গড়িতে ছিলেন। হয় ত একবার ভাবিলেন যে, সীতার যেমন স্বামিবিরহ, সেইরূপ পুত্রবিরহও উপস্থিত হইয়া থাকিবে; কারণ ওরূপ স্থলে ওরূপ মনে অবশ্যই অনিষ্টের আশঙ্কা হইয়া থাকে। কিন্তু পরেই আবার

মনে হইয়া থাকিবে যে, পুত্র প্রসব করিয়া আমাকে না দেখাইতে পাইয়া না জানি সীতার কতই দুঃখ হইয়াছিল। সীতাও তমসাকে বলিতেছিলেন,—

কিং বা মএ পসূদাএ জেণ তারিসাণং মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অণুবন্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং নিবদ্ধকাঅসিহণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিদং অজ্জউত্তেণ।

প্রসব করিয়া আমার কি হইল, মদীয় তাদৃশ পুত্রদ্বয়ের অবিরল কোমল ধবল দশন পংক্তিতে সুশোভিত সমুজ্জ্বল-কপোলশোভি মৃদুমধুর হাস্যে বিলসিত কাকপক্ষালঙ্কৃত অমল মুখপদ্মযুগল আর্য্যপুত্র চুম্বন করিলেন না।

যদি রাম সত্য সত্যই এরূপ ভাবিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই তাঁহার মন হইতে একবার সীতার বিরহভাব অপগত হইয়া থাকিবে। তিনি পুনর্ব্বার পুত্রক্রোড়া প্রস্রুতস্তনী সীতা সহ আপনাকে সংসারী দেখিতে পাইয়া থাকিবেন। সীতাও তমসাকে কহিলেন—

এদিণা অবচ্চসংস্মরণেণ উস্সসিদপহ্নুদথণী তাণং চ পিদুণোসন্নিধাণেণ খণমেত্তং সংসারিণী হ্মি সংবুত্তা।

অপত্যস্মরণে আমার স্তন্যক্ষরণ হইতেছে. এবং সেই পুত্রদিগের পিতার সন্নিধানে থাকিয়া যেন আমি ক্ষণমাত্র সংসারিণী হইয়াছি।

ইহার পরেই কবি তমসার মুখ দিয়া সন্তান যে দম্পতীপ্রণয়ের পরম বন্ধন, ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিলেন। যথা—

কিমত্রোচ্যতে? প্রসবঃ খলু প্রকর্ষপর্য্যন্তঃ স্নেহস্য। পরশ্চৈতদন্যোন্যসংশ্লেষণং পিত্রোঃ।

অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি বধ্যতে॥

কি বলিব—সন্তান স্নেহের পরাকাষ্ঠা, এবং পিতামাতা পরস্পরের পরম বন্ধন।

সন্তান স্নেহের আশ্রয় প্রযুক্ত দম্পতীর অন্তঃকরণের সুখময় গ্রন্থিস্বরূপ উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে।

ফলকথা, ভবভূতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন যে, অপত্যবাৎসল্য নিবন্ধন দম্পতীর হৃদয়ে একাত্মতা জন্মে, এবং তিনি সেই ভাবেরই আনুপূর্ব্বিকক্রমে বর্ণন করিলেন।

---

(৪)

সীতার পুত্রীকৃত করিশাবক দর্শনে রামের অন্তঃকরণে সীতার পূর্ব্ব মূর্ত্তির সংস্মরণ এবং বর্ত্তমান অবস্থার চিন্তা সমুদিত হইবার আভাস প্রদান পূর্ব্বক ক্ষণকালের নিমিত্ত সীতার সহিত রামের যে একাত্মতা জন্মিয়াছিল, ভবভূতি তাহা দেখাইয়াছেন। এক্ষণে সেই ভাবের অপগমে ক্রমশঃ বিরহশোকেরই প্রবলতর উদ্দীপন এবং উপাঙ্গে রামের যে মলিনভাবের সূচনা আছে, তাহা উপলক্ষ করিয়া কবি অপূর্ব্ব শক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

রাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে সীতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর, পুনর্ব্বার বাহ্য জগতে তাঁহার অনুভূতির সঞ্চার হইল। বনদেবী বলিলেন—

ইতোঽপি দেবঃ পশ্যতু—
অতরুণমদতাণ্ডবোৎসবান্তে
স্বয়মচিরোদ্গতমুগ্ধলোলবর্হঃ।
মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদম্বে
নদতি স এষ বধূসখঃ শিখণ্ডী॥

দেব! এ দিকেও অবলোকন করুন—

নবজাত-মনোহর-চঞ্চল পুচ্ছবিশিষ্ট উন্নতশিখার শোভায় মণিময়-মুকুট-ধারিরূপে প্রতীয়মান বধূসহায় সেই এই শিখণ্ডী মহানন্দে নৃত্যোৎসব সমাধা করিয়া কদম্ববৃক্ষে কেকারব করিতেছে।

রাম পূর্ব্বে যেমন সীতাপালিত করিশাবককে করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলেন, এ বারেও সেইরূপ সীতার পোষিত ময়ূরকে ময়ূরীর সহিত ক্রীড়ারসে মগ্ন দেখিলেন। এ বারেও রামের চিত্তপটে সীতার পূর্ব্বমূর্ত্তি জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তি চক্ষুঃ
প্রচলিত চতুরভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্তমানং
সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি।

নৃত্য মধ্যে ঘূর্ণনকালে চঞ্চল বিলাসশালিনী ভ্রূভঙ্গী দ্বারা পুটমধ্যে ঘূর্ণিত নিজ চক্ষুর মণ্ডন সাধন পূর্ব্বক করপল্লবের তালে মুগ্ধা সীতা সুতের ন্যায় সস্নেহান্তঃকরণে তোমাকে নাচাইত আমি তাহা স্মরণ করিতেছি।

কালিদাসও মেঘদূতে সুন্দরীকর্ত্তৃক নর্ত্তমান একটী ময়ূরের চিত্র দিয়াছেন, যথা—

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টিঃ
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈ র্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্ বঃ॥

সেই দুই রক্তাশোকের মধ্যে একটী স্বর্ণময় যষ্টি প্রোথিত আছে। তাহার মূলদেশ মরকত মণিদ্বারা বদ্ধ এবং অগ্রভাগে একখানি স্ফটিক ময় ফলক নিবদ্ধ আছে। তোমাদিগের সুহৃৎ নীলকণ্ঠ দিবাবসানে ঐ ফলকে উপবেশন করিলে আমার প্রিয়া বলয়শিঞ্জাসহকৃত হস্ততাল দ্বারা তাহাকে নাচাইয়া থাকে।

দুইটি চিত্রই অতি সুন্দর, এবং যথাযোগ্য। তবে একটী বনবিহারিণী জীবপালিকা পালিতগতপ্রাণা বিশুদ্ধাত্মিকা আনন্দময়ী রমণীর চিত্র এবং অপরটী ভাগ্যবানের গৃহলক্ষ্মীর ছবি। একটী চিত্রে ময়ূরের নৃত্যের সহ নর্ত্তনকারয়িত্রী সুন্দরীর মুখ চক্ষু হস্তাদি সর্ব্বাঙ্গের বৈচিত্র্য এবং মনের

বৎসলভাব পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় ; অপর চিত্রে ময়ূরের আসন, ময়ূরটী এবং সোণার বালা হাতে টুক্‌টুকে গোলগাল হাত দুটী মাত্র দৃষ্ট হয়।

রাম বলিতে লাগিলেন—

হন্ত তির্য্যঞ্চোঽপি পরিচয় মনুরুধ্যন্তে।
কতিপয়কুসুমোদ্গমঃ কদম্বঃ
প্রিয়তময়া পরিবর্দ্ধিতো য আসীৎ।
স্মরতি গিরিময়ূর এষ দেব্যাঃ
স্বজন ইবাত্র যতঃ প্রমোদমেতি॥

হায়! তির্য্যক্ জাতিরাও পরিচয়ের অনুরোধ রাখে।

এক্ষণে যাহার কতিপয় পুষ্পোদ্গম হইয়াছে, সেই কদম্ব তরু যে প্রিয়তমাকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, এই গিরিময়ুর তাহা স্মরণ করিতেছে, যেহেতু আত্মীয়ের ন্যায় এই কদম্ব বৃক্ষে এ প্রমোদ লাভ করিতেছে।

পাঠক দেখুন যে, প্রোজ্জ্বলা চঞ্চদ্রূপা সীতামূর্ত্তি রামের হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেটী যেন কিঞ্চিৎ দূরগতা হইয়াছে ; এখন সীতাকে তুমি না বলিয়া প্রিয়তমা অথবা দেবী বলিয়া উদ্দেশে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, এবং যে ময়ুর পূর্ব্বপরিচয়ের অনুরোধে সীতা পরিবর্দ্ধিত কদম্ববৃক্ষে বসিয়া আছে, তাহার তাদৃশ আচরণ দর্শনে রামের যেন শোকেরই উদ্রেক হইতেছে।

বনদেবী বলিলেন—

অত্র তাবদাসন পরিগ্রহং করোতু দেবঃ।
এতত্তু দেব কদলীবনমধ্যবর্ত্তি
কান্তাসখস্য শয়নীয়শিলাতলং তে।
অত্রস্থিতা তৃণমদাদ্বহুশো যদেভ্যঃ
সীতা ততো হরিণকৈর্নবিমুচ্যতে স্ম।

এই খানে আপনি আসন পরিগ্রহ করুন।

যখন কান্তা তোমার সমভিব্যাহারে ছিল, তখনকার সেই এই কদলীবন-মধ্যবর্ত্তী তোমার শয়নীয় শিলাতল; এই স্থানে থাকিয়া সীতা এই সকল হরিণকে বহুবার তৃণ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রযুক্ত ইহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে না।

রাম পূর্ব্বে সীতাসহ যে শিলাতলে শয়ান হইতেন, তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাহা দেখাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অন্যত্র গিয়া বসিলেন, এবং নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ নিস্তব্ধাবস্থায় রামের মনে কিরূপ ভাবনা উদিত হইতে পারে? তিনি হয় ত এরূপ ভাবিতেছিলেন যে, ইহা সেই পঞ্চবটীবন, এখানকার এই মৃগ পক্ষী বৃক্ষাদি পূর্ব্বে কতই আনন্দ উৎপাদন করিত, এক্ষণে এ গুলি কেবল ক্লেশের কারণ হইতেছে। সেই সব থাকিতেও যেন কিছুই নাই। জীবলোকের কি উৎকট পরিবর্ত্ত!

কবি সীতার মুখ দিয়া ঐরূপ ভাবই ব্যক্ত করিলেন।

ছায়াময়ী বলিলেন,—

হদ্ধী হদ্ধী সো এব্ব অজ্জউত্তো তং এব্ব পঞ্চবটীবনং সা পিঅসহী বাসন্তী তে এব্ব বিবিহবীসম্ভসাক্খিণো গোদাবরীকাণ তে এব্ব জাদণিব্বিসেসা মঅপক্খিপাদবা মম উণ মন্দভাইণীএ বি সব্বং এব্ব এদং নত্থি; তা এরিসো জীঅলোঅস্‌স পরিবত্তো।

হা ধিক্, হা ধিক্ সেই এই আর্য্যপুত্র, সেই এই পঞ্চবটীবন প্রিয়সখী বাসন্তী, আমাদের বিবিধবিশ্রম্ভ সাক্ষী সেই বরী কাননপ্রদেশ, সুতনির্ব্বিশেষে পালিত সেই এ পাদপ রহিয়াছে, কিন্তু এগুলি মন্দভাগিনী আমার যেন সে সব এ কিছুই নয় বোধ হইতেছে; প্রকারই পরিবর্ত্ত!

রাম নিস্তব্ধ—জীবলোকের উৎকট পরি ভাবের পরিবর্ত্ত চিন্তা করিতে করিতে

ঘটিয়াছিল, তাহাও তাঁহার মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি এরূপও মনে করিয়া থাকিবেন যে, এরূপ অবস্থায় সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি না, অথবা অতি কষ্টেই চিনিবেন, সন্দেহ নাই।

বাসন্তীর মুখেও কবি ঐ ভাব ব্যক্ত করিতেছেন,—

সখি সীতে! কথং ন পশ্যসি রামস্যাবস্থাম্।
কুবলয়দলস্নিগ্ধৈরঙ্গৈর্দদৌ নয়নোৎসবং
সততমপি তে স্বেচ্ছাদৃশ্যো নবং নবমেব যঃ।
বিকলকরণঃ পাণ্ডুঃ সোহয়ং শুচা পরিদুর্ব্বলঃ
কথমপি স ইত্যুন্নেতব্যস্তথাপি দৃশাং প্রিয়ঃ॥

সখি সীতে! রামের অবস্থা দেখিতেছ না? যিনি তোমার অনায়াসদৃশ্য হইলেও নীলোৎপলদলবৎ স্নিগ্ধ অঙ্গ দ্বারা তোমার নয়নে প্রতিবারই নব নব প্রীতি উৎপাদন করিতেন, সেই এই রাম, এক্ষণে এরূপ বিকলেন্দ্রিয় পাণ্ডুবর্ণ ও শোকভরে দুর্ব্বল হইয়াছেন যে, তাঁহাকে সেই রাম বলিয়া অতি কষ্টে চেনা যায়; তথাপি কেমন নয়নপ্রিয়!

পাঠক এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, রামের মনের যে ভাব, তে সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি না, যদি এরূপ ঐ সময়ে তাঁহার মনে উঠিয়া থাকে, তবে সীতা কেমন চক্ষে তাঁহাকে ছন, এবং ঐ চক্ষুঃ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, তাহা অবশ্যই ন্তঃকরণে চিত্রিত হইয়া উঠিবে। চক্ষুঃ জীবাত্মার গৃহের বাতা- মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা যেমন চক্ষুর ভাবে প্রকাশ কিছুতেই নহে। সীতার ভালবাসা কত, রাম তাহা তেমন মর্ম্মান্তিক দুঃখিনী; এবং তিনি নিজেও ত প্রযুক্ত সীতার চক্ষুঃ ক্রোধ কিম্বা অভিমান অথবা া; পূর্ণ নিরীহতা, প্রগাঢ় শোক এবং দৃঢ় ব সীতার মুখ দিয়া যে উক্তি প্রকাশ করিয়া- কয়।

সীতা। হা দেব্ব এসো মএ বিণা অহংবি এদেণ বিণ ত্তি কেন সম্ভাবিদং আসি তা মুহুত্তঅং বি জন্মান্তরাদো বিঅ লদ্ধদংসণং বাহসলিলন্তরেসু পেক্খামি দাব বচ্ছলং অজ্জউত্তং।

হা দৈব! ইনি আমা ছাড়া এবং আমি ইহাঁ ছাড়া থাকিব, এরূপ কে সম্ভাবনা করিয়াছিল? যাহা হউক, মুহূর্ত্তের জন্য যেন জন্মান্তরে আমি ইহাঁর দর্শনলাভ করিলাম, অতএব অশ্রুজলের পতন এবং উদ্গম ইহার মধ্যবর্ত্তী অবকাশে স্নেহবান্ আর্য্যপুত্রকে একবার দেখিয়া লই।

যে চক্ষু দুটী ঐ ভাব প্রকাশ করে, সে দেখিতে কেমন, তাহা তমসার উক্তিতে কবি বলিয়া দিলেন।

বিদুলিতমতিপূরৈর্বাস্পমানন্দশোক-
প্রভবমবসৃজন্তী তৃষ্ণয়োত্তানদীর্ঘা।
স্নপয়তি হৃদয়েশং স্নেহনিস্যন্দিনী তে
ধবলবহলমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যেবদৃষ্টিঃ॥

প্রবল ধারায় বিগলিত আনন্দশোকাশ্রুবর্ষণকারিণী, দর্শনলালসায় বিস্ফারিত এবং দীর্ঘবৎ প্রতীয়মান স্নেহস্রাবিণী অতিশয় ধবল এবং মনোহারিণী তোমার দৃষ্টি জীবিতেশ্বরকে আর্দ্রীভূত করিতেছে।

খুব শাদা, ডাগর ডাগর এবং ডব্ ডবে চক্ষু। শুদ্ধ কাজল নাই বলিয়াই যে শাদা, তাহা নহে। মনের যে ভাবে চক্ষু রক্তাভ হয়, তাহার কাছেও যায় না বলিয়া চক্ষু আরও শাদা। কালিদাসও মেঘদূতে একটী বিরহিণী কামিনীর চক্ষু চিত্রিত করিয়াছেন, যথা—

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥
রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসং।

ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যাঃ
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি॥

মেঘকে যক্ষ বলিতেছে—গবাক্ষজাল দিয়া প্রবিষ্ট অমৃতশীতল চন্দ্রকিরণের অভিমুখে পূর্ব্ব প্রীতি প্রযুক্ত তাহার চক্ষুঃ যেমন গিয়াছিল, অমনি বিনিবৃত্ত হইয়াছে; এবং সেই চক্ষুকে খেদে অশ্রুভারাবনত পক্ষ্মরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত করায় প্রিয়াকে মেঘময় দিনে প্রস্ফুটিতও নয় নিমীলিতও নয় এমন স্থলকমলিনীর ন্যায় দেখিতে পাইবে। অলকে অপাঙ্গ প্রদেশ ঢাকিয়াছে, চক্ষুঃ কজ্জল শূন্য হইয়াছে, মদিরা ত্যাগ প্রযুক্ত আর সে ভ্রূবিলাস নাই—মৃগাক্ষীর এমন নয়ন, তুমি নিকটবর্ত্তী হইলে, আমি অনুমান করি, ঊর্দ্ধে স্পন্দিত হইয়া মৎস্যের তাড়নে চঞ্চল নীলপদ্মের তুল্যতা প্রাপ্ত হইবে।

দুটী চিত্রই সুন্দর এবং যথাযোগ্য। তবে ভবভূতির চিত্রে পবিত্র একাগ্রতা এবং দিব্য আধ্যাত্মিক ভাব চিত্রিত। কালিদাসের চিত্রে মনোমোহন মানুষিক রূপমাত্র।

রাম যেন বহুক্ষণ ধরিয়া ঐ দুঃসহ শোকব্যঞ্জক চক্ষুর ভাব সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বাহ্য জগতের প্রতি মন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন। বনদেবী বলিলেন—

দদতু তরবঃ পুষ্পৈরর্ঘ্যং ফলৈশ্চ মধুশ্চ্যুতঃ
স্ফুটিতকমলামোদপ্রায়াঃ প্রবান্তু বনানিলাঃ।
কলমবিরলং রত্যুৎকণ্ঠাঃ ক্বণন্তু শকুন্তয়ঃ
পুনরিদমযং দেবো রামঃ স্বয়ং বনমাগতঃ।

মধুবর্ষী বৃক্ষ সকল পুষ্পফল দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করুক; বিকসিত কমলসুরভি কাননসমীর প্রবাহিত হউক; প্রীতিভরে গ্রীবা উন্নমিত করিয়া পক্ষী সকল অবিরল অস্ফুট মধুর ধ্বনি করুক; যেহেতু পুনরায় রাম স্বয়ং এই বনে আসিয়াছেন।

রাম ঐ স্থানে বসিলেন। কিন্তু বোধ হয় কিছুতেই সীতার সেই গলদশ্রু চক্ষুঃ দুটী ভুলিতে পারিলেন না। যাহা দেখেন, তাহাই সীতা বিরহশোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। এমন কি ঐ সকল স্থানে যে প্রাণপ্রতিম ভ্রাতার সহিত বিচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সংস্মরণেও মনের শান্তি হইল না। তিনি বলিলেন—

করকমলবিকীর্ণৈ রম্বুনীবারশষ্পৈ
স্তরুশকুনিকুরঙ্গান্ মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি
দ্রবইব হৃদয়স্য প্রস্তরোদ্ভেদযোগ্যঃ॥

মৈথিলী, করকমলদত্ত অম্বু, নীবার এবং শষ্পদ্বারা যে সকল তরু, পক্ষী এবং কুরঙ্গদিগকে পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার হৃদয়দ্রবরূপ কেমন মনে এক বিকার জন্মিতেছে, যাহাকে হৃদয় পাষাণ দ্রবকারী দ্রাবক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়।

ফলতঃ, সমুদায় বাহ্য জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল।

(৫)

রামের বিরহমালিন্যের পুনিরুদ্রেক ও তজ্জন্য সমুদায় বাহ্য জগতে তাঁহার কষ্টের অনুভূতি, কবি এই সকল ভাব বর্ণন করিয়া উপাঙ্কে সূচিত অনুতাপের সবিস্তার বর্ণনাবসরে মানব-হৃদয়ের গূঢ়তম তত্ত্ব সমস্ত উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন।

রাম পূর্ব্বে পঞ্চবটীবনে যখন সীতা সহ পরম সুখে বাস করেন, তখন প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা লক্ষ্মণও তাঁহার সহচর ছিলেন। অতএব সেই বনে পুনর্ব্বার আসিলে পর সীতার সংস্মরণাবসরে অবশ্যই এক আধ বার লক্ষ্মণকেও তাঁহার মনে পড়িল। বনদেবী এক বার লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ রামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাম তাহা শুনিতে পান নাই, সীতার চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। বনদেবী পুনরায় দৃঢ়তররূপে বলিলেন—

মহারাজ ননু পৃচ্ছামি অপি কুশলং কুমার লক্ষ্মণস্য।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করি, কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত?

রাম মনে মনে ভাবিলেন—

অয়ে! মহারাজেতি নিষ্প্রণয়মামন্ত্রণপদং সৌমিত্রিমাত্রে চ বাষ্পস্খলিতাক্ষরঃ কুশলপ্রশ্নঃ তথা মন্যে বিদিতসীতাবৃত্তান্তেয়মিতি।

অয়ে! মহারাজ! এই সম্বোধন প্রণয় শূন্য, বাষ্পগদ্গদ এই প্রশ্ন কেবল লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাতেই পর্য্যবসিত; অতএব ইনি সীতাবৃত্তান্ত অবগত আছেন, বোধ হইতেছে। পরে বলিলেন—আং কুশলং কুমারস্য—

কুমারের কুশল।

এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠক দেখুন, কবি কি সুন্দর কৌশল করিয়া এই স্থানে লক্ষ্মণের নামের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন যে, সমুদয় বাহ্য জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ স্থলে দেখাইতেছেন যে, রামের পক্ষে সমুদয় বাহ্য জগতের মধ্যে এক সীতা ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর যে লক্ষ্মণ, সেই লক্ষ্মণের স্মৃতিও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা তিক্ত বোধ হইয়াছে। বাস্তবিক যে দুইটী প্রীতিকর পদার্থকে পূর্ব্বে সর্ব্বদা একত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত, পরে সেই দুইটীর একটী যদি না থাকে, এমন হয়, তবে অপরটীকে ভাল আছে দেখিলেও, যেটী নাই, তাহার জন্য তীব্র শোকানুভব হয়। লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, সীতা আর নাই, এই চিন্তাটী রামের মনে উঠাইয়া দিয়া কবি রামের বিরহশোকের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। কেবল তাহাই নহে, লক্ষ্মণের স্মরণে, লক্ষ্মণের দ্বারাই যে তিনি সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহাও রামের মনে উদিত করিলেন, এবং সুতরাং সেই প্রথম বিবাসনসময়ে রাম আপনার কার্য্য যেমন পাপ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ ভাব উদিত হওয়ায় আত্মগ্লানি তাঁহার মনে উদ্বোধিত হইল। বিবাসন-সময়ে রাম বলিয়াছিলেন—

হা! কষ্টমতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোঽস্মি সংবৃত্তঃ
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাং।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব।

হা কষ্ট! আমি অতি বীভৎসকর্ম্মা নৃশংস হইতেছি।

মাংসবিক্রয়-জীবীরা যেমন গৃহপালিত পক্ষীকে বিনষ্ট করে, তেমনি আমি শৈশব হইতে প্রতিপালিত সৌহার্দ্দবশতঃ একাত্মতাপ্রাপ্ত ইহাঁকে ছল করিয়া মৃত্যুর হস্তে প্রদান করিতে যাইতেছি।

বিবাসনের পূর্ব্বক্ষণে রামের বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া সীতা নিদ্রিতা ছিলেন, বিবাসন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাম আপনার সেই বাহু অপসারণ করিতে করিতে এ কথাও বলিয়াছিলেন,

অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্॥

হে মুগ্ধে! অশ্রুতপূর্ব্ব বীভৎস কার্য্যদ্বারা আমি চণ্ডাল হইয়াছি—আমাকে ত্যাগ কর। তুমি চন্দনভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছ।

ঐ সময়ে পৃথিবী, অগ্নি, জনক, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতিকেও স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

অথবা কশ্চ তেষামহমিদানীমাহ্বানে।
তে হি মন্যে মহাত্মানঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্মনা॥

অথবা এক্ষণে আমি তাঁহাদের আহ্বান করিবার কে? অর্থাৎ আমি তাঁহাদের আহ্বান করিবার যোগ্য নহি। আমি কৃতঘ্ন ও দুরাত্মা, সেই সকল মহাত্মার নাম করিলেও বোধ হয় যেন তাঁহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিবে।

অতএব সীতাকে বিবাসিত করিয়া রাম মনে মনে জানিতেন যে, তিনি পাপকর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহার মনে সেই ভাবের উদয় মাত্রেই বনদেবী বলিলেন—

অয়ি দেব! কিমিতি দারুণঃ খল্বসি?
ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ।

ইতি মূর্চ্ছতি।

হে দেব, তুমি কি কঠিনহৃদয়!

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয় স্বরূপ, তুমি আমার নয়নের জ্যোৎস্না, তোমার স্পর্শ আমার অঙ্গের অমৃত, ইত্যাদি শত শত প্রিয়বাক্য দ্বারা যাহাকে প্রীত করিতে, সেই মুগ্ধাকেই— দূর হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

এই কবিতাটী যে কত মিষ্ট তাহা বলা বাহুল্য। বোধ হয়, উত্তরচরিত পাঠক এমন কেহই নাই, যাঁহার এই শ্লোকটী, অন্ততঃ ইহার প্রথম চরণ তিনটী কণ্ঠস্থ নাই। চতুর্থ চরণটীর অধিকাংশই পাদপূরণার্থ প্রস্তুত, এবং যখন কবি বাসন্তীকে মূর্চ্ছিত করিতেছেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া কেবল পাদপূরণার্থ শব্দ প্রয়োগ না করাইলেই ভাল হইত। বাসন্তী চতুর্থ চরণের "তামেব" পর্য্যন্ত বলিয়াই মূর্চ্ছিতা হইলে কবিতাপূরণ রামের মুখ দিয়াই হইতে পারিত। যথা—

———বাক্যবিরতিঃ পতনঞ্চ যুক্তম্।

এই সামান্য কৌশল যে ভবভূতির অপরিজ্ঞাত ছিল, এমত নহে। তিনি বহুল স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উক্তি প্রত্যুক্তিদ্বারা কবিতার পূরণ করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় এ স্থলে মহাকবির বিশেষ দৃষ্টি অন্য দিকেই ছিল। তিনি যে বাসন্তীকে মানুষীভাব দিয়াই সাজাইতেছিলেন, তাহা

যেন এ স্থলে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া বাসন্তী যে বনদেবী—সমুদয় প্রকৃতির প্রতিরূপস্বরূপা, এবং পাপরূপ অনৈসর্গিক কার্য্যের সমক্ষে সঙ্কুচিতা বা মূর্চ্ছাপন্না, এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাস্তবিক উৎকট দুষ্ক্রিয়া মাত্রই এমনি অনৈসর্গিক ব্যাপার যে, তাহার অনুষ্ঠাতাকে সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিতে হয় যে, সমুদায় জগৎ তাঁহার দুষ্কৃতি জানিতে পারিতেছে এবং তাহা জানিয়া ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইতেছে। রাম অলোকসামান্যা, পরমপবিত্রা, পতিপরায়ণা, ধর্ম্মপত্নীকে বিবাসিত করিয়া অতি অনৈসর্গিক কার্য্যই করিয়াছিলেন। এই জন্য এ স্থলে বনদেবীর মূর্চ্ছা কল্পিত হইয়াছে, এবং বোধ হয়, ভবভূতির মনে ঐ ভাব কিছু অধিক প্রবল হইয়াছিল এবং তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্যই তিনি বাসন্তীর মানুষীভাব বিস্মৃতকল্প হইয়াছেন। যাহা হউক, ভবভূতি অনৈসর্গিক কার্য্যকেই পাপ কার্য্য বলিয়া যেন স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন।

---

(৬)

উপাঙ্কে সূচিত রামের অনুতাপের সবিস্তর বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কবি প্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে, সীতাবিবাসন কার্য্যটী অনৈসর্গিক অতএব পাপ-কার্য্য, রামের মনে এই ভাবের উদ্বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে মানুষের পক্ষে কিরূপ কার্য্য অনৈসর্গিক, তাহা স্পষ্টতর করিয়া দেখাইতেছেন।

বনদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার মোহভঙ্গের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

তৎকিমিদমকার্য্যমনুষ্ঠিতং দেবেন ?

তবে কেন দেব! এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ?

রাম বলিলেন,

লোকো ন মৃষ্যতীতি।

লোকে সহ্য করে না বলিয়া।

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—

তৎ কস্য হেতোঃ।

তাহা কিসের কারণে?

রাম বলিলেন—

স এব জানাতি কিমপি।

কি, তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

অয়ি কঠোর যশঃ কিল তে প্রিয়ং
কিময়শো নন্নু ঘোরমতঃপরম্।
কিমভবদ্‌বিপিনে হরিণীদৃশঃ
কথয় নাথ কথং বত মন্যসে।

হে কঠিন! যশই তোমার প্রিয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঘোরতর অযশঃ আর কি আছে? হায়! বিপিনে মৃগনয়নার কি হইল, হে ভূপতে! তাহার কিরূপ অনুমান কর, বল।

পাঠক দেখুন যে, আজি কালি লোকে যেরূপ "সহজ জ্ঞানের" (ইনটুইষণ) দ্বারা কোন্ কার্য্য ভাল, কোন্ কার্য্য মন্দ, ইহা নিশ্চয় করিয়া লইবার জল্পনা করে, এখানে সেরূপ "সহজ জ্ঞানের" কোন কথাই নাই। আবার আজি কালির প্রগল্‌ভস্বভাব নবীনদিগের মুখে এরূপও শুনা গিয়া থাকে যে, "কি ভাল, কি মন্দ, তাহা লোকের কথায় বুঝিতে হয় না" এখানে সে কথাও নাই। বোধ হয়, ভবভূতির মতে লোকে ভাল মন্দ বলিলে তাহা অগ্রাহ্য না করিয়া সে কথা সহেতুক কি অহেতুক—সেই কথা পরবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী, লোকের অভি-মতির-অনুরূপ কিংবিরূপ হইতে পারে,—তাহা বিচার করিয়া পাপ পুণ্যের অবধারণ করাই বিধেয়।

পাঠক দেখুন যে, বনদেবী রামের যশোলিপ্সার তাদৃশ নিন্দা করিলেন না। কিন্তু যশের অভিলাষে তিনি যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে

ঘোরতর অপযশই হইয়াছে, এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন। অপকর্ম্মদ্বারা অযশঃ ভিন্ন প্রকৃত যশঃ হয় না। অতএব পাপ পুণ্যের বিচার লোকমুখ অতিক্রম করিয়া হইতে পারে না। যেহেতু লোকমুখই সাধারণতঃ সমস্ত সংসারের প্রতিরূপস্বরূপ।

বনদেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অরণ্যে পরিত্যক্তা সীতার কি দশা হইয়াছে, ভাবিয়াছিলেন কি?

রাম তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত অতএব নিরাশমনেই বলিলেন—

কিমত্র মন্তব্যম্—
ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টে
স্তস্যাঃ পরিস্ফুরিতগর্ব্ভভরালসায়াঃ।
জ্যোৎস্নাময়ীব মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্পা
ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা॥

আর কি মনে করিব——

ত্রাসযুক্ত এক বৎসর বয়স্ক কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলদৃষ্টিশালিনী, স্পন্দিত গর্ব্ভের ভরে মন্থরা সেই সীতার জ্যোৎস্নাময়ী, কোমল এবং মনোহর মৃণাল সদৃশ দেহলতা নিশ্চয়ই শ্বাপদগণকর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।

সীতার কুরঙ্গের ন্যায় বিলোল দৃষ্টি এবং মৃণালকল্প অঙ্গলতিকার অনুধ্যানে রামের মনে সীতার মূর্ত্তি স্ফুটীকৃত হওয়ায় যেন তাঁহার অস্তিত্বের প্রতীতি জাগরিত হইয়া উঠীল। কবি তাদৃশ ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্তই বোধ হয় ছায়াময়ীর মুখে এই উক্তি দিয়াছেন।

অজ্জউত্ত এসা ধরামি—
আর্য্যপুত্র এই আমি জীবিত আছি।
রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন—
হা প্রিয়ে জানকি! ক্বাসি।
হা প্রিয়ে জানকি কোথায় আছ?

নাটকে নির্দ্দেশ না থাকিলেও এই স্থলে রাম পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বিলাপ

বাক্য কহিয়া ডাক ছাড়িয়া কান্দিয়াছিলেন। কারণ ইহার পরেই কবি ছায়াময়ীর মুখে কহিলেন—

হদ্ধী হদ্ধী অজ্জউত্তো পমুক্ককণ্ঠং রুণ্ণো!

হা ধিক্ হা ধিক্ আর্য্যপুত্র মুক্তকণ্ঠে রোদন করিলেন।

কবি এ স্থলে তমসার মুখ দিয়া রামের তাৎকালিক বিলাপ এবং অনুতাপের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিলেন। তমসা বলিলেন—

সাম্প্রতিকমেবৈতৎ কর্ত্তব্যানি দুঃখিতৈর্দুঃখনির্ব্বাপনানি।
পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোকক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥

ইহা যুক্তই, বিলাপদ্বারাই দুঃখনির্ব্বাপণ করিতে হয়।

জলাশয়ের জলবৃদ্ধিরূপ উপদ্রব ঘটিলে তাহার জল নির্গত করিয়া দিলেই যেমন তাহার প্রতীকার হয়, সেইরূপ শোক ক্ষোভ উপস্থিত হইলে বিলাপ দ্বারাই হৃদয় শান্ত হয়।

পাঠক, তমসার দৃষ্টান্তটী দেখুন, তিনি যে জলময়ী নদী, তাহা কবির কেমন মনে রহিয়াছে।

তমসা বলিতে লাগিলেন—

বিশেষতঃ রামভদ্রস্য বহুতরপ্রকার কষ্টো জীবলোকিঃ।
ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা
প্রিয়াশোকো জীবং কুসুমমিব ঘর্ম্মঃ ক্লময়তি।
স্বয়ং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোঽপ্যসুলভ
স্তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি ননু লাভো হি রুদিতম্॥

বিশেষতঃ সংসারে রামভদ্রের নানাবিধ কষ্ট। অবহিতমনে এই পৃথিবী পালনীয়; কিন্তু উত্তাপ যেমন কুসুমকে ম্লান করে, সেইরূপ প্রিয়াশোক ইহাঁর জীবনকে গ্লানিযুক্ত করিতেছে। আপনি ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং বিলাপের দ্বারাও শোকের শান্তি সম্ভাবিত নহে। তবে বিলাপ নিষ্ফলও নহে, যেহেতু উহাদ্বারা অদ্যাপি জীবনধারণ হইতেছে।

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, পাপ-কার্য্যের পর যে অনুতাপ জন্মে, তৎসম্বন্ধেও ভবভূতির মত নব্য মত হইতে ভিন্ন। ভবভূতি আর্য্যপণ্ডিত, আর্য্যপণ্ডিতদিগের মনে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার একান্ত অচ্ছেদ্য অভেদ্য স্থিরভাব অতিপূর্ব্বকালাবধি জাজ্বল্যমানরূপে প্রত্যক্ষীভূত। তাঁহারা কার্য্যকারণসম্বন্ধের কদাপি প্রকৃত উচ্ছেদ হইতে পারে, ইহা (লোকশিক্ষা বা সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে যাহাই বলুন,) মনে মনে কখনই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে কি পাপ কি পুণ্য কিছুরই ক্ষালন নাই। অনুতাপ পাপের অবশ্যম্ভাবি ফল মাত্র,—প্রায়শ্চিত্ত নহে। দুষ্কৃতির উপর অনুতাপ হইলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে আত্মার প্রকৃত ভাব, (যাহাকে আধুনিকেরা আধ্যাত্মিক জীবন কহেন) এখনও বর্ত্তমান আছে, সম্পূর্ণ বিকৃত হয় নাই। পাপের ক্ষালন হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আজি কালি পুস্তকে বক্তৃতায় কথোপকথনে সর্ব্বদাই যে অনুতাপ শব্দটীর ব্যবহার হইয়া থাকে, সেটী ইংরাজি "রিপেণ্টান্স" বা মুসলমানি "তোবা" শব্দেরই অনুবাদ মাত্র। অনেকে মনে করেন যে, রিপেণ্টান্স বা তোবা দ্বারাই খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্মমতে একবারে পাপের ক্ষালন হইয়া যায়। অতএব অনুতাপদ্বারাও তাহাই হয় ; অর্থাৎ পাপ-কার্য্যের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু ভবভূতি তাহা বলেন না। অতএব ভবভূতির অনুতাপ এবং নব্য অনুতাপ বিভিন্ন পদার্থ। এই জন্যই ভবভূতি তমসাকে দিয়া বলাইলেন,

"তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি নন্বু লাভো হি রুদিতম্।"

অদ্যাপি যে উচ্ছ্বাস হইতেছে, অর্থাৎ জীবনরক্ষা হইতেছে, তাহাই রোদনের লাভ।

অনুতাপের প্রকৃত ফল কি, তাহা বলিয়া দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক যে ফল, অর্থাৎ লোকের বিরাগমোচন, এবং অত্যাচরিতের মন্যুপরিহার, কবি এই তৃতীয়াঙ্কের উত্তর ভাগে তাহা কেমন সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন, পরে দৃষ্ট হইবে।

(৭)

তৃতীয়াঙ্কের যে পর্য্যন্ত সমালোচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, রাম এবং ছায়াময়ী সীতা উভয়ের পঞ্চবটীতে আগমন, স্থিতি ও তথা হইতে তিরোধান একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তৃতীয়াঙ্কের প্রথম ভাগে (উপাঙ্কে) বর্ণিত কার্য্যগুলি যদিও সমুদায় অঙ্কে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপ মাত্র; তথাপি সেইগুলি ক্ষণমাত্রে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। আর সবিস্তরে তৃতীয়াঙ্কের ব্যাখ্যা যে পর্য্যন্ত করা হইয়াছে, তাহাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকিবে যে, কি ছায়াময়ীর, কি বাসন্তীর, কি তমসার মুখ দিয়া কবি যখন যে উক্তি বাহির করিয়াছেন, তৎসমুদয় রামের নিজেরই তত্তৎকালোচিত মনোগত ভাবের অনুরূপ কথা হইলেও হইতে পারে।

অতএব সপ্রমাণ হইতেছে যে, তৃতীয়াঙ্কে ছায়াময়ী রামের সহচারিণী; তৃতীয়াঙ্কের সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নে বা মোহে যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষণকাল মধ্যেই নিষ্পন্ন; এবং তৃীতয়াঙ্কের উক্তি প্রত্যুক্তি সকল এক রামহৃদয়েরই বিলোড়নস্বরূপ—এমন ভাবে আভাসিত। সুতরাং সমুদায় তৃতীয়াঙ্কটী রামের বিরহমোহেরই রূপকবর্ণনায় পর্য্যবসিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইতেছে না। শোকাদি যে কোন ভাব অতি প্রবলরূপে মানবমনে অধিষ্ঠিত হইলে জড়জগৎ যে জীবিতরূপে প্রতীয়মান হয়, বাসন্তী ও তমসা বিরহশোকমুগ্ধ রামের সেই ভাবের ব্যঞ্জক। আর মৃতবন্ধুক ব্যক্তিরা যে, সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ স্বপ্নাবস্থায়, আপনাদিগের হৃদয়মধ্যেই সেই সেই বন্ধুর ইঙ্গিত পরামর্শাদি গ্রহণে কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকেন, ছায়াময়ী সীতা রামের প্রেমময় হৃদয়ের সেই অবস্থার পরিচায়ক। ভবভূতি ষষ্ঠ অঙ্কে এই কথা একপ্রকার অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, যথা—

চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্ম্মায় পুরতঃ
প্রবাসেপ্যাশ্বাসং ন খলু ন করোতি প্রিয়জনঃ।

জগজ্জীর্ণারণ্যং ভবতি হি বিকল্পব্যুপরমে।
কুকূলানাং রাশৌ তদনু হৃদয়ং পচ্যতইব॥

দীর্ঘ কাল একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া নির্ম্মিতাকাররূপে সম্মুখে স্থাপিত প্রিয়জন বিপ্রযুক্ত হইয়াও সান্ত্বনা প্রদান করে। কিন্তু সে প্রকার ভ্রমের নিবৃত্তি হইলে জগৎ জীর্ণারণ্যবৎ অসার প্রতীয়মান হয়। তখন হৃদয় যেন তুষাগ্নির রাশিতে দগ্ধ হইতে থাকে।

বস্তুতঃ পঞ্চবটী বনে রাম একাকী, তাঁহার সীতা-বিয়োগ-শোক উদ্দীপিত, সেই শোকের সময়ে বাহ্য জগৎ বাসন্তী তমসাদিরূপে এবং অন্তর্জগৎ ছায়াময়ী সীতারূপে তাঁহার অন্তরাত্মার প্রতি কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত করিতেছিল, কবি তৃতীয়াঙ্কে তাহাই দেখাইয়াছেন।

এক্ষণে অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এরূপ বর্ণনায় নাটকের কোন্ প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে তৃতীয়াঙ্কটী যে উত্তরচরিতের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, সেই উত্তরচরিত নাটকের উদ্দেশ্য কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ প্রধানতঃ রামায়ণ হইতেই সংগৃহীত— কেবল ইহার একটী কথা রামায়ণ হইতে ভিন্ন। সে কথাটী [illegible] সহিত সীতার পুনর্মিলন। রামায়ণ প্রবন্ধে রামকর্ত্তৃক সীতার পরিত্যাগ, এবং তদনন্তর সীতার রসাতল-প্রবেশ, এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া কাহার হৃদয়ে প্রগাঢ় শোক এবং ভয়ের আবির্ভাব না হয়? সীতা তেমন সাধ্বী, তেমন রামপ্রেমময়ী নায়িকা; রাম তেমন অগাধসত্ত্ব মহাপুরুষ, তেমন অনুকূল নায়ক, তথাপি তাঁহাদের সংসারযাত্রার পরিণাম যে তেমন শোচনীয় হইল, ইহা ভাবিয়া সংসারিমাত্রেরই হৃদয় ভীতি এবং সংশয়ে সমাকুল হয়। ঐরূপ ভয় এবং সংশয়ে সংসারের প্রতি গৃহী জনের অনাস্থা জন্মিতে পারে। জাতিবিশেষের ও ধর্ম্মবিশেষের প্রকৃতি অনুসারে সংসারের প্রতি তাদৃশ অনাস্থা যদিও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য না হউক, কিন্তু আর্য্যপণ্ডিতদিগের মতে তাদৃশ অনাস্থা সংসারাশ্রমের নীতির অনুগত নহে। এই জন্যই অনেকানেক

আর্য্য পণ্ডিত রামায়ণের আখ্যানে আধ্যাত্মিক ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য যে ঈশ্বরের লীলামাত্র, এই ভাব প্রকটন-পূর্ব্বক উল্লিখিত ভীতিসংশয়াদির নিরাকরণচেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবভূতি যথাসাধ্য লৌকিক ভাব রক্ষা করিয়াই উত্তরচরিতে রামসীতার পুনর্ম্মিলন সাধনপূর্ব্বক লোকের শোকসংশয়াদির উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন বোধ হয়। কবির মনের এই ভাবটি সপ্তমাঙ্কে রাম এবং লক্ষ্মণের উক্তিতে যেন প্রকাশিত দেখা যায়। সীতা রসাতলগামিনী হইলে রাম বলিলেন—

কথং বিলয় এব বৈদেহ্যাঃ সম্পন্নঃ! হা দেবি, দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা চারিত্রদেবতে! লোকান্তরং পর্য্যবসিতাসি?

ইতি মূর্চ্ছতি।

কিন্তু বৈদেহী বিলয়প্রাপ্ত হইলেন! হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা দেবচরিত্রে! তুমি লোকান্তর প্রস্থান করিলে? এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

ভগবন্ বাল্মীকে! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব এষ কিং তে কাব্যার্থঃ?

ভগবন্ বাল্মীকে! পরিত্রাণ করুন্ পরিত্রাণ করুন্। এই কি তোমার কাব্যের প্রয়োজন?

লক্ষ্মণ প্রাণের দায়ে পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব বলিয়া যে চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহাই যেন রামায়ণপাঠকসাধারণের হৃদ্গত শোকের পরিচায়ক, এবং সেই শোক নিবারণের প্রার্থনা। রামায়ণ পাঠকের মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, সীতার ন্যায় গৃহিণী ও রামের ন্যায় গৃহীর সংসারের অবস্থা যদি চরমে এইরূপ হয়, তাহা হইলে জগতে সংসারসুখের বাসনা আর কে করিবে?—সুতরাং তাঁহাদের মতে রামায়ণের নির্ব্বহণ কার্য্য অন্যরূপ হইলে ভাল হইত। ভবভূতি লক্ষ্মণের মুখ দিয়া সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তিনি বাল্মীকির হইয়া রামসীতার পুনর্ম্মিলন সাধনপূর্ব্বক সেই শোক নিবারণ ও সেই প্রার্থনার পূরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, রামসীতার পুনর্মিলনের পক্ষে রূপকময় তৃতীয়াঙ্কের উপযোগিতা কতদূর।

ঐ উপযোগিতার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমতঃ একটি বৈদেশিক নাটকের উপাখ্যানাংশ গ্রহণ করিলাম। ঐ নাটকে বর্ণিত আছে,—এক রাজা তাঁহার ধর্ম্মশীলা পতিপরায়ণা পত্নীর প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ষোড়শ বৎসর পরে তাঁহার সেই সন্দেহ যায়, এবং তখন তিনি অনুতাপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অনন্তর রাজ্ঞীর একটি পাষাণময়ী মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে, শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে যান, এবং তৎসমীপে অনেক করুণবিলাপ করেন। বস্তুতঃ ঐ মূর্ত্তিই জীবিতা রাজপত্নী স্বয়ং। তিনি স্বামীর করুণবিলাপে বিগতদুঃখা হইয়া পুনর্ব্বার স্বামীসহ মিলিতা হইয়াছিলেন।

ফলতঃ পতিকৃত গুরুতর অবমাননায় অবমানিতা পত্নীর মর্ম্মান্তিক দুঃখ ঐরূপে বই যে আর কিছুতেই যাইবার নহে, ইহা সাধারণ প্রতীতি। অবমানিতা শোকবিহ্বলা স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,—"আমি মরি, এবং মরিয়া দেখিতে পাই, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, তাহা হইলেই দুঃখ যায়।" যে কবি স্ত্রীলোকদিগের মনের এই ভাবটি ভাল করিয়া বুঝেন, তিনি বৈদেশিকই হউন, আর দেশীয়ই হউন, তাঁহাকে পরিত্যক্তা স্ত্রীর স্বামীর সহিত পুনর্মিলন সাধন করিতে হইলে স্ত্রীকে গতপ্রাণার ন্যায় প্রতীয়মান করাইয়া স্বামীর 'কান্না' শুনাইতে হয়। স্বামীর অবিচলিত প্রগাঢ় প্রেমের, তদীয় দুষ্কৃতিনিবন্ধন প্রকৃত অনুতাপের এবং লোক-লজ্জা-নিবারক তাদৃশ কোন প্রকাশ্য ব্যবহারের নিদর্শন ব্যতিরেকে পরিত্যক্তা স্ত্রী, ঈষন্মাত্র আত্মগৌরব সত্ত্বে, পরিত্যাগকারী স্বামীকে পুনর্গ্রহণে সম্মতা হইতে পারেন না। সাধ্বীদিগের হৃদয়ে আত্মগৌরব অতি প্রবল ভাবেই বিরাজ করে। তাঁহারা যতই কোমলা, শীতলা, আত্মবিসর্জ্জনে প্রবণা ও আত্মবিলোপে সক্ষমা হউন, তাঁহাদিগের সাধ্বীতাটিই জ্বলন্ত হুতাশন-স্বরূপ। জগতীতলে সাধ্বীপ্রতিমা সীতাও সুতরাং ঐরূপ একটি অগ্নিশিখা। ভূতধাত্রী পৃথিবী এবং ত্রিলোক-

পাবনী গঙ্গাও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আবয়োরপি যৎসঙ্গাৎ পবিত্রত্বং প্রকুয্যতে" (যাঁহার সংসর্গ লাভে আমরাও পবিত্র হইয়াছি।) এমন সীতাকে যে রাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন সাধন করিতে হইলে লোককে অবশ্যই দেখাইতে হইবে যে, রাম সীতাকে গতপ্রাণা জানিয়া তাঁহার জন্ম প্রকৃত দুঃখে দুঃখী এবং নিজ দুষ্কৃতিবশতঃ প্রকৃত অনুতাপে অনুতপ্ত।

যদি অনুতাপাদি প্রকাশ ব্যতিরেকে সীতাকে আনিয়া রামের সহিত মিলান হইত, তাহা হইলে লোকের মনস্তুষ্টি হইতে পারিত না। প্রত্যুত সীতার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিত। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সপ্তমাঙ্কে কালিদাস যে ভাবে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পুনর্মিলন সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজের মনেও যেন একটু খুঁত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। দুষ্মন্ত নিজ দুষ্কৃতিজন্ম অনুতাপে অনুতপ্ত হইয়া যখন বলিলেন—

প্রজাগরাৎখিলীভূত স্তস্যাঃ স্বপ্নসমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুংচিত্রগতামপি॥

নিদ্রার অভাবে স্বপ্ন সমাগম রহিত হইয়াছে, চিত্রাঙ্কিত করিয়াও তাহাকে দেখিবার উপায় নাই—কারণ নয়নবারি দৃষ্টি রোধ করে।

তখন মিশ্রকেশী বলেন—

সব্বধা পমজ্জিদং তুএ পচ্চাদেস দুক্‌খং
পিঅ সহীএ পচ্চক্‌খং জ্জেব সহীজণস্স।

প্রিয়সখীর পরিত্যাগদুঃখ তুমি তাহার সখীর সমক্ষে সম্পূর্ণরূপেই ক্ষালন করিলে।

এখানে গূঢ় ভাবটি এই—পরিত্যক্তা শকুন্তলা নিজে দুষ্মন্তের অনুতাপ দেখিল না বটে, কিন্তু সেই জন্যই কবি যেন আপনার মনকে বুঝাইলেন—শকুন্তলা দেখিল না—তাহার সখী দেখিল ত।

আবার যখন সপ্তমাঙ্কে সপুত্রা শকুন্তলা দুষ্মন্তের সম্মুখবর্ত্তিনী, এবং পুত্র জিজ্ঞাসা করিল—

অম্ব কো এসো—

মা! কে এ?

তখন শকুন্তলা উত্তর করিলেন—

ভাঅধেআইং পুচ্ছ।

ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।

উত্তরটী বড় চমৎকার-জনক। চমৎকার-জনক এই জন্য যে কবি শকুন্তলার মনের ভাব যেরূপ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে ঐ প্রকার কথা অপেক্ষা অধিক সুসঙ্গত অপর কোন কথা মনেই আনিতে পারা যায় না। কিন্তু শকুন্তলার মনের ভাবটী কেমন? ঐ মনটী স্বতঃই প্রেমে গদ্‌গদ, অতি নম্র; কিন্তু উহা হইতে পরিত্যাগদুঃখ এবং অপমানলজ্জা অপনীত হয় নাই। কবিকে এই জন্যই দুষ্মন্তকে দিয়া শকুন্তলার পায়ে ধরাইতে হইল। যথা—

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীক মপৈতুতে
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবং প্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহি শঙ্কয়া॥

ইতি পাদয়োঃ পততি।

হে সুগাত্রি! হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যানদুঃখ দূর কর। কি জন্য জানি না, তখন আমার মনে প্রবল মোহ জন্মিয়াছিল। মোহান্ধ লোকদিগের শুভ বিষয়েও এই রূপ আচরণ হইয়া থাকে। অন্ধ ব্যক্তির মস্তকে পুষ্পমালা নিক্ষেপ করিলেও সে সর্পাশঙ্কায় ফেলিয়া দেয়। এই বলিয়া চরণে পতিত হইলেন।

কিন্তু ইহাতেও হইল না। কবি দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবেই যে দুষ্মন্তের

বিস্মৃতি জন্মিয়াছিল, তাহা শকুন্তলাকে বুঝাইয়া মহামুনি মরীচিকে দিয়া আজ্ঞা করাইলেন।

বৎস্যে! বিদিতার্থাসি তদিদানীং
সহধর্ম্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ করণীয়ঃ।

বৎসে! সমুদয় অবগত হইলে, এক্ষণে স্বামীর প্রতি আর ক্রোধ করিও না।

রামসীতার পুনর্ম্মিলন সম্বন্ধে ভবভূতি কোন খুঁৎ রাখেন নাই। তিনি তৃতীয়াঙ্কে রামের বিরহশোক বর্ণনাবসরে রামসীতার পুনর্ম্মিলনের পথ সম্যক্ রূপেই পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিলন সময়ে সপ্তমাঙ্কে অরুন্ধতী সীতাকে মূর্চ্ছাপন্ন রামের নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন—

ত্বরস্ব বৎসে বৈদেহি মুঞ্চশালীনশীলতাম্।
এহি জীবয় মে বৎসং প্রিয়স্পর্শেন পাণিনা॥

বৎসে সত্বর হও লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ কর; আইস প্রিয়স্পর্শ হস্তদ্বারা আমার বাছাকে বাঁচাও।

সীতা অমনি সসম্ভ্রমে গিয়া রামের শরীর স্পর্শপূর্ব্বক বলিলেন—

সমস্সসত্ত্ব অজ্জউত্তো।

আর্য্যপুত্র সমাশ্বস্ত হও।

কিন্তু যদি তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত রামের বিলাপাদি পূর্ব্বে শ্রুত না থাকিত, তাহা হইলে ঐ কথা এবং ঐ কার্য্যটী বড়ই বিসদৃশ বোধ হইত।

অতএব ভবভূতির পক্ষে সীতাকে গতপ্রাণাবস্থবৎ করিয়া রামের বিরহ-দুঃখ দেখাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল।

কিন্তু পক্ষান্তরে সীতা একান্ত রামপ্রেমময়ী, রামের নিকট তাঁহার ক্রোধ নাই, তেজ নাই, এমন কি, প্রায় অভিমান পর্য্যন্তও নাই বলিলেই হয়। তাঁহার জীবনের জীবন পর্য্যন্ত রামরূপ মোহন মন্ত্রের বশ।

রামকৃত অত্যাচারে তাঁহার যতই দুঃখ হউক, তিনি সমুদায় আপনার ভাগ্যেরই দোষ বলিয়াই মনে করেন। অন্যে তাঁহার হইয়া রামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সেই বিরক্তিতে তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি হয় না। তবে তাহা হয় না বলিয়া আপনি মনে মনে একটু লজ্জিত হয়েন বটে, এবং ঐরূপ লজ্জামধ্যে যে দুর্বিভাব্য অভিমানের গুণীভূত উন্মেষ থাকে, রামের প্রতি সীতার অভিমান সেই টুকু মাত্র।

এমন কোমল অপেক্ষাও কোমল অভিমানটীকে, এমন পবিত্র অপেক্ষাও পবিত্র প্রকৃতিটীকে সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভবভূতিকে রাম সীতার পুনর্মিলন সাধন করিতে হইয়াছিল। আমাদিগের বোধে এই জন্যই ভবভূতির তৃতীয়াঙ্কের অবতারণা, এবং তাহাতে ভাগীরথীর বরপ্রাপ্তা লোক-লোচনের অগোচরা ছায়াময়ী সীতার কল্পনা।

যদি ভবভূতি পূর্ব্বোল্লিখিত বৈদেশিক কবির অনুরূপ করিয়া উত্তর-চরিতের নায়িকা সীতাকে নিজ প্রতিমূর্ত্তিরূপে অবস্থাপিত করিয়া তাঁহাকে রামের বিলাপ শ্রবণ করাইতেন, তাহা হইলে কি ভাল হইত? সীতার গাঢ়তম প্রেমভাব এবং চিত্তের ঐকান্তিক সরলতা কি সেরূপ করিলে রক্ষা পাইত? সীতা কি অমন "সঙ সাজিয়া" বসিতে পারিতেন? সীতা কি রামকে দেখিয়াই চকিতা, উৎকণ্ঠিতা, স্বেদরোমাঞ্চপূর্ণা হইতেন না? অথবা—

"ণেহ্ন মং অত্তণো অঙ্গেসুং বিলঅং অম্বা"

মা! আমাকে নিজ অঙ্গে লীন করিয়া লও।

বলিয়া পৃথিবীতে মিলিয়া যাইতে চাহিতেন না? আর যদি সীতা ওরূপে "সঙ সাজিয়া" স্বামীর অনুরাগের এবং অনুতাপের প্রমাণ লইতে বসিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই সীতা কি আর ভবভূতির বা আমাদের সীতা থাকিতেন?

অতএব এক পক্ষে সীতাকে রামের বিলাপ ও মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখাইবার প্রয়োজন, আবার পক্ষান্তরে যদি সীতা তাহা দেখিতে পারেন, তবে তাঁহার প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—এই বৈষম্য বিবেচনা করিয়া কবি ছায়াময়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন। রামের হৃদয়বাসিনী সীতার সমক্ষে রাম কান্দিলেন। যথোচিত হইল—লোকে তুষ্ট হইল। সীতা সপ্তমাঙ্কে বলিয়াছেন—

জাণাদি অজ্জউত্তো সীতাদুক্খং পমজ্জিদুং।

সীতার দুঃখ কেমন করিয়া মোচন করিতে হয়, তাহা আর্য্যপুত্র জানেন।

আমরা বলি, ভবভূতিই জানিতেন, তিনি কিরূপ করিয়া বর্ণন করিলে রামের প্রতি লোকের মন্যু বিগত হইবে, এবং যে সীতা সেই সীতা থাকিয়াই রামের সহিত পুনর্ব্বার মিলিতা হইতে পারিবেন।

---

(৮)

তৃতীয়াঙ্কের উপাদান যে রামের বিরহমোহ; এবং ঐ অঙ্কের প্রণয়ন ব্যতিরেকে যে রাম সীতার পুনর্মিলন লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না, তাহা প্রতিপাদন করা গিয়াছে। এক্ষণে রামকৃত অনুতাপের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ যে সুপ্রণালীতে ঐ পুনর্মিলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখান যাইতেছে। রাম স্বকৃত দুষ্কার্য্য নিবন্ধন অনুতাপে দগ্ধ হইয়া বলিলেন,

কষ্টং ভোঃ কষ্টম্!

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দ্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

কি কষ্ট! কি কষ্ট!

গাঢ় উদ্বেগে হৃদয় দলিত হইতেছে, কিন্তু দ্বিখণ্ড হইতেছে না। শরীর অবশ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না। অন্তর্দ্দাহে তনু দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু একবারে ভস্মসাৎ হইতেছে না। মর্ম্মচ্ছেদী বিধি প্রহার করিতেছে, কিন্তু জীবন কর্ত্তন করিয়া ফেলিতেছে না।

ছায়াময়ীর মুখেও বাহির হইল,

এবং ম্নেদং।

এইরূপই বটে।

রাম আপনার দুঃখ মনে করিতে করিতে অবশ্যই ভাবিয়া থাকিবেন, সীতাও অবিকল এইরূপ বিরহযাতনা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাহা ভাবুন বা না ভাবুন, কবি দেখাইলেন যে, এই অবস্থা হইতেই সীতার অন্তঃকরণে সহানুভূতির সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। অনন্তর যাহাদের জন্য তাঁহাদিগের এত দুঃখ, সেই পৌরজানপদদিগকে রামের মনে পড়িল, একটু ক্রোধ হইল, কিন্তু ক্রোধের ছিটা মাত্র—অভিমানই অধিক। প্রজার উপর রামের যে ক্রোধ হইতে পারে না, সে জন্য হউক বা না হউক, এখন রাম শোকে এবং অনুতাপে দগ্ধ, ক্লিষ্ট এবং মলিন; এ অবস্থায় লোকের মনে ক্রোধ অপেক্ষা অভিমানই অধিক হয়, সুতরাং ক্রোধের স্থানে অভিমান দেখা দিল। রাম বলিলেন—

হে ভবন্তঃ পৌরজানপদাঃ!

ন কিল ভবতাং স্থানং দেব্যা গৃহেঽভিমতংতত
স্তৃণমিব বনে শূন্যে ত্যক্তা ন চাপ্যনুশোচিতা।
চিরপরিচিতাস্তে তে ভাবাঃ পরিভ্রময়ন্তি মাম্
ইদমশরণৈরদ্যাপ্যেবং প্রসীদত রুদ্যতে॥

হে পৌরজানপদ মহাশয়েরা! দেবীর গৃহে অবস্থিতি তোমাদের অভিমত হয় নাই, এ জন্য শূন্য বনে তৃণের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছি,

এবং ত্যাগ করিয়াও অনুশোচনা করি নাই। চিরপরিচিত এই সকল পঞ্চবটী প্রভৃতি পদার্থ নিচয় আমাকে বিকলচিত্ত করিতেছে! অতএব এখনও প্রসন্ন হও, আমি নিরুপায় ভাবে এইরূপ ক্রন্দন করি—অর্থাৎ সীতার জন্য আমি কাঁদিতেছি বলিয়া অপ্রসন্ন হইও না।

ঐ সময়ে রামের মনে আশা ভরসা কিছুই ছিল না। এখন কি তিনি ভাবিতে পারেন যে, সীতা বাঁচিয়া আছেন? তিনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা।

নিশ্চয়ই শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অঙ্গলতিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

অতএব পৌরজনেরা প্রসন্ন হইয়া অনুমতি দিলে তিনি সীতাকে পুনরায় ঘরে আনিবেন, এরূপ ভাব সুসঙ্গত হয় না। বাস্তবিক রাম একান্ত অভিমানে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, হে পৌরগণ! আমি তোমাদের কথায় অনেক করিয়াছি, এমন যে সীতা, তাঁহাকেও তৃণবৎ ত্যাগ করিয়াছি, এখন তাঁহার জন্য একটু কাঁদি তোমরা অপ্রসন্ন হইও না।

রাম এরূপ বলায় সীতার মনে কি হইতে পারে? যাহাদিগের কথায় রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল লোকের প্রতি রামের ক্রোধ এবং অভিমান প্রকাশিত হওয়ায় সীতার যে অবশ্যই কিছু মনস্তুষ্টি হওয়া সম্ভব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবভূতি কি নিপুণ বুদ্ধিতেই ছায়াময়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন, অথবা সীতার চরিত্র বুঝিয়াছিলেন! তিনি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া এ স্থলে কোন কথাই বাহির করিলেন না। কেন করিলেন না? সীতা যে পৌরজনদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন, অথবা তাহাদের প্রতি রামের বিরক্তি দেখিলে তুষ্ট হইতে পারেন, তাহার কোন চিহ্ন দিবেন না বলিয়া? না রামের মন পৌরজনদিগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহার হৃদয়স্থিতা ছায়াময়ী সুতরাং অন্তর্হিতা হইলেন, সেই জন্য?

বনদেবী রামকে অতিক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে রাম বলিলেন—

কিমত্রোচ্যতে ধৈর্য্যমিতি!

দেব্যা শূন্যস্য জগতো দ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ।

লুপ্তং সীতেতি নামাপি ন চ রামো ন জীবতি?॥

ধৈর্য্যের কথা কি বলিতেছ? এই সীতা শূন্য জগতে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল; সীতার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু রাম অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে! অর্থাৎ রামের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ধৈর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

পাঠক এ স্থলে একটি প্রকৃত বিবরণ শুনুন্। কোন মহাপুরুষ আপনার সহধর্ম্মিণী-বিযুক্ত হইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি গঙ্গাতীরে সমানীত হইলে বলিয়াছিলেন, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া যে চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, আজিকার চিতায় তাহা নিবিবে। ভবভূতি রামের মুখে যে কথা দিয়াছেন, তাহা এই প্রকৃত কথারই অনুকরণ।

রামের এরূপ মর্ম্মভেদী বাক্যশ্রবণে সীতার মনে সহানুভূতি অবশ্যই এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহাতে তাঁহার মনে যেন একটু ভ্রম জন্মিতেও পারে। রাম যে তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন বলিয়াই দুঃখভোগ করিতেছেন, এ ভাবটি সীতার মনে আর স্থান পাইবে না। রামও যেমন মধ্যে মধ্যে অতি দুঃখে কাতর হইয়া সীতার প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে 'নিষ্করুণে' 'কোপনে' 'চণ্ডি' প্রভৃতি নির্দ্দয়শীলতা-ব্যঞ্জক সম্বোধন করিয়া থাকেন, রামহৃদয়বাসিনী সীতা নিজেও যে কখন কখন সেইরূপ আপনার প্রতি দোষারোপ করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রত্যুত আমারই জন্য ইনি এত কষ্ট পাইতেছেন, ভাবিয়া কখন কখন সীতার হৃদয়ে আত্মগ্লানি জন্মিবে। কবি ছায়াময়ী এবং তমসার মুখ দিয়া ঐ ভাবই ব্যক্ত করিলেন। ছায়াময়ী বলিলেন—

মোহিদম্হি এদেহিং অজ্জউত্তবঅণেহিং।

আর্য্যপুত্রের এই সকল বচনে মোহিত হইতেছি।

তমসা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেন—

নৈতাঃ প্রিয়তমা বাচঃ স্নেহার্দ্রাঃ শোকদারুণাঃ।

এতাস্তা মধুনোধারা শ্চ্যোতন্তি সবিষাস্ত্বয়ি॥

স্নেহার্দ্র কিন্তু দুঃসহ শোকব্যঞ্জক এই সকল কথা কেবল প্রিয় কথা নয়; এই সকল বাক্যালাপ বিষদিগ্ধ মধুধারাস্বরূপ হইয়া তোমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

রামের স্নেহবাক্য মধুর, এবং তাঁহার দুঃসহ শোকজনিত সীতাহৃদয়ের আত্মগ্লানিই বিষ।

রাম যে কত কষ্ট পাইতেছেন, তাহার বর্ণন করিয়া বলিলেন,

' ময়া খলু—

যথা তিরশ্চীন মলাতশল্যং

প্রত্যুপ্তমন্তঃ সবিষশ্চ দংশঃ।

তথৈব তীব্রো হৃদি শোকশঙ্কুঃ

মর্ম্মাণি কৃন্তন্নপি কিং ন সোঢ়ঃ॥

অন্তরে বক্রভাবে প্রোথিত জলদঙ্গার নির্ম্মিত শল্যের ন্যায়, এবং বিষাক্ত দংশনের ন্যায় হৃদয়ে নিহিত তীব্র শোকশঙ্কু আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে, তাহা কি আমি সহিতেছি না?

এইবারে ছায়াময়ীর মুখ দিয়া সীতা হৃদয়ের অবশ্যম্ভাবিনী আত্মগ্লানি স্পষ্টই প্রকাশিত হইল—

এব্বংম্হি মন্দভাইণী পুণো বি আআসআরিণী অজ্জউত্তস্‌স।

আমি এমন মন্দভাগিনী, আবার আর্য্যপুত্রের আয়াসকারিণী হইলাম!

রাম নিজ দুঃখ-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—

এবমতিনিষ্কম্পস্তম্ভিতান্তঃকরণস্যাপি মম সংস্তুততত্তৎপ্রিয়বস্তুদর্শনা দদ্যাস্ন-মাবেগঃ—

তথাহি

লোলোল্লোলক্ষুভিতকরুণোজ্জৃম্ভণস্তম্ভনার্থং
যো যো যত্নঃ কথমপি ময়া ধীয়তে তংতমস্তঃ।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা প্রসরতি বলাৎ কোঽপি চেতোবিকার-
স্তোয়স্যেবা প্রতিহতরয়ঃ সৈকতং সেতুমোঘঃ॥

এই প্রকার অতি স্থির এবং এবং গভীরান্তঃকরণ হইলেও আমার সেই সেই পরিচিত প্রিয়বস্তু দর্শনে অদ্য এই আবেগ উপস্থিত হইয়াছে। অতি প্রবলরূপে বিলোড়িত ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্বেগনিরোধার্থ আমি কষ্টস্বষ্টে যে যে যত্ন করিতেছি, কি জানি কি অনির্ব্বচনীয় চিত্তবিকার, অপ্রতিহত বেগ জলপ্রবাহ যেমন বালুকাময় বাঁধ ভগ্ন করে তদ্রূপ, সেই সেই যত্ন ভেদ করিয়া চিত্তে প্রসরলাভ করিতেছে।

একটু বিশিষ্টমনে দেখিলে এ স্থানে কবির অপরিসীম মানবচিত্তজ্ঞতা'র বিশেষরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। রাম আপনার দুঃখসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে দিতে তাহার হেতু নির্দ্দেশ সহ একটী সীমাবন্ধন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মম সংস্তুততত্তৎপ্রিয় বস্তুদর্শনাদদ্যায়মাবেগঃ।"

পূর্ব্ব পরিচিত সেই সেই প্রিয় বস্তু দর্শনে অদ্য আমার এই আবেগ। অতএব রামের বলা হইল যে, প্রিয়বস্তু দর্শনই তাঁহার আবেগের কারণ, এবং ঐ আবেগ ঐ কারণে ঐ দিনই ঘটিয়াছে। রাম নিজ দুঃখ-প্রাবল্যের বিশেষ হেতু এবং কালের উল্লেখ করাতে বিরহদুঃখপ্রাবল্যের যে তাদৃশ কোন কারণ সীতার সম্বন্ধে সে সময়ে উপস্থিত হয় নাই, এরূপ আভাস দিয়াছেন।

অতএব ছায়াময়ীর মুখে বাহির হইল—

এদিণা অজ্জউত্তস্স দুব্বারদারুণারম্ভেণ দুক্‌খসংখোহেণ পপ্‌ফুরিদণিঅ-দুক্‌খং বিঅ আকম্পিদংমে হিঅঅং।

আর্য্যপুত্রের এই অনিবার্য্য এবং দুঃসহ দুঃখাবেগে আমার নিজ দুঃখ যেন প্রস্ফুরিত হইয়া আমার হৃদয় কম্পিত করিতেছে।

পাঠক দেখুন, এই কথায় যদিও রামের দুঃখে সীতার সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে বটে, তথাপি সহানুভূতির আতিশয্যে পূর্ব্বে যে আত্মগ্লানির অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধ হইয়াছিল, সে আত্মগ্লানির লক্ষণ, রামের ওরূপ কথার পর আর কিছুই নাই। এখন সীতার দুঃখকে রামের দুঃখ হইতে স্বতন্ত্র-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রাম নিজ দুঃখের যে হেতুনির্দ্দেশ এবং সীমা-বন্ধন করিয়াছিলেন, কবি তাহার উচিত ফলই দেখাইলেন। বোধ হয়, ভবভূতি মনে করিয়াছিলেন যে, যদিও রামের হৃদয় বিরহতাপে গলিয়াছিল বটে, তথাপি যেন আরও একটা আঁচ লাগাইবার প্রয়োজন আছে। তিনি সেই আঁচ লাগাইতে চলিলেন। বনদেবী একটী লতাকুঞ্জগৃহ দেখাইয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

দেব দেব!

> অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
> সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্‌গোদাবরীসৈকতে।
> আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
> কাতর্য্যাদরবিন্দকুড্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

হে দেব! (এক সময়ে) সেই সীতার পথ পানে চাহিয়া তুমি এই লতাগৃহেই ছিলে। সীতা হংসের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে গোদাবরীর সিকতাময় তীরভূমিতে বিলম্ব করেন। প্রত্যাগত হইয়া তোমাকে উৎ-কণ্ঠাকুল দেখিয়া কাতর ভাবে পদ্মকুঁড়ির ন্যায় মনোহর প্রণামাঞ্জলি বিধান করিয়াছিলেন।

যদি পাঠকদিগের মধ্যে কেহ মৃতবন্ধুক থাকেন, এবং মনে করিতে পারেন যে, জীবদ্দশায় সেই বন্ধুর প্রতি কখন ক্রোধ বা বিরাগ করিয়া-ছিলেন, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, এখন তাহা স্মরণ হইলে তাঁহাদিগের আত্মগ্লানি কেমন হৃদয়দ্রাবক তীব্রভাব উৎপাদন করে। আবার যদি মনে পড়ে যে, সেই বন্ধু একান্ত নম্র এবং বিনীত ভাবে, তাঁহাদিগের সেই ক্রোধ ও বিরাগের শান্তি করিয়াছিলেন, তবে আর অনুতাপাগ্নির ইয়ত্তা

থাকে না—উহার তেজে হৃদয় কেবল দ্রবমাত্র হয় না বাষ্পবৎ হইয়া উবিয়া যায়। রামের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত কাতরবদনে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সীতা ঐ লতাগৃহে একবার তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, রাম যেন আবার তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার যে সহিষ্ণুতা ছিল, বলিতেছিলেন, আর তাহা রহিল না। সীতার সেই কাতরমুখ, সেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুখানি, বন-ভূমির সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতে লাগিলেন। এরূপ "হৃদয়মর্ম্মগূঢ়শল্যঘট্টনে" তিনি বলিয়া ফেলিলেন—

চণ্ডি জানকি! ইতস্ততোদৃশ্য স ইব নচানুকম্পসে?

হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ংস্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি।

ইতি মূর্চ্ছতি।

অয়ি কোপনে জানকি! যেন তুমি ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছ, কৈ দয়া করিতেছ না?

হায় হায়! দেবী! হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের বন্ধন গ্রন্থি সকল শিথিল হইতেছে, আমি জগৎ শূন্য দেখিতেছি; অবিরত জ্বালায় আমার অন্তর জ্বলিতেছে; কাতর অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া যেন অন্ধকারে মগ্ন হইতেছে; মোহ আমার চারিদিক আবরণ করিতেছে। হতভাগ্য আমি এখন কি করি?

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

(৯)

ভবভূতি কেমন নিখুঁত করিয়া রাম সীতার পুনর্মিলনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাইবে।

তিনি অনুতাপাগ্নিদগ্ধ রামের প্রতি সীতার সহানুভূতির সঞ্চার, রামের দুঃখে সীতার হৃদয়ে আত্মগ্লানির উদ্বোধ, এবং তৎসহ সহানুভূতির বৃদ্ধি; পরে রামের সহিষ্ণুতার সম্যক্ পরিহার এবং তাঁহার মোহ—ক্রমান্বয়ে এই ভাবগুলি বর্ণন করিয়া এক্ষণে সীতার মনে রাম সহ পুনর্মিলনাভিলাষের আতিশয্য যেরূপে হইতে পারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ক্রমশঃ তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম মূর্চ্ছিত হইলে ছায়াময়ীও সুতরাং মূর্চ্ছিতা হইলেন। রামহৃদয়ে সীতার প্রথম উদ্বোধনস্বরূপ বনদেবী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—

হা প্রিয়সখি সীতে! কাহসি? সম্ভাবয়াত্মনো জীবিতেশ্বরম্।

হা প্রিয়সখি সীতে! কোথায় আছ? আপনার জীবিতেশ্বরকে বাঁচাও।

ছায়াময়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামের হৃদয় এবং ললাটে স্পর্শ করিলেন।

রাম বলিলেন,—

আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ রন্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতূন্।
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মাদানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহং॥

অমৃতময় প্রলেপদ্বারা সর্ব্বশরীরকে যেন ভিতর বাহিরে লিপ্ত করত, স্পর্শ আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আনন্দোৎপাদনদ্বারা অকস্মাৎ অন্যবিধ মোহ বিস্তার করিতেছে।

সখি বাসন্তি! দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে।

সখি বাসন্তি! বড় সৌভাগ্য!

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—

দেব! কথমিব?

দেব! কিরূপ?

রাম উত্তর করিলেন—

কিমন্যাৎ, পুনঃ প্রাপ্তা জানকী।

অন্য আর কি, জানকীকে আবার পাইয়াছি।

বাসন্তী। অয়ি দেব! ক সা?।

হে দেব! কৈ তিনি?

রামঃ। পশ্য—নন্বিয়ং পুরত এব।

দেখ, এই আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। অয়ি! কিমিতি মর্ম্মচ্ছেদদারুণৈরেভিঃ প্রলাপৈঃ?

মর্ম্মচ্ছেদকারী নিদারুণ এ সকল প্রলাপ কি জন্য?

রামঃ। সখি কুতঃ প্রলাপাঃ?।

সখি প্রলাপ কোথা?

গৃহীতো যঃ পূর্ব্বং পরিণয়বিধৌ কঙ্কণধর-
শ্চিরং স্বেচ্ছাস্পর্শৈ রমৃতশিশিরৈর্যঃ পরিচিতঃ।
সএবায়ং তস্যাস্তুহিনকরকোপম্যস্থভগো
ময়া লব্ধঃ পাণির্ললিতলবলীকন্দলনিভঃ॥

বিবাহ সময়ে কঙ্কণধর যে কর আমি পূর্ব্বে ধারণ করিয়াছিলাম, অমৃতের ন্যায় শীতল যে কর স্বেচ্ছাধীন স্পর্শদ্বারা চিরপরিচিত, তুষার এবং করকার তুল্য স্নিগ্ধ লবলীনবপল্লববৎ কোমল তাঁহার সেই এই কর আমি লাভ করিয়াছি।

মোহগ্রস্ত রাম এই সময়ে মনে করিয়াছিলেন যেন সীতার হাতটি ধরিয়াছেন। তিনি বলিলেন—

আনন্দনিমীলিতেন্দ্রিয়ঃ সাধ্বসেন
পরবানস্মি, তৎ তং তাবদেনাং ধারয়।

আনন্দে আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম জড়ীভূত হইয়াছে। আমি বিকল হইয়া পড়িয়াছি। অতএব তুমি ইহাঁকে ধারণ কর।

বাসন্তীর হস্তে তুলিয়া দিবার সময় ছায়াময়ী সুতরাং আপনার হস্ত সরাইয়া লইলেন। রাম এতক্ষণ সীতার স্পর্শসুখ এমন গাঢ় ভাবে অনুভব করিতেছিলেন যে, হাতটী সরিয়া গেলে বলিলেন—

করপল্লবঃ স তস্যাঃ সহসৈব জড়াজ্জড়ঃ পরিভ্রষ্টঃ।
পরিকম্পিণঃ প্রকম্পী করান্মম স্বিদ্যতঃ স্বিদ্যন্॥

তাঁহার সেই জড়ীভূত কম্পমান স্বেদযুক্ত করপল্লব সহসা আমার জড়ীভূত কম্পযুক্ত স্বেদবিশিষ্ট কর হইতে পরিভ্রষ্ট হইল।

রামের এই সময়ের অবস্থাটী বুঝিতে হইলে কবি তাঁহার মুখ দিয়া ষষ্ঠাঙ্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন—

"চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্ম্মায় পুরতঃ
প্রবাসেঽপ্যাশ্বাসং নখলু ন করোতি প্রিয়জনঃ।"

'নিয়ত ধ্যানযোগে নির্ম্মিতাকারবৎ সম্মুখে স্থাপিত প্রিয়জন বিযুক্ত হইয়াও সান্ত্বনা প্রদান করে।'

রাম সীতার হাত সরিয়া গেলেও আশ্বাস পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সেই ধ্যানগম্যা পুরোবর্ত্তিনীবৎ প্রতীয়মানা সীতাকে দেখিতে লাগিলেন। কিরূপ দেখিলেন, তাহা তমসার উক্তিতে কবি প্রকাশ করিতেছেন।

সস্বেদরোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা।
মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধুতসিক্তা কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব॥

প্রিয়তমের স্পর্শসুখে বাছার শরীরে স্বেদ, রোমাঞ্চ ও কম্প হইতেছে। অতএব ইহাকে বায়ুবিকম্পিত ও নবজলসিক্ত মুকুলিত কদম্বশাখার ন্যায় দেখাইতেছে।

সীতাকে এরূপ সাত্ত্বিকভাবসম্পন্না দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে একটু লজ্জিতা মনে করাও রামের পক্ষে অসঙ্গত নহে। বোধ হয়, কবি সেই ভাবই সীতার মানসোক্তিতে ব্যক্ত করিতেছেন।—

অম্মহে! অবসেণ এদেণ অত্তাণএণ
লজ্জাবিদম্হি ভঅবদীএ তমসাএ,

কিংত্তি কিল এসা মণিস্সদি-এসো
সে পরিচ্চাও, এসো অ হি অআসঙ্গো ত্তি।

আমার আত্মা এরূপ অবশ হওয়ায় ভগবতী তমসার নিকটে আমায় লজ্জা পাইতে হইল। ইনি কি মনে করিবেন? ইনি মনে করিবেন—এই তোমার পরিত্যাগ, আবার এই হৃদয়ানুরাগ।

রাম এই সময়ে তদীয় অনবস্থিত স্তিমিত মূঢ় ও ঘূর্ণৎ মোহলক্ষণাক্রান্ত নয়ন দ্বারা সীতার অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া বলিলেন—

হা কথং নাস্ত্যেব! নিষ্করুণে বৈদেহি!—

হায় কে নাইই ভবে! হে নির্দয়ে বৈদেহি!

সীতা। সচ্চং অকরুণম্হি; জা এবং বিধং তুমং পেক্খন্তী পং ধরাম্হি এব্ব জীবিদং।

সত্যই আমি নির্দয় হইয়াছি, যে আমি তোমাকে এই প্রকার দেখিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।

রামঃ। ক্বাসি দেবি! প্রসীদ ন মামেবংবিধং পরিত্যক্তু মর্হসি

কোথা দেবি প্রসন্ন হও, ঈদৃশাবস্থ আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না।

সীতা। অই অজ্জউত্ত বিবরীদং বিঅ এদং।

হে আর্য্যপুত্র ইহা বিপরীত।

বাসন্তী। দেব প্রসীদ প্রসীদ স্বেনৈব লোকোত্তরেণ ধৈর্য্যেণ সংস্তম্ভয়াতি-ভূমিংগতবিপ্রলম্ভমাত্মানং, কুতোঽত্র মে প্রিয়সখী?

হে দেব প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও, প্রিয়াবিয়োগশোক পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব স্বীয় অলৌকিক ধৈর্য্য দ্বারা আপনাকে শান্ত কর। আমার প্রিয়সখী এখানে কোথায়?

রামঃ। ব্যক্তং নাস্তি! কথমন্যথা বাসন্ত্যপি তাং ন পশ্যেৎ! অপি খলু স্বপ্ন এষঃ? নচাস্মি সুপ্তঃ; অথবা কুতো রামস্য স্বপ্নঃ? সর্ব্বথা স এব ভগবাননেকবারপরিকল্পনানির্ম্মিতো বিপ্রলম্ভঃ পুন পুনরনুবধ্নাতি মাম্।

সত্যই নাহি; অন্যথা বাসন্তীও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না কেন? ইহা কি তবে স্বপ্ন? কিন্তু আমিত নিদ্রিত নই। অথবা রামের স্বপ্ন কোথায়? বারম্বার কল্পনা প্রসূত ভ্রমই আমার পুনঃ পুনঃ অনুসরণ করিতেছে।

সীতা। মএ এব্ব দারুণাএ বিপ্পলদ্ধো অজ্জউত্তো।

আমি নিষ্ঠুর, আমাকর্ত্তৃকই আর্য্যপুত্র প্রতারিত হইতেছেন।

পাঠক দেখুন, যে অবস্থায় সীতার মনে পুনর্ব্বার আত্মগ্লানির উদয় হইতে পারে, কবি আবার যেন তাঁহাকে সেই অবস্থায় আনিলেন। বস্তুতঃ সহানুভূতির আতিশয্যে আত্মগ্লানির ঢেউ কেমন করিয়া উঠে, এবং পড়ে আবার উঠে, ভবভূতি প্রেমিকের হৃদয়ের এই লহরীলীলাটী দেখাইলেন।

---

(১০)

রামের সীতাবিরহশোক যেরূপে বর্ণিত হইলে সীতার অন্তঃকরণে সহানুভূতির সঞ্চার হয়, এবং সেই সহানুভূতির আতিশয্যে আত্মগ্লানি জন্মে, এবং আত্মগ্লানিনিবন্ধন পুনর্মিলনের অভিলাষ উদ্রিক্ত হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে দেখাইয়া কবি তাহার পর ঐ অভিলাষ যাহাতে বর্দ্ধিত এবং ক্রমশঃ পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা দেখাইতে চলিলেন।

কবি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সীতার জন্য রাম পূর্ব্বে যে যে কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমতঃ স্মরণ করাইলেন। বনদেবী বলিলেন,—

দেব! পশ্য পশ্য—

পৌলস্ত্যস্য জটায়ুষা বিঘটিতঃ কার্ষ্ণায়সোঽয়ংরথঃ
পশ্যৈতে পুরতঃ পিশাচবদনাঃ কঙ্কালশেষাঃখরাঃ।
খড়্গাচ্ছিন্নজটায়ুপক্ষতি রিতঃ সীতাং জ্বলন্তীং বহ-
ন্নন্তর্ব্যাকুলবিদ্যুদম্বুদ ইব দ্যামভ্যুদস্থাদরিঃ॥

হে দেব! দেখ দেখ—জটায়ু-কর্ত্তৃক ভগ্ন কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত রাবণের এই রথ পড়িয়া আছে। আর সম্মুখভাগে এই সকল পিশাচের ন্যায় বদন

বিশিষ্ট তাহার রথাখ অস্থিমাত্রাবশেষ হইয়া আছে। এই স্থান হইতে অরি (রাবণ) খড়্গদ্বারা জটায়ুর পক্ষ ছিন্ন করিয়া প্রদীপ্তরূপা সীতাকে বহনপূর্ব্ব চঞ্চল তড়িদ্গর্ভ অম্বুদের ন্যায় আকাশে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল।

রামের স্ফটিকস্বচ্ছ হৃদয়ে পূর্ব্বঘটনাগুলি একেবারে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। তিনি যেন ভয়ব্যাকুল সীতার মুখখানি দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার 'পরিত্রাহি' ডাক শুনিতে পাইলেন, এবং জটায়ুহন্তা সীতাপহারী রাবণকে যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অপরাধীর দণ্ডদানার্থ বেগে উত্থিত হইলেন। কিন্তু পরেই বলিলেন,—

> অন্বর্থ এবায়মধুনা প্রলাপো বর্ত্ততে-
> উপায়ানাং ভাবাদবিরতবিনোদব্যতিকরো
> বিমর্দ্দৈর্বীরাণাং জগতি জনিতাত্যদ্ভুতরসঃ।
> বিয়োগো মুগ্ধাক্ষ্যাঃ স খলু রিপুঘাতাবধিরভূৎ
> কথংতূষ্ণীং সহ্যো নিরবধিরয়ং ত্বপ্রতিবিধঃ॥

একক্ষণে এই প্রলাপ অম্বিতার্থই হইতেছে—

যে বিয়োগে সীতাপ্রাপ্তির উপায় সমস্তের সদ্ভাব প্রযুক্ত বিরহদুঃখাপনয়নের সম্পর্ক ছিল, যে সীতা বিয়োগ বীরদিগের পরস্পর সংগ্রামদ্বারা জগতে উৎকট অদ্ভুত রসের উৎপাদন করিয়াছিল, মুগ্ধাক্ষী সীতার সেই বিপ্রয়োগের সীমা শত্রুনাশ পর্য্যন্তই ছিল। কিন্তু এখনকার এই বিরহের আর সীমা নাই, এবং কিছুতেই ইহার আর প্রতিবিধানও হইতে পারে না। অতএব কেমন করিয়া স্থিরভাবে এরূপ বিরহ সহ্য করা যায় ?

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামের সীতাবিরহ ঘটিয়াছিল, তাহার সীমা ছিল, এবারকার বিরহের সেরূপ সীমা নাই। এই নিরবধিত্বের প্রতীতিই রামের বিশেষ দুঃখ, সুতরাং ছায়াময়ীর ক্রন্দনেরও কারণ। কবি নিরবধি শব্দের পুনরুক্তি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া করাইয়া দেখাইলেন যে, ঐ সকল পূর্ব্ব বিবরণস্মরণে রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন হয়, এরূপ অভিলাষ অবশ্যই অধিকতর বর্দ্ধিত হইবে।

রাম বলিতে লাগিলেন,—

হা কষ্টম্!

ব্যর্থং যত্র কপীন্দ্রসখ্যমপি মে বীর্য্যং হরীণাংবৃথা
প্রজ্ঞা জাম্ববতোঽপি যত্র ন গতিঃ পুত্রস্য বায়োরপি।
মার্গং যত্র ন বিশ্বকর্ম্মতনয়ঃ কর্ত্তুং নলোঽপিক্ষমঃ
সৌমিত্রেরপি পত্রিণামবিষয়ে তত্র প্রিয়ে ক্বাসি মে॥

হা কষ্ট!

যেখানে বানররাজ সুগ্রীবের সখ্য ব্যর্থ—কপিসৈন্যদিগের বলবিক্রমের কোন ফল নাই—যেখানে জাম্বুবানের বুদ্ধি খাটে না,—যেখানে পবনপুত্র হনুমানের গতি নাই—বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলও যেখানে পথ করিতে অক্ষম, যে স্থান সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণেরও বাণের অবিষয়ীভূত, প্রিয়ে! এক্ষণে এমন কোন্ স্থানে তুমি রহিয়াছ?

যে সীতার জন্য সেই সমস্ত অসাধ্যসাধন করা হইয়াছিল, যে সীতার জন্য জগজ্জেতা রাবণকে জয় করা হইয়াছিল, সেই সীতা কেবল প্রেমময়ী কোমলা বরবর্ণিনী মাত্র নহেন, তিনি মহা গৌরবান্বিতা ও বহু সম্মানিতা। রামের মনে এই ভাবের উন্মেষ কবি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া ব্যক্ত করিলেন,—

বহু মন্নাবিদম্হি পূর্ব্ব বিরহং।

পূর্ব্ব বিরহ আমি শ্লাঘ্য বলিয়া মানিতেছি।

এ দিকে সীতার আত্মগৌরববুদ্ধিই যে রাম সহ পুনর্মিলনের সহকারী ভাব হইবে, তাহাও দেখান হইল।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই পর্য্যন্ত হওয়াতেই যথেষ্ট হইল। বাস্তবিক, সহানুভূতি, আত্মগ্লানি, অভিলাষ এবং আত্মগৌরব এই কয়টি ভাবকে ক্রমান্বয়ে আনিয়া রামসীতার পুনর্ম্মিলনের পথ অতি পরিষ্কারই করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই জন্যই ইহার পর রাম বনদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রামের হৃদয় উদ্ঘাটিত হইতে দেওয়ায় লোকে তাঁহার প্রতি বিগতমন্যু; এবং সীতাসহ তাঁহার

পুনর্ম্মিলন হয়, এরূপ ইচ্ছাযুক্ত হইয়াছে। তমসা আর রামকে ঐক্ষাক রাজা বা 'জগৎপতি' বলেন না। বাসন্তীও অনেকক্ষণ হইতে 'মহারাজ' 'দারুণ' 'কঠোর' প্রভৃতি অপ্রণয় বা নিন্দাব্যঞ্জক সম্বোধন প্রয়োগ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। রামের প্রতি অতিরিক্ত হৃদয়াসক্তি নিবন্ধন ছায়াময়ীর মুখ দিয়া আর লজ্জাব্যঞ্জক উক্তি বাহির হয় না।

কিন্তু ভবভূতির সমীচীন বিবেচনায় আরও একটু বাকি ছিল। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে, রাম, সীতার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রবন্ধন এবং রাবণ বিজয় প্রভৃতি যে সকল অবদানপরম্পরা সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অবিমিশ্ররূপে সীতার গৌরবখ্যাপন করে না। ঐ সকল কার্য্যে সীতার উদ্ধার হইয়াছিল বটে, এবং ঐ সকল কার্য্য সীতার জন্যই বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বৈরনির্য্যাতন, কুলগৌরব রক্ষা, বীরত্বপ্রকাশ, ত্রিলোকের আধিপত্যলাভ প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনও সংসাধিত হইয়াছিল। অতএব যাহাতে সীতার বিশুদ্ধ আত্ম-গৌরবই জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশ পায় পায়, সেরূপ কোন ব্যাপারের অবতারণা করা আবশ্যক। কবি এক্ষণে তাহা করিতে চলিলেন, এবং সেই জাজ্বল্যমান দীপ্তির সহিত কোন কোন প্রণয়ক্ষেত্রে যে একটি কালিমময় ছায়া পড়িয়া থাকে, সেই ছায়াটুকুও ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন। রাম বনদেবীর স্থানে বিদায় প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিলেন—

অস্তি চেদানী মশ্বমেধ'য় সহধর্ম্মচারিণী মে—

এক্ষণে অশ্বমেধের নিমিত্ত আমার সহধর্ম্মচারিণী আছেন। রামের মুখে ওরূপ কথা শুনিলে প্রকৃত সীতার যে ভাব হইতে পারে রাম হৃদয়বাসিনী ছায়াময়ীরও তাহাই হইল। ছায়াময়ী কাঁপিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—

উজ্জউত্ত কা সা ?

আর্য্যপুত্র কে সে ?

এই ভাবটি প্রেমগৌরবে গৌরবান্বিতা সৌভাগ্যবতীদিগের হৃদয়ের তামসী নিশা। যখন যখন তাঁহারা এই অন্ধকারে পড়েন, তখন তাঁহা-

দিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—আর জ্ঞান থাকে না। যাঁহারা বিশেষ না জানেন তাঁহারা বলেন যে, প্রণয়ক্ষেত্রমাত্রেই এই ছায়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু ভবভূতি জানিতেনযে তাহা নহে। এই ছায়া প্রেমের সৌভাগ্য ক্ষেত্রেই পতিত হয়। যেখানে সোহাগ অধিক এরূপ ঈর্ষা সেই খানেই দেখা দেয়। যদি সীতা পূর্ব্বেই রামের সোহাগে আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া না মনে করিতেন, যদি পূর্ব্বেই 'বহুমগ্নাবিদহ্মি' না বলিতেন, তবে এখানকার 'অজ্জউত্ত কা সা' কথাটি তেমন অতি সুসঙ্গত হইত না। রাম বলিলেন—

হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতিঃ
সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

ভবভূতি বর্ণন করিলেন যে, রামের এই কথায় অমনি ছায়াময়ীর সমুদায় হৃদয়কোষ শূন্য করিয়া যেমন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—

অজ্জউত্তো দাণিং সি তুমং। অম্মহে উক্খাণিতং মে দাণিং পরিচ্চা-অলজ্জাসল্লং অজ্জউত্তেণ।

এক্ষণে তুমি আর্য্যপুত্র। অহো আর্য্যপুত্র এক্ষণে আমার পরিত্যাগজনিত লজ্জাশল্য উদ্ধার করিলেন।

এই এত ক্ষণে—অর্থাৎ রাজসভামধ্যে প্রকাশ্যরূপে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতি-কৃতি সংস্থাপিত হওয়াতে লজ্জাশল্য সমূলে উৎখাত হইল। রাম বলিতে লাগিলেন—

তত্রাপি তাবৎবাষ্পদিগ্ধং চক্ষুর্বিনোদয়ামি।

তাহাকে দেখিয়াই এক একবার বাষ্পকলুষিত চক্ষুকে বিনোদিত করি।

কবি ছায়াময়ীকে দিয়া বলাইলেন—

ধঞ্ঞা সা জা অজ্জউত্তেণ বহু মণ্ণাইঅদি, জাঅ অজ্জউত্তং বিণোদঅন্তী আসাণিবন্ধণং জাদা জীঅলোঅস্স।

সেই ধন্যা, যে আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক সম্মানিতা হইয়াছে, এবং যে আর্য্যপুত্রকে বিনোদিত করিয়া জীবলোকের আশার কারণ হইয়াছে।

তমসা বুঝাইয়া বলিলেন—

অয়ি বৎসে! এবমাত্মা স্তূয়তে।

বৎস! ইহাতে যে আপনারই স্তব করা হইল।

কবির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। ছায়াময়ী আর আপনাকে মন্দভাগিনী মনে করিতে পারিলেন না। পরিত্যাগে লজ্জার কারণ নাই- প্রত্যুত বিশুদ্ধ আত্মগৌরবের কারণই দেখা দিল,—পুনর্মিলনের পথ সর্ব্বতোভাবেই পরিষ্কৃত হইল।

কবি ইহার পর তমসার মুখ দিয়া সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিলেন—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্ত্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারা
নম্ভো যথা সলিল মেব তু তৎসমগ্রম্॥

জল যেমন ঘূর্ণি, ফেন, তরঙ্গ প্রভৃতি রূপভেদ আশ্রয় করে, কিন্তু তৎসমস্তই জল; সেই প্রকারে এক করুণ রসই নিমিত্তভেদে ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পরিবর্ত্ত বা মূর্ত্তিভেদ ধারণ করে।

ইহার নিষ্কৃষ্টার্থ এই যে, এই তৃতীয়াঙ্কে যাহা যাহা বর্ণিত হইল, তাহা এক করুণ রসেরই প্রকারভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সমালোচনের পরিসমাপ্তি কালে আমরাও বলিব—

নৃণাং হৃদ্গত-গূঢ়-তত্ত্ব-কলনে, প্রীতেঃ প্রকাশে ক্রমাদ্
বন্ধ-গ্রন্থি গণস্য, ভেদ কথনে পাপস্য পুণ্যস্য চ।
সাধ্বী-বীর-চরিত্রয়োঃ প্রকটনে, চা, হন্তোপমাবর্জ্জিতাম্,
মন্যন্তেঽস্য বুধাঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞস্য বাণীমিমাম্॥

বিবিধ প্রবন্ধ।

রত্নাবলী।

শ্রীহর্ষ প্রণীত।

(১)

রত্নাবলী নাটিকা সংস্কৃতের একটী সুপ্রসিদ্ধ সুন্দর বস্তু। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা দোষ প্রকরণ ভিন্ন অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রায় অপর সকল প্রকরণেই রত্নাবলী হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে, আলঙ্কারিকদিগের নির্দ্দেশিত দোষ ভাগ ইহাতে অতি বিরল, এবং তাঁহাদিগের বিধি-সম্মত উৎকর্ষ বহুলপরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান আছে। এবম্প্রকার গ্রন্থ রচনায় রচয়িতার পাণ্ডিত্য, বিবেকশক্তি, সহৃদয়তা এবং সক্রুচির যে সম্যক্ পরিচয় হয় তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার বিবেকশক্তির একটী বিশেষ পরিচয় এই যে, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র না পাইয়াও এবং সংস্কৃতে অন্যান্য মহাকবিগণ নাটক রচনা সম্বন্ধে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, দেখিয়াও রত্নাবলীকার তদীয় নাট্যোল্লিখিত ব্যাপার সমস্তের সংঘটনকাল এবং সংঘটন-স্থান একোদ্যমে এক রঙ্গভূমিতেই প্রদর্শনের উপযোগী হয়, এরূপ করিয়া ব্যবস্থিত করিয়াছেন। রত্নাবলী নাটিকার চারি অঙ্কে বর্ণিত অভিনেয় সমস্ত কার্য্যপরম্পরা এক দিবসের সন্ধ্যার প্রাকাল হইতে পর দিবসের রাত্রিশেষের মধ্যে সম্পন্ন এরূপ মনে করা যাইতে পারে, এবং সেই ঘটনাবলীর স্থান উক্ত নাটিকার নায়ক রাজা উদয়নের বাটী এবং তাঁহার প্রমোদোদ্যান মাত্র। অভিনেয় বস্তুর সহিত অভিনয়ের এরূপ সন্নিহিত সঙ্গতি রক্ষা আর কোন সংস্কৃত নাটকের রচনায় দৃষ্ট হয় না। শকুন্তলার অভিনয়-দর্শককে এক স্থানে বসিয়া প্রহরৈক রাত্রির মধ্যে, কখন দুষ্মন্তের

সহিত কণ্বমুনির তপোবনে, কখন রাজসভায়, কখন গিরিশিখরে,—এই রূপে নানা স্থানে, শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্ত রাজার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হওয়ার পর তদীয় ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রের সিংহশাবকের সহিত ক্রীড়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর কাল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যিনি উত্তর রামচরিতের অভিনয় দর্শন করিতে বসিবেন, তাঁহাকেও দণ্ড কয়েকের মধ্যে কখন অযোধ্যায়, কখন পঞ্চবটীতে, কখন বাল্মীকির তপোবনে—এইরূপে অন্ততঃ বার বৎসর পর্য্যটন করিতে হইবে। এই রূপ সংস্কৃত নাটকের প্রায় সর্ব্বত্র। রত্নাবলীর অভিনয় দর্শনে দর্শককে সেরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। অভিনীত ব্যাপার যে প্রকৃত ব্যাপার, তাঁহার এরূপ মনে করিবার ইচ্ছা হইলে সে ইচ্ছার অধিক ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। রত্নাবলীর অভিনয়-দর্শক যে প্রকৃত ব্যাপারই দর্শন করিতেছেন, এই ভ্রমের সুখস্বাদ তাঁহার আরও একটী কারণে লব্ধ হইতে পারে। রত্নাবলীর ঘটনাবলী রাজা রাজড়ার ঘরে যেরূপ উপকরণ লইয়া যেরূপ ভাবে সচরাচর সংঘটিত হয়, বা হইতে পারে শুনা যায়, সেই রূপেই সম্পাদিত। ইহাতে একজন মনীষী ধর্ম্মভীরু রাজা কোন মুনির শাপপ্রভাবে বহুলবিশ্রম্ভালাপিনী হৃদয়-প্রেম-প্রতিমা ধর্ম্মপত্নী সম্বন্ধে একবারে স্মৃতিবিমূঢ় হইয়া আবার একটি অঙ্গুরীয়মাত্র দর্শনে লব্ধসংজ্ঞ হয়েন না। অথবা কোন ছিন্নশীর্ষ ব্যক্তি দিব্যরূপ ধারণ করিয়া গিরি নদী নির্ঝরিণ্যাদি বর্ণন পূর্ব্বক দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা আপন হন্তাকে শ্রবণ করান না। রত্নাবলীতে আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে এক ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি ভিন্ন আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহাও ইন্দ্রজাল বলিয়াই স্বীকৃত, অলৌকিক ঘটনা নহে। অতএব অন্যান্য অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক অপেক্ষাও রত্নাবলীতে যেমন অভিনেয় বস্তুর সহিত অভিনয়ের দেশ কাল সম্বন্ধে সুসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে, তেমনি পাত্রের এবং কার্য্যাদিরও সম্যক্ সঙ্গতি আছে। আরও একটী নাটকীয় গুণে রত্নাবলীর

শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। নাটক পদার্থ মুখ্যতঃ অভিনয়ে দেখিবার—পুস্তকে পড়িবার বস্তু নহে। সুতরাং নাটকের পূর্ব্বাপর সমস্ত ভাব এমন ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ, এবং ইহার প্রত্যেক ব্যাপার দর্শকের চিত্তপটে এরূপ গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক যে, অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বিলুপ্ত না হইয়া সমুদায় ব্যাপার প্রোজ্জ্বলভাবে দীপ্যমান থাকে, এবং যথাযথ রসোদ্ভাবনে সমর্থ হয়। স্মৃতিপটে সেরূপ দীপ্যমান থাকিবার বস্তু যেমন নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কার্য্য, তাহাদের বাক্য ভাব ইঙ্গিতাদি তেমন নহে। কারণ, কার্য্যগুলি দেখা যায়, এবং যাহা দেখা যায়, মানসচিত্রে তাহার অঙ্কন যেরূপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয়, যাহা কাণে শুনা বা মনে মনে অনুমান মাত্র করা যায়, তাহার বোধ সেরূপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় না। অতএব নাটকে বিশেষ ভাবোদ্দীপক কার্য্য সকলের প্রদর্শন করা আবশ্যক। কেবল নিতান্ত বাক্যমাত্রে তত্তৎভাব প্রকাশ করিলে নাটক ভাল হয় না। ফলতঃ উল্লিখিত পাত্রগণের দৃষ্টিলভ্য কার্য্য পরম্পরাই নাটক বা দৃশ্য কাব্যের জীবনস্বরূপ। সেই জীবন রত্নাবলী নাটিকায় যেরূপ নিপুণতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অপর কোন সংস্কৃত নাটকে সেরূপ হয় নাই। রত্নাবলী রচয়িতা যখন যে ভাবটীকে দর্শকের মনে উদ্দীপ্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন তাহা কেবল নটদিগের বাক্যমাত্রে রঞ্জিত না করিয়া তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ আমাদিগের বিবেচনায় নাট্যাংশে রত্নাবলীর তুল্য নাটক সংস্কৃতে দ্বিতীয় নাই।

তবে কি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে যে লিখিয়াছেন যে, "শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের পরে রত্নাবলীর নামনির্দ্দেশ হইতে পারে" আমরা এই সিদ্ধান্ত বাক্যের অপলাপে সাহসী হইতেছি? তাহা নহে। আমরা এই স্থলে যাহা বলিলাম তাহা তাঁহার সেই সংক্ষিপ্ত উক্তিরই "ভাষ্যভূত"।

---

(২)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, শকুন্তলা এবং উত্তর চরিতের পরেই রত্নাবলীর নাম নির্দ্দেশ হইতে পারে। তাঁহার এই কথাটী দ্বারা উক্ত দৃশ্য কাব্যত্রিতয়ের অগ্রপশ্চাদ্ভাবে বিনিবেশ উপলব্ধ হয়। কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ, উচ্চ নীচ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বস্তুদিগের আপেক্ষিক উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সেই সেই ভাবের প্রকৃত অবরোধ অনেক স্থলে বিলক্ষণ ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা। গুণ, রস বা সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ক জটিল-ভাব সম্বন্ধে, কি বিধাতৃসৃষ্ট পদার্থে, কি তদনুকারী কবিসৃষ্ট কাব্যে, ঐরূপ অগ্র পশ্চাৎ, উচ্চ নীচ প্রভৃতি রূপ রেখাঙ্কপাত দ্বারা পর্য্যায়ক্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জগতের সকল বস্তুরই স্ব স্ব গুণধর্ম্মে বিশিষ্টতা আছে। একের সমুদায় গুণ অন্য কিছুতেই ব্যাপ্যভাবে নাই। সুতরাং পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা-সম্বন্ধ-বিহীন বস্তুদিগকে স্ব স্ব প্রধানই বলা যাইতে পারে। তবে রুচিভেদে যে ব্যক্তির মন যে গুণের পক্ষপাতী, তিনি সেই গুণের তারতম্যানুসারে বস্তুদিগের অগ্রপশ্চাৎ ক্রম অনুমান করিয়া লয়েন, এবং যদি তিনি সাহিত্য সংসারের ব্যবস্থাপক হয়েন, তবে তৎকৃত সিদ্ধান্তই ব্যবস্থাস্বরূপে প্রচলিত হইয়া যায়।

বস্তুতঃ উত্তর চরিত, শকুন্তলা, এবং রত্নাবলী এই তিনটী দৃশ্যকাব্য পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতিক। তিনটী তিন প্রকারে প্রধান। উত্তর-চরিত গাম্ভীর্য্যে, শকুন্তলা বৈচিত্র্যে, এবং রত্নাবলী পারিপাট্যে। সংস্কৃত কাব্যোদ্যানে তিনটীই বিকসিত কুসুম। কিন্তু তিনটিই এক জাতীয় কুসুম নহে। উহাদের মধ্যে একটী পদ্ম, একটী গোলাপ, এবং একটী নবমল্লিকা। পদ্মটী গভীর সরসীর নির্ম্মল জলে অধিষ্ঠান করে, আপনার স্বচ্ছকান্তির ছায়ায় আপনিই হাসে, দেবদেবীর হাতে উঠে, এবং জগদ্বিধাত্রী ভগবতীর চরণে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক শোভা পায়। গোলাপটী

রাজোদ্যানের মধ্যস্থলে বিরাজ করে, রাগরঞ্জনে সকলের নয়নাকর্ষী হয়, ফুলের তোড়ার সর্ব্বোপরিভাগে উঠে, এবং বিলাসভবনে সমাদরে পরি-গৃহীত হয়। নবমল্লিকাটির স্থান বিভবশালীর আরাম, নায়কনায়িকার নিভৃত পর্য্যটনের অবসরই ইহার ফুটিবার সময়; এ অন্তের অনুবর্ত্তী, এবং ইহার মালা কামিনীর কবরী-বন্ধনে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই তিনটী কুসুমের মধ্যে একটী পূজার, একটী আমোদের এবং একটী আদরের সামগ্রী। প্রথমটীকে লইয়া নির্জ্জনে বসিলে তাহার মৃদুল অন্তঃপ্রসারী সৌরভে জীবাত্মা প্রসিক্ত হয়; দ্বিতীয়টীর দিগন্তব্যাপী সৌরভে সবন্ধু বান্ধবে উল্লাসপূর্ণ হওয়া যায়; তৃতীয়টীকে সঙ্গে করিয়া বিশেষ দুই জনে না বসিলে উহার সুস্নিগ্ধ আমোদের সম্যক্ উপভোগ হয় না। সহৃদয় পাঠক ইহা অবশ্যই বোঝেন যে, প্রকৃতরূপে উত্তর চরিতের রসানুভব করিতে হইলে তাঁহাকে সুগভীর চিন্তায় অবগাহন করিয়া যাইতে হয়, শকুন্তলার রসগ্রহ পাঠকমাত্রেরই সহজে হইয়া থাকে; এবং রত্নাবলীর রসে আপ্লুত হইতে চাহিলে পাঠককে উহা পাঠ করিয়া নিজ প্রিয়তমাকে শুনাইতে হয়। অতএব এই তিন খানি গ্রন্থই তিন প্রকার—তিনটীই, স্বতন্ত্ররূপ নিজগুণে প্রশংসনীয়।

কিন্তু এই সকল গুণপার্থক্য ভিন্ন উত্তর চরিত এবং শকুন্তলা অপেক্ষা রত্নাবলীর গঠন-প্রণালীতেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। প্রথম দুইটী নাটকে, রসের প্রারম্ভ অবধি তাহার বিবিধ পরিণতি পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, রত্নাবলীতে সেরূপ ক্রমান্বয় নাই। রসের বৃদ্ধিশীলতা, এবং তাহার একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রাপ্তি, প্রথমোক্ত দুইটীর সারভূত। তৃতীয়টীতে, রসের ভাব এমত স্থির যে, যেন পাত্রনিহিতের ন্যায় দৃশ্যমান। সুতরাং প্রথম দুইটীকে দেব-নদী ও তৃতীয়টীকে দেব-সরোবর বলা যাইতে পারে। কিন্তু নদী দুইটীও অবিকল একরূপ নহে। উহার একটী যেন ভাগীরথী—উহা জগতের সর্ব্বোচ্চ মহিমশালীর তুঙ্গশীর্ষে চিরসঞ্চিত পুঞ্জীভূত দ্রবময় বিশদ স্নেহসার, দারুণ বিলোড়নে হৃদয় বিঘট্টনপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন ও প্রপাতরূপ

হইয়া অগাধ করুণরস-প্রবাহে জগতীতলের পবিত্রতা সাধনপুরঃসর পাবনী ধারায় অদ্ভুত মহাসাগরকে পূর্ণ করিতেছে। অপরটী যমুনা—এটীর মূল অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রদেশে। উহা লক্ষলাঞ্ছিত হিমাংশুলক্ষীর সংস্পর্শে গলিত চন্দ্রকান্ত-মণি-শৈল হইতে বাহির হইতেছে, এবং আপনার সুবিস্তৃত স্বচ্ছ হৃদয়ে সমুদায় সংসারের প্রতিবিম্ব ধারণপূর্ব্বক মোহনবংশীরব সূচিত করিবার জন্যই যেন মধুর ভ্রমর গুঞ্জনধ্বনিতে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিতেছে। সরোবরটী স্বচ্ছ স্ফটিক-নিবদ্ধ মানস-সরোবর। ইহার বিশদ বারি আদিম প্রণয়োৎস হইতে স্বতঃ সমুদ্ভূত। ইহা দেব দেবীর বিলাসভূমি। এই লীলা-স্থলীতে জগৎপাতা শ্রীবৎসরাজ যুগ-ধর্ম্মপ্রভাবে বসু*দুহিতা সরস্বতী এবং সাগর সম্ভবা লক্ষীর সহিত সম্মিলিত হইতেছেন। এই স্থলে সগুণা প্রকৃতি পুরুষকে গ্রহণ করিতেছেন, এবং রূপভেদে তাঁহারা রতি কাম হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সরোবরবিহারী হংস নলিনীনালে, ভ্রমর কমলকোরকে, তরুরাজি লতাপাশে বদ্ধ হইতেছে, এবং একটী শারিকা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ পূর্ব্বক বসন্ত রাগে—দুল্লহ জণঅণুরাও লজ্জাগুরুই পরব্বসা অপ্পা।

পিয়সহি বিসমংপেম্মং মরণং সরণং ণবরিঅমেক্কং॥

এই সঙ্গীতটী করিয়া তদ্দ্বারা জীবের প্রেমোল্লাস এবং প্রেমোদ্বেগ রবে জগতীতল মুখরিত করিতেছে।

---

(৩)

উত্তরচরিত এবং শকুন্তলার সহিত রত্নাবলীর যে তুলনা হইতে পারে না, তাহা বলা হইয়াছে। বস্তু একজাতীয় না হইলে, প্রকৃতপ্রস্তাবে পরস্পর তুলনা হয় না। উল্লিখিত নাটকদ্বয়ের সহিত রত্নাবলীর প্রকৃতিগত, নির্ম্মাণ-গত, সুতরাং জাতিগত বৈসাদৃশ্যই আছে। তবে যাঁহারা কাব্য নাটকাদিতে খাসা খাসা দুই পাঁচটা সমানরূপ কবিতা দেখিয়াই সেই সকল কাব্য নাট-

---

* বসু. অগ্নি—রাগ যন্ত্রের অধিষ্ঠাতা।

কাদির তুলনা করিতে বইসেন, তাঁহারা উত্তরচরিত, শকুন্তলা এবং রত্নাবলী পাঠ সময়ে উহাদের এই চারিটী তুল্যরূপ শ্লোক দেখিয়াই পরস্পর তুলনার অবসর পাইয়াছেন মনে করেন, এবং সমগ্র গ্রন্থগুলির জাতিগত বৈসাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না। উত্তরচরিত, শকুন্তলা এবং রত্নাবলীতে ঐ প্রকার সমানরূপ দুই চারিটা কবিতার অভাব নাই। যথা—

উত্তরচরিতে—

পরিপাণ্ডু দুর্ব্বলকপোল সুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥

শকুন্তলায়—

বসনেপরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

রত্নাবলীতে—

উদয়গিরিতটান্তরিতমিয়ং
প্রাচী সূচয়তি দিঙ্নিশানাথং।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন
প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী॥

উদ্ধৃত এই তৃতীয় কবিতাটী অনুদ্ভূত বিরহের অঙ্কুর মাত্র; তথাপি সৌন্দর্য্যে উপরকার দুইটী ফুল্ল বিরহ হইতে ন্যূন নহে—কেহ ইহাকে অধিকতর সুন্দর মনে করিলেও আমাদের আপত্তি নাই। এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে,—অবশ্য, রত্নাবলী হইতে কম—অপর দুইটী হইতে অনেক।

কিন্তু গ্রন্থ সমালোচন-প্রসঙ্গে এরূপ করা আমাদের মনঃপূত নহে। কারণ, এই কার্য্য করিতে গেলে যেন আমরা একটী গগনভেদী, অস্ফুটালোকে আলোকিতাস্তর, রোমাঞ্চকারী দেবমন্দির; এবং সুপ্রশস্ত, বহ্বায়ত, প্রভাশালী, বিচিত্র চিত্র-নৈপুণ্যে পরিশোভিত একটী নাটমন্দির; আর সুন্দর সুঘটিত পরিপাটীরূপে সজ্জিত একটী আমোদভবন;—এতাদৃশ ত্রিবিধ হর্ম্ম্যগুলির বর্ণনায় আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগের হইতে এক এক ঝুড়ি ইটমাত্র আনিয়া আদেষ্টার সম্মুখে ধরিতেছি, এইরূপ বোধ হয়। ইটগুলি দেখিয়া দর্শক মনে করিবেন যে, সকল ইটগুলিই সেকালের—দৃঢ়, পেটাসেটা, একটীও একেলে ঢেপ্‌ঢেপে আম্ ইট নয়। কিন্তু তাহা দেখাইলেই কি হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য দেখান হইল?—শিল্পীর যথাযথ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইল?—অথবা কোন্‌টী কোন্ পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহাই বা কোন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল?

আমাদের বড়ই অভিলাষ যে, আমরা রত্নাবলীকে যে চক্ষে দেখিয়াছি, আমাদের পাঠকও তাহাকে সেই চক্ষে দেখেন। আমরা রত্নাবলীকে তাহার অগ্রজ নাগানন্দের সহিত একত্র দেখিয়াছি, এবং বোধ হয় সেই জন্য তাহাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্টতর উপলব্ধ করিয়া রত্নাবলীর অঙ্গসৌষ্ঠব, সুলক্ষণ এবং প্রকর্ষ অনুভব করিবার পক্ষে কিছু সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি।

নাগানন্দও রত্নাবলী-রচয়িতা কবি শ্রীহর্ষ প্রণীত। ইহার সহিত রত্নাবলীর যেমন সাদৃশ্য আছে, অপর কোন সংস্কৃত নাটকের সহিত তেমন সাদৃশ্য নাই। শুদ্ধ সাদৃশ্য আছে তাহা নহে; উহাদিগের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব উৎকর্ষক্রমও লক্ষিত হয়। নাগানন্দ কবির প্রথম প্রসূত এবং বোধ হয়, তাঁহার নবীন বয়সেরই সন্তান। নাগানন্দের ভাব উচ্চ, বর্ণনা সরল, কিন্তু গ্রন্থন অপেক্ষাকৃত শিথিল। এই গ্রন্থে কবি স্বীয় বিদ্যাবত্তা প্রকাশের লোভ সম্যক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। রত্নাবলীতে সে প্রকার লোভ গুণীভূতভাবেও লক্ষিত হয় না। নাগানন্দের রচনায় অনর্থক বা বিসদৃশ বিশেষণ কোথাও কোথাও দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু রত্নাবলীতে

ঐ দোষের লেশমাত্র দেখা যায় না। নাগানন্দের উপাখ্যান ভাগের উৎকর্ষ সম্পাদন করা অধিক আয়াস-সাধ্য বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু রত্নাবলীর উপাখ্যানের সেরূপ উৎকর্ষসাধন নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। নাগানন্দে অকৃতাস্বাদ ব্যক্তির সংসার সম্বন্ধে কল্পিত বর্ণনা, রত্নাবলীতে ভুক্তভোগীর সাংসারিক কার্য্যকলাপের বিবরণ।

নাগানন্দে হিন্দু ধর্ম্ম্য মতবাদের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম্য মতবাদ কিরূপে সম্মিলিত হইয়া উভয়ে এক পদার্থ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, রত্নাবলীতে ঐ সম্মিলনের ফল কেবল নায়কাদির চরিত্রে গূঢ়ভাবে অনুভব করিতে হয়। নাগানন্দের নায়ক জীমূতবাহন; তিনি একজন পরোপকার ব্রতপরায়ণ বোধিসত্ত্ব। তিনি বানপ্রস্থ পিতা মাতার শুশ্রূষার নিমিত্ত যৌবরাজ্যপরিহার পূর্ব্বক মলয়পর্ব্বতের সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন, এবং তথায় বিদ্যাধর-দুহিতা মলয়বতীকে দর্শন করিয়া তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হন, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া সুচতুর শ্যালকের কৌশলবশে সমুদ্র দর্শনে গমন করিলে তথায় গরুড়ের ভক্ষণার্থ উপস্থিত একটী নাগের উদ্ধারার্থ আত্মশরীর সমর্পণ করেন, এবং পরে দেবী গৌরীর অনুগ্রহে ও গরুড়ের অমৃতাভিবর্ষণে পূর্ব্ব-ভক্ষিত নাগকুলের সহিত পুনরুজ্জীবিত হয়েন। রত্নাবলীর নায়ক রাজা উদয়ন, প্রৌঢ়বয়স্ক ও বিবাহিত পুরুষ। তাঁহার রাজ্ঞী বাসবদত্তার দাস্যে নিযুক্তা সিংহলরাজদুহিতা রত্নাবলী পূর্ব্বে নিজ পিতাকর্ত্তৃক রাজার প্রতি বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন জানিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত প্রণয়াসক্ত হন, এবং রাজাও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ অনুভব করেন। কিন্তু রাজ্ঞী প্রতিকূল হইয়া নিজ দাসীভূতা রাজপুত্রী রত্নাবলীকে অন্তঃপুরে নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখেন। অনন্তর রাজমন্ত্রীর কৌশলে রত্নাবলীর নিগড়-মোচন এবং তাঁহার প্রকৃত পরিচয়প্রাপ্তি হইলে রাজ্ঞী অনুকূলা হইয়া স্বয়ং রাজার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেন।

(৪)

কবি শ্রীহর্ষ প্রণীত নাগানন্দ এবং রত্নাবলী এই দুই খানি দৃশ্য কাব্যের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে ; এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভাই ভগিনীর আকারের যেরূপ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকে, সেরূপ বলিলেও হয়—অথবা কোন ব্যক্তির কৌমার কালের চিত্রের সহিত তাহার পূর্ণ যৌবনাবস্থার চিত্রের যেরূপ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেরূপ বলিলেও হয়। নবীন বয়সের চিত্রের যে মুখ, যে কাণ যে চক্ষু—পূর্ণ বয়সের চিত্রেও সে সকল তাহাই। তবে নবীন বয়সের চোখ, নাক মুখ চল চলে, নধর ও ঋজু থাকে, পূর্ণ বয়সে সেগুলি সুপরিস্লিষ্ট এবং বিশেষ রূপে আন্তরিক ভাবের পরিব্যঞ্জক হয়। নাগানন্দ এবং রত্নাবলীর আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্র এইরূপ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। নান্দীটী লইয়াই দেখা যাউক।

নাগানন্দের নান্দীতে সমুদায় নাটকের এই একটী দূর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মনুষ্যের দেহধারণ ভোগ সুখের নিমিত্ত নহে, বাসনা-দমনপূর্ব্বক পরার্থ সাধনের নিমিত্ত।

যথা—

ধ্যানব্যাজমুপেত্য চিন্তয়সি কামুন্মীল্য চক্ষুঃ ক্ষণম্,
পশ্যাঽনঙ্গশরাতুরং জনমিমং ত্রাতাঽপি নো রক্ষসি।
মিথ্যাকারুণিকোঽসি নির্ঘৃণতর স্বত্তঃ স কোঽন্যঃ পুমান্,
সের্ষ্যং মারবধূভিরিত্যভিহিতো বুদ্ধো জিনঃ পাতু বঃ।

ধ্যানের ছল অবলম্বন করিয়া তুমি কোন স্ত্রীকে চিন্তা করিতেছ ? চক্ষুঃ উন্মীলনপূর্ব্বক অনঙ্গশরাতুর এ জনকে দেখ, দুঃখপরিত্রাতা হইয়াও রক্ষা করিতেছ না ? তুমি মিথ্যা কারুণিক—তোমা অপেক্ষা আর কে অধিকতর নির্দ্দয়, এইরূপে ঈর্ষাপূর্ব্বক মারবধূদিগের কর্ত্তৃক অভিহিত বুদ্ধ জিন তোমাদিগকে পালন করুন।

অপর—

কামেনাকৃষ্য চাপং হতপটুপটহাবল্গিভির্মারবীরৈ
র্ভ্রূভঙ্গোৎকম্পজৃম্ভাস্মিতচলিতদৃশা দিব্যনারীজনেন।
সিদ্ধৈঃ প্রহ্বোত্তমাঙ্গৈঃ পুলকিতবপুষা বিস্ময়াদ্বাসবেন
ধ্যায়ন্ বোধেরবাপ্তো ন চলিত ইতি বঃ পাতু দৃষ্টো মুনীন্দ্রঃ॥

আকৃষ্টশরাসন কাম, পটুপটহবাদনপর ও বিক্রান্তউদ্ধতগতি মারবীরগণ (অর্থাৎ?) ভ্রূভঙ্গী, উৎকম্প, জৃম্ভা, স্মিতসহকৃত চলিতচক্ষু-বিশিষ্ট সুর সুন্দরীজন, অপরিশূন্যজ্ঞানশক্তি ও ধ্যানাবসক্ত মুনীন্দ্রকে ধ্যানক্রিয়া হইতে বিচলিত করিতে পারিল না দেখিয়া সিদ্ধসমূহ ভক্তিভারাবনত মস্তকে এবং বাসব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, সেই মুনীন্দ্র তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

গ্রন্থের নায়ক জীমূতবাহন যে রাজ্যসুখ ত্যাগ এবং বিদ্যাধরী মলয়বতীর প্রণয়সুখ বিসর্জ্জন করিয়া জগতের সমস্ত কামনা পরিহারপূর্ব্বক করুণাপ্রণোদিত হইয়া পরার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা পরমকারুণিক জিনবুদ্ধের মারবধূর তিরস্কার এবং অপরিভ্রষ্ট জ্ঞানদ্বারা বাসনাবিজয়, সেই ভাবেরই সূচনা করিতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সূচনা মাত্র, এবং নান্দীতে গ্রন্থের আভাস অত্যন্ত দূরগত ও অপরিস্ফুট। রত্নাবলীর নান্দীর চারিটী শ্লোকের প্রত্যেকটীতে ঐ নাটিকার এক একটী অঙ্কের সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

যথা—নান্দীর প্রথম শ্লোক—

পাদাগ্রস্থিতয়া মুহুস্তনভরেণানীতয়া নম্রতাং
শম্ভোঃ সস্পৃহলোচনত্রয়পথং যান্ত্যা তদারাধনে
হ্রীমত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদ্গমোৎকম্পয়া।
বিশ্লিষ্যন্ কুসুমাঞ্জলির্গিরিজয়া ক্ষিপ্তোঽন্তরে পাতু বঃ॥

শম্ভুর আরাধনা সময়ে পাদাগ্রস্থিতা, স্তন-ভারাবনতাঙ্গী, শম্ভুর সাভিলাষ নয়নত্রয়পথবর্ত্তিনী, লজ্জাবতী ও পুলকস্বেদকম্পান্বিতা গিরিজা কর্তৃক

শিরঃপ্রদেশে দিবার নিমিত্ত সমীহিত হইলেও যে পুষ্পাঞ্জলি মধ্যভাগে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

রত্নাবলীর প্রথম অঙ্কে, সাগরিকা, রাজা উদয়নকে, রাজ্ঞী বাসবদত্তা কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইতেছেন, এই অবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ কামদেব মনে করেন, এবং স্বয়ং সেই দেবতাকে পূজা করিবেন, ইচ্ছা করিয়া মধ্য পথে কুসুমাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন।

নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোক—

ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাবর্ত্তমানাহ্রিয়া
তৈস্তৈর্বন্ধুবধূজনস্য রচনৈর্নীতাভিমুখ্যং পুনঃ।
দৃষ্টাগ্রে বরমাত্তসাধ্বসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে
সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতা শ্লিষ্টা শিবায়াস্তু বঃ।

নবসঙ্গমে বরকে সম্মুখস্থ দেখিয়া সাধ্বস বিশিষ্টা, ঔৎসুক্যবশতঃ ত্বরান্বিতা, সহজলজ্জাহেতুক, প্রত্যাবর্ত্তমানা, বন্ধুবধূদিগের সেই সেই প্রবোধ বাক্যে আভিমুখ্যপ্রাপ্তা, স্মিতমুখ হরকর্ত্তৃক আশ্লিষ্টা অতএব পুলকিতা গৌরী তোমাদিগের মঙ্গল করুন।

দ্বিতীয় অঙ্কে, সাগরিকা মনে মনে পতিরূপে বৃত রাজা উদয়নের নিকটে সঙ্কেতগৃহে যাইবার নিমিত্ত মনে মনে অত্যন্ত উৎসুকা হইলেও লজ্জায় যাইতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর পরিচারিকা সুসঙ্গতাকর্ত্তৃক রাজসমীপে সমানীতা হইলে রাজা হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক সাগরিকাকে স্পর্শ করিলেন। নবসঙ্গমে সাগরিকা লজ্জায় জড়ীভূতা, ও উদ্গতপুলকা হইয়াছিলেন।

নান্দীর তৃতীয় শ্লোক—

সংপ্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং ত্বত্তোমদর্থে পুরা,
তদ্যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নির্লজ্জ বোঢ়ুস্তব।
তামেবানুনয়স্ব ভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণকণ্ঠ গ্রহং
মুঞ্চেত্যাহ রুষা যমদ্রিতনয়া লক্ষ্মীশ্চ পায়াৎ স বঃ॥

পূর্ব্বে আমার জন্য তোমা হইতে মকরধ্বজ বিমর্দ্দিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই আমার সম্মুখে বহুমার্গগাকে বহন করিতেছ! হে নির্লজ্জ! এই কার্য্য কি উচিত? অতএব সেই কুটিলভাবাকেই অনুনয় কর, আমাকে ছাড়িয়া দাও, এই কথা রোষ পূর্ব্বক পর্ব্বতদুহিতা ও লক্ষ্মী যাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে পালন করুন্।

তৃতীয়াঙ্কে, সাগরিকা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন, রাজার নয়নগোচর হওয়ায় তিনি তাঁহার গলদেশ হইতে লতাপাশ বিমোচন করিয়া সাগরিকার বাহুপাশ আপন গলদেশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক "হে জীবিতেশ্বরি আমার কণ্ঠে বাহুপাশ অর্পণ কর" এই বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতেছেন, এমত সময়ে মহিষী বাসবদত্তা আসিয়া 'এ কর্ম্ম কি তোমার উপযুক্ত? এই বলিয়া রাজাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ শ্লোক—

ক্রোধৈর্দ্ধৈর্দৃষ্টিপাতৈস্ত্রিভিরুপশমিতা বহ্নয়োঽমী ত্রয়োপি,
ত্রাসার্ত্তা ঋত্বিজোঽধশ্চপলগণহৃতোষ্ণীষপট্টাঃ পতন্তি।
দক্ষঃস্তৌত্যস্যপত্নী বিলপতি কৃপণং বিদ্রুতং ক্ষৌণিদেবৈঃ
শংসন্নিত্যট্টহাসো মখমথনবিধৌ পাতু দেব্যৈ শিবো বঃ॥

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে শিবানুচরদিগের ক্রোধোজ্জ্বলিত নয়নানলদ্বারা যজ্ঞের ত্রিবিধ অগ্নি নির্ব্বাপিত এবং প্রমথগণকর্ত্তৃক হৃতোষ্ণীষ ঋত্বিকগণ ভয়ে ভীত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল। দক্ষ স্তব ও প্রসূতি করুণস্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে আহূত ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিয়াছিলেন। দেবীকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিবার সময় অট্টহাসযুক্ত শিব তোমাদিগকে রক্ষা করুণ।

চতুর্থ অঙ্কে, ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়ায় রাজবাটী মধ্যে অগ্নির সমুত্থান এবং তাহাতে রাজবাটীর প্রতীয়মান দাহরূপ ধ্বংসঘটনা ও বিলাপাদি দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংসের অনুরূপ।

ফলতঃ নান্দীমধ্যে নাটকীয় বৃত্তান্তের এরূপ সমগ্রভাবে আভাস প্রদান শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী ভিন্ন আর কোন কবির কোন নাটকে পরিদৃষ্ট হয় না।

---

(৫)

নাটকের নান্দীর মধ্যে সমুদায় গ্রন্থের আভাস প্রদান পূর্ব্বক নান্দীর সার্থকতা সম্পাদন, এক মাত্র কবি শ্রীহর্ষই করিয়াছেন; এবং তাঁহার দুই-খানি নাটকের মধ্যে প্রথম প্রণীত নাগানন্দ অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালে প্রণীত রত্নাবলীতে ঐ বিষয়ে অভূতপূর্ব্ব নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এক্ষণে উল্লিখিত নাটকদ্বয়ের প্রস্তাবনা লইয়া দেখা যাউক। নাটকের প্রস্তাবনায় আলঙ্কারিকদিগের নির্দ্দিষ্ট যে সকল প্রকারভেদ আছে, তাহা-দিগের মধ্যে কোন্ প্রকার উৎকৃষ্ট কোন্ প্রকার অপকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে তাঁহারা স্পষ্টরূপে কোন অভিমতি প্রকাশ করেন নাই। আমাদিগেরও এই মাত্র বক্তব্য যে, নাগানন্দের প্রস্তাবনায় যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ কৌশলপূর্ণ নহে।

নাগানন্দে সূত্রধার একটী কবিতা পাঠ করিয়া নাটকের উপখ্যান ভাগের সারভূত কয়েকটী কথা এবং নায়ক জীমূতবাহনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রঙ্গ-ভূমিতে নাটকীয় কোন পাত্রের উপস্থিতির আভাস প্রদান হইল না। যথা—

> পিত্রোর্ব্বিধাতুং শুশ্রূষাং ত্যক্ত্বৈশ্বর্য্যং ক্রমাগতম্।
> বনং যাম্যহমদ্যৈব যথা জীমূতবাহনঃ॥

পিতা মাতার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া জীমূতবাহনের ন্যায় আমি অদ্য বনগমন করিব।

এই প্রস্তাবনাভাগে নাটকীয় কোন পাত্রের রঙ্গস্থলে উপস্থিতি সূচিত

হইতেছে না। সুতরাং প্রস্তাবনার সহিত নাটকীয় ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা হয় নাই। ইহা অপেক্ষা কালিদাসের শকুন্তলাতে প্রস্তাবনায় অধিকতর কৌশল দৃষ্ট হয়।

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।

এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ শারঙ্গেণাতিরংহসা॥

অতিবেগশালী শারঙ্গ কর্তৃক 'এই' দুষ্মন্ত রাজা যেমন দূরে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তেমনি আমি তোমার মনোহর গীতরাগে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়াছি।

এস্থলে নটীর সঙ্গীতের প্রশংসার সহিত নাটকীয় পাত্রের রঙ্গস্থলে সাক্ষাৎ উপস্থিতি যে এক প্রকার কৌশলসম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু রত্নাবলীর প্রস্তাবনা ইহা অপেক্ষাও সুন্দরতর কৌশলসম্পন্ন। যথা—

দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দ্দিশোঽপ্যন্তাৎ।

আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ॥

বিধি, অনুকূল হইলে দ্বীপান্তর সাগরমধ্য এবং দিগন্ত হইতেও ত্বরায় আনয়ন পূর্ব্বক অভিমত বস্তু সংঘটন করেন।

এই প্রস্তাবনায় সমুদায় নাটকীয় উপাখ্যানের ছায়া পতিত হইয়াছে—নটী পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিল, তাহার প্রকৃতরূপ উত্তর করা হইয়াছে—এবং নাটকীয় একটী প্রধান পাত্র যৌগন্ধরায়ণের রঙ্গস্থলে প্রবেশ সাধন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যেমন রত্নাবলীর নান্দীর তুল্য নান্দী সংস্কৃত নাটকে দ্বিতীয় নাই, সেইরূপ রত্নাবলীর প্রস্তাবনাও সংস্কৃত নাটকে অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। বলিলেও চলে, এরূপ খুঁত রাখিয়া বলিবার হেতু এই যে, অপর একটী নাটকেও ইহারই তুল্য, কি ইহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্টতর একটী প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়। যথা মুদ্রারাক্ষসে—

ক্রূরগ্রহঃ স কেতুশ্চন্দ্রং সংপূর্ণ মণ্ডলমিদানীং

অভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ (ইত্যর্দ্ধোক্তে)

নেপথ্যে। আঃ, ক এষ ময়ি স্থিতে চন্দ্রগুপ্ত মভিভবিতু মিচ্ছতি বলাৎ?

সূত্র। রক্ষত্যেনন্তু বুধযোগঃ।

কেতুর সহিত ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলকে এক্ষণে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে (এই ভাগ মাত্র বলা হইলে)

নেপথ্যে। আঃ, আমি থাকিতে কে চন্দ্রগুপ্তকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করে ?

সূত্রধার। ইহাঁকে বুধযোগ রক্ষা করুক।

এই প্রস্তাবনাটী অতি গূঢ় কৌশলে পরিপূর্ণ। নটী এবং সূত্রধারের উক্তি প্রত্যুক্তিতে যে একটী আর্য্যা ছন্দের কবিতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতেই সমুদায় গ্রন্থের আভাস প্রদত্ত এবং নেপথ্য হইতে পুনরুক্তবৎ প্রতীয়মান যে চাণক্যের উক্তি তাহাতে নাটকীয় একটী প্রধান পাত্রের রঙ্গস্থলে প্রবেশ সাধিত এবং সেই নাটকীয় পাত্রের প্রোজ্জল প্রতিকৃতি অভিনয় দ্রষ্টৃবর্গের নয়নপথে সমানীত করা হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রারাক্ষস রত্নাবলীর পরবর্ত্তী; এবং ঐ দুই নাটকের আভ্যন্তরীণ অনেক লক্ষণ দর্শনে বোধ হয় যে, মুদ্রারাক্ষসপ্রণেতা বিশাখদত্ত শ্রীহর্ষদেব কর্ত্তৃক প্রদর্শিতপথ হইয়াই নিজ নাটকের প্রস্তাবনার এরূপ উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বেণীসংহারের প্রস্তাবনা মুদ্রারক্ষসের প্রস্তাবনার অনুকৃতি; সুতরাং রত্নাবলীর অনুকৃতির অনুকৃতি।

উৎকৃষ্ট বোধেই লোকে অনুকরণ করিয়া থাকে। রত্নাবলীর প্রস্তাবনার উৎকৃষ্টতা প্রদর্শনার্থ পূর্ব্বোক্ত এই সকল কথা বলা হইল, তাহা ছাড়া আমাদিগের আর একটী উদ্দেশ্য আছে। রত্নাবলীর নান্দীও যে অতি উৎকৃষ্ট এবং উপাদেয় তাহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু উহার নান্দীর অনুকরণ শ্রীহর্ষদেবের পরবর্ত্তী নাটকলেখকদিগের নাটকে দৃষ্ট হয় না কি জন্য ?— আমাদিগের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং আমরা ইহার মনঃপূত উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। তবে এইরূপ ভাবিয়াছি যে, শ্রীহর্ষদেবের পরবর্ত্তী নাটকলেখকগণ তাদৃশ প্রতিভাশালী ছিলেন না। তাঁহারা কল্পনাশক্তির অনুসরণ করা দূরে থাকুক, নূতন কিছুর অনুকরণ করিতেও সম্যক্ সাহসী হইতেন না। তাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নান্দীর লক্ষণের অনুসরণ

করিয়াই স্ব স্ব নাটকের নান্দীরচনা করিয়া গিয়াছিলেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবে যে কবিত্বের হানি হয়, এই ব্যাপার তাহারই অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু এস্থলে বলিতে হইবে যে, আর্য্য ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক নাটক যদিও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত নাটক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তথাপি উহার নান্দীতে নাটকীয় উপাখ্যান ভাগের গূঢ়রূপে যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(৬)

রত্নাবলীর নান্দী এবং প্রস্তাবনা যে সমীচীন কৌশলসম্পন্ন, তাহা নাগানন্দ এবং অন্যান্য নাটকের সহিত তুলনাপূর্ব্বক সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে নাটকীয় প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

নাগানন্দের প্রথমেই একেবারে নায়ক জীমূতবাহনের রঙ্গস্থলে প্রবেশ; তিনি স্বীয় বয়স্য আত্রেয়কে আন্তরিক নির্ব্বেদ সহকারে এই শ্লোকটী শুনাইলেন—

রাগস্যাস্পদমিত্যবৈমি, নহি মে ধ্বংসীতি ন প্রত্যয়ঃ,
কৃত্যাকৃত্যবিচারণাসু বিমুখং কো বা ন বেত্তি ক্ষিতৌ।
এবং নিন্দ্যমপীদমীপ্সিতফলপ্রাপ্ত্যৈ ভবেদ্‌যৌবনং
ভক্ত্যা যাতি যদীত্থমেব পিতরৌ শুশ্রূষমাণস্য মে॥

যৌবন সংসারাসক্তির আস্পদ, ইহা আমি জানি, এবং ইহা যে বিধ্বংসশীল নয়, তাহাও আমার প্রত্যয় নয়, আর এই কাল যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারবিমুখ, তাহাও পৃথিবীতে কে না জানে, কিন্তু যৌবন এমন নিন্দনীয় হইয়াও যদি আমাকর্ত্তৃক পিতা মাতার শুশ্রূষায় নিয়োজিত হয়, তবে অবশ্যই ইহা অভীপ্সিত ফলপ্রাপ্তির পক্ষে অনুকূল হইবে।

তাহার পর আবার বলিলেন,—

তিষ্ঠন্‌ভাতি পিতুঃ পুরো ভুবি যথা সিংহাসনে কিন্তথা,
যৎ সংবাহয়তঃ সুখং তু চরণৌ তাতস্য কিং রাজকে।
কিং ভুক্তে ভুবনত্রয়ে ধৃতিরসৌ ভুক্তোজ্‌ঝিতে যা গুরো-
র্ম্মাসঃ খলু রাজ্যমুজ্‌ঝিতগুরো স্তত্রাস্তি কশ্চিদ্‌গুণঃ॥

পিতার সম্মুখে ভূমিতলে দণ্ডায়মান সন্তান যেরূপ শোভা ধারণ করে; সিংহাসনে বসিয়া কি সেরূপ শোভা পায়? পিতৃচরণ সংবাহনে যেরূপ সুখানুভব হয়, রাজকার্য্যে কি সেরূপ সুখানুভব হইয়া থাকে? পিতার ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে যে তৃপ্তি, ভুবনত্রয়ভোগেও কি সেই তৃপ্তি হয়? পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া রাজ্যভোগ করা কেবল ক্লেশকর, তাহাতে কোন গুণই নাই।

নায়ক পুনরায় আপন কৃত কার্য্য সম্বন্ধে বলিলেন;—

ন্যায্যে বর্ত্মনি যোজিতাঃ প্রকৃতয়ঃ সন্তঃ সুখং স্থাপিতা
নীতো বন্ধুজনস্তথাত্মসমতাং রাজ্যে চ রক্ষা কৃতা।
দত্তো দত্তমনোরথাধিকফলঃ কল্পদ্রুমোঽপ্যর্থিনে
কিংকর্ত্তব্যমতঃপরং কথয় বা যত্তে স্থিতং চেতসি॥

আমি প্রজাসকলকে ন্যায়পথে প্রয়োজিত করিয়াছি, সাধুদিগকে সুখে রাখিয়াছি, বন্ধুবর্গকে আত্মসমতা প্রাপ্ত করিয়াছি। রাজ্যের রক্ষা করিয়াছি, অর্থী জনকে, মনোরথের অধিক ফল প্রদান করে, এমন কল্পদ্রুমও দান করিয়াছি, ইহার পর কর্ত্তব্য আর কি আছে, যাহা তোমার মনে থাকে বল।

এই শ্লোকত্রিতয়ে সংসারের অনিত্যতা, সংসারাসক্তির দোষ, গুরুশুশ্রূষার উৎকর্ষ এবং পরোপকারব্রত পালনের কর্ত্তব্যতা—এই চতুর্বিধজ্ঞানে পরিপূত একটী কিশোর-হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মতবাদে প্রসিক্ত এবং আর্য্যপণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সম্মার্জ্জিত হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ এই। সংসারের অনিত্যতা জ্ঞান এই ধর্ম্মবৃক্ষের মূল, ঐহিক সুখপরিহার ইহার কাণ্ড, বিধিপ্রতিপালন এবং গুরুশুশ্রূষা ইহার শাখা-পল্লব, এবং সর্ব্বপ্রাণীতে সমতা বোধ ও পরোপকার ইহার পুষ্প ও ফল।

এই ধর্ম্মে শিক্ষিত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, উদারচেতা যুবক এইরূপ সরলভাবে আপনার মূল সংস্কার সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আজি কালি বিদ্যালয় হইতে নূতন বহির্ভূত কৃতবিদ্য যুবাদিগের মুখেও তাহাদের নিজের শিক্ষিত হৃদ্‌গত সংস্কার এবং সঙ্কল্প সকল এইরূপে অনর্গল ব্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব কবি কেমন নিপুণতা সহকারে তাঁহার নবীন বয়স্ক নায়কের প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

কিন্তু কবি তাঁহার রত্নাবলীতে এরূপ করেন নাই। রত্নাবলীতে নায়ক রাজা উদয়নের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ হঠাৎকারে সম্পন্ন হয় নাই। প্রস্তাবনায় সূচিতপ্রবেশ সচিববর যৌগন্ধরায়ণ রঙ্গস্থলে আসিয়া প্রথমে বলিলেন,—

প্রারম্ভেঽস্মিন্ স্বামিনোবৃদ্ধিহেতৌ দৈবেনেত্থং দত্তহস্তাবলম্বে।
সিদ্ধে ভ্রান্তির্নাস্তি সত্যং, তথাপি স্বেচ্ছাচারী ভীত এবাস্মি ভর্ত্তুঃ॥

স্বামীর উন্নতির নিমিত্ত এরূপ দৈবানুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সিদ্ধিসম্বন্ধে যদিও সন্দেহ নাই সত্য, তথাপি স্বেচ্ছাচারী হইয়া এরূপ করিতেছি বলিয়া প্রভুর নিকট শঙ্কিত হইতেছি।

তৎপরে, রাজা প্রাসাদোপরি আরূঢ় হইয়াছেন দেখিয়া, বলিলেন।
বিশ্রান্তবিগ্রহকথো, রতিমান্, জনস্য চিত্তে বসন্, প্রিয়বসন্তক এব সাক্ষাৎ।
পর্য্যুৎসুকো নিজমহোৎসবদর্শনায় বৎসেশ্বরঃ কুসুমচাপ ইবাভ্যুপৈতি॥

নিঃশেষিত-বিগ্রহ, রতিমান্, লোকের চিত্তনিবাসী, বৎসরাজ প্রিয় সহচর বসন্তককে লইয়া যেন কুসুমায়ুধ স্বয়ং আপনার মহোৎসবদর্শনার্থ পর্য্যুৎসুক হইয়া আসিতেছেন।

ইহার পর নায়ক স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বয়স্যকে বলিয়াছেন—

রাজ্যং নির্জ্জিতশত্রু যোগ্য সচিবে ন্যস্তঃ সমস্তোভরঃ
সম্যক্ পালনলালিতাঃ প্রশমিতা শেষোপসর্গাঃ প্রজাঃ।
প্রদ্যোতস্য সুতা, বসন্তসময় ত্বঞ্চেতি নাম্না ধৃতিং
কামঃ কামমুপৈত্বয়ং মম পুনর্মন্যে মহানুৎসবঃ॥

রাজ্যের শত্রু পরাজিত হইয়াছে, উপযুক্ত মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছে, প্রজাদিগের আপদ বিপদ প্রশমিত এবং তাহারা সম্যক্‌রূপে পালিত হইয়াছে, (প্রিয়তমা) প্রদ্যোতরাজকন্যা, বসন্ত সময় এবং তুমি উপস্থিত,—অতএব মদনের উৎসব নাম মাত্র প্রকৃত উৎসব আমারই।

এই তিনটী শ্লোকের প্রথমটীদ্বারা অভিনয়-দ্রষ্টৃবর্গের কৌতূহল প্রবলরূপে উদ্দীপ্ত করা হইয়াছে; দ্বিতীয়টীর দ্বারা নায়কের রূপ গুণ গৌরবাদি এমনরূপে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে যে, তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনার্থ দ্রষ্টৃবর্গের মনে স্বতই ঔৎসুক্য জন্মে; এবং তৃতীয় শ্লোকদ্বারা উৎসবের অবসর এবং তাহার আধিক্য প্রকটিত করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করা হইয়াছে।

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, নাগানন্দে যেরূপে নায়কের হঠাৎকারে রঙ্গভূমিপ্রবেশ হইয়াছে, যদিও প্রায় সেইরূপে কালিদাস শকুন্তলায় তাঁহার নায়কের প্রবেশসাধন করিয়াছেন বটে, তথাপি রত্নাবলীর প্রণালী উৎকৃষ্টতর বলিয়াই বোধ হয়। নায়ক নাটকের সর্ব্বপ্রধান পাত্র। যেমন প্রধান বা পূজ্য ব্যক্তির সমাগমের পূর্ব্বে কতকগুলি ব্যাপার অবশ্য অনুষ্ঠেয় সেইরূপ রঙ্গস্থলে নায়কপ্রবেশের পূর্ব্বেও তাঁহার প্রতি অভিনয়দ্রষ্টৃবর্গের ঔৎসুক্য উৎপাদন করা প্রয়োজনীয়। রত্নাবলীতে সেই প্রয়োজন সম্যক্‌রূপে সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যৌগন্ধরায়ণের সংক্ষেপোক্তি দ্বারা কবি কি অপূর্ব্ব কৌশল সহকারে দেখাইয়াছেন যে যেমন বিশ্বসংসারের অন্তর্ভূত বিধাতৃশক্তি অপ্রকটভাবে সমস্ত কার্য্যকলাপ সাধন করিতেছেন, সেইরূপ তাঁহার এই নাটক-সংসারটীতেও একটী পরম চক্রীর প্রভাব অন্তর্গূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

(৭)

রত্নাবলী নাটিকার গঠনপ্রণালীর সমীচীন পারিপাট্য, ইহার বিশিষ্টরূপ অভিনয়োপযোগিতা এবং ইহার 'নান্দী' এবং 'প্রস্তাবনার' উৎকর্ষ—এই সকল বিষয় উত্তরচরিত, শকুন্তলা, নাগানন্দ এবং মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাট-

কের সহিত তুলনা করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে এই নাটিকার প্রথম অঙ্কের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

রাজা উদয়ন সহচর বসন্তকের সহিত প্রাসাদোপরি আরূঢ় হইয়া নগরবাসীদিগের প্রবর্ত্তিত মদন মহোৎসব দেখিতেছিলেন। নগরের শোভা কিরূপ এবং নগরবাসীদিগের আমোদ প্রমোদ কিরূপ, তাহা রাজার এবং বসন্তকের কথোপকথনদ্বারা জানাইয়া কবি, ঐ মহোৎসব ব্যাপারটিকে অভিনয়-দ্রষ্টৃবর্গের চাক্ষুষ করাইবার নিমিত্ত রাজ্ঞীর অন্তঃপুরপরিচারিণী দুইটী দাসীর রঙ্গস্থলে অবতারণা করিলেন। ইহারা দুই জনে গান গাইতে গাইতে এবং নৃত্য করিতে করিতে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইল। ঐ দিনটী মদন মহোৎসবের দিন—ঐ দিন বে-আদবীতে দোষ হয় না—ঐ দিন অশ্লীল কথার ব্যবহার এবং কতক অশ্লীল আচরণও চলে। রাজ্ঞীর পরিচারিকারা আসিয়া রাজ সমক্ষে নৃত্য গীত করিতে লাগিল—রাজসহচর বসন্তকও উহাদের নৃত্য গীতে যোগ দিলেন—পরস্পর ঠাট্টা বিদ্রূপ, হাত পাকড়াপাকড়ি চলিতে লাগিল। মদন মহোৎসব কেমন ব্যাপার তাহা আর কথায় বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন রহিল না—অভিনয়-দ্রষ্টৃবর্গ তাহা স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পাইলেন। সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই এই মদনমহোৎসবের অনুরূপ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার মহানবমী—পশ্চিমাঞ্চলের হোলি—প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোপীয়দিগের মে মাসিক 'নৃত্যপর্ব্ব'—কাথলিক ইউরোপীয়দিগের রোমীয় 'কার্ণিবল'—আসামীয়দিগের 'বিহু'—ব্রহ্মদেশীয়দিগের মহাবিষুব জলসেক, চীনীয়দিগের বাসন্তিক পূজা—ইত্যাদি সকল ব্যাপারই ঐ এক-প্রকৃতিক। কেন যে দেবপূজার সহিত এবং ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠানের সহিত ঐরূপ যথেচ্ছাচারব্যঞ্জক একটী উৎসব সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে—কোন্ মানব ইতিবৃত্তের অতি প্রাচীন কালের অতি প্রচলিত রীতি যে এই ব্যাপারের দ্বারা স্মারিত হইতেছে, তাহা ইতিহাসও আর স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারে না। কিন্তু উহা যে নিকৃষ্টাবস্থ মানবের পাশব ব্যবহারের চিহ্নস্বরূপ, তাহা নিঃসন্দেহ।

রাজ্ঞীর পরিচারিকারা রাজাকে বলিল যে রাজ্ঞী বাসবদত্তা অন্তঃপুরোদ্যানের অশোকবৃক্ষ মূলে মদনদেবের পূজা করিবেন, মহারাজাকে তথায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিয়াছেন। আজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়াই দাসী যেন একটু 'জীব কাটিল', তাড়াতাড়ি বলিল 'প্রার্থনা করিয়াছেন'। রাজসহচর বলিয়া উঠিল 'বেটী দাসীপুত্রি! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা—মহারাজাকে 'আজ্ঞা করিয়াছেন' বলিস্! রাজা মধ্যস্থতা করিলেন—বলিলেন 'তাহাতে দোষ নাই, রাজ্ঞী আজ্ঞা করিয়াছেন বলাই ঠিক কথা;—বিশেষতঃ আজি মদন মহোৎসব, আজি ত তিনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াই পাঠাইবেন'। বেশ রসিকতা হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বলি ঐ "বিশেষতঃ" টুকু দ্বারা রাজা যেন আপনার সম্ভ্রমের দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহা করাতে রসিকতারও কিছু ত্রুটি করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রাজা উদয়নত খুব রসিক পুরুষ। তবে কবি, কি ইচ্ছা পূর্ব্বকই তাঁহার রসিকতার একটু দোষ দেখাইলেন এবং তাহা দেখাইয়া জানাইলেন যে রাজ্ঞীর প্রতি উদয়নের যে প্রেমভাব তাহা পূর্ণমাত্রায় নহে—ঐ প্রেমে একটু ভয়ের ভাগ আছে, এবং তাহা আছে বলিয়াই রাজার মনে আপনার সম্ভ্রম বজায় রাখিবার একটু গূঢ় ইচ্ছাও আছে। যদি তাহা হয়, অর্থাৎ রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি রাজা উদয়নের প্রেম কতকটা ভয়-ভক্তি-মূলক হয়, তবে কবি এই প্রারম্ভেই যে প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহার সূচনা করিলেন সে কৌশল, মানবচিত্তাভিজ্ঞ কোন মহাকবির অযোগ্য বলা যায় না। সহচর বসন্তকের সহিত রাজা অন্তঃপুরোদ্যানে গমন করিলেন। দেখিলেন রাজ্ঞী আসিয়াছেন, অমনি বয়স্য বসন্তককে রাজ্ঞীর মূর্ত্তি বর্ণন করিয়া বলিলেন—

কুসুমসুকুমারমূর্ত্তির্দধতী নিয়মেস নতুতরং মধ্যং।
আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থ চাপযষ্টিরিব।

কুসুমের ন্যায় সুকোমল মূর্ত্তি দেবী উপবাসাদি দ্বারা কৃশতর মধ্য ধারণ করত মকরকেতুর পার্শ্বস্থযষ্টির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

রাজ্ঞী রাজাকে আসন প্রদান করিলেন এবং উপবেশন করাইয়া স্বীয় হস্তদ্বারা অশোক বৃক্ষ স্পর্শ পূর্ব্বক মদনদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন—

প্রত্যগ্রমজ্জনবিশেষবিবিক্তকান্তিঃ
কৌসুম্ভরাগরুচির স্ফুরদংশুকান্তা
বিভ্রাজসে মকরকেতনমর্চ্চয়ন্তী
বালপ্রবালবিটপি প্রভবা লতেব॥

নূতন মজ্জনবিশেষে প্রকাশিতকান্তি কৌসুম্ভরাগে মনোহর, প্রস্ফুরিত বস্ত্রাঞ্চল ধারিণী হইয়া এই যে মকরকেতনকে অর্চ্চনা করিতেছ ইহাতে নবীন তোমাকে প্রবালবৃক্ষ-সম্ভবা লতার ন্যায় দেখাইতেছে।

স্পৃষ্টস্ত্বয়ৈব দয়িতে স্মরপূজাব্যাপৃতেন হস্তেন।
উদ্ভিন্নাসবমৃদুতর কিসলয় ইব লক্ষ্যতেঽশোকঃ॥

প্রিয়ে, তোমার স্মরপূজাব্যাপৃত হস্তের স্পর্শলাভ করিয়া অশোক যেন একটী মৃদুতর কিসলয় ধারণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

অনঙ্গোঽয়মনঙ্গত্বমদ্য নিন্দিষ্যতি ধ্রুবং।
যদনেন ন সম্প্রাপ্তঃ পাণিস্পর্শোৎসবস্তব॥

তোমার পাণিস্পর্শের আনন্দ প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া অনঙ্গ অদ্য আপনার অনঙ্গত্বের নিন্দা করিবেন।

মদনদেবের পূজা সমাপন হইলে রাজারও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা পূজা করা হইল, এবং বৈতালিক কর্ত্তৃক রাত্রিকালের প্রবেশ বিজ্ঞাপিত হইলে রাজা রাণী সকলে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। ঐ সময়ে রাজা বলিলেন—

দেবিত্বন্মুখপঙ্কজেন শশিনঃ শোভাতিরস্কারিণা
পশ্যাব্জানি বিনির্জিতানি সহসা গচ্ছন্তি বিচ্ছায়তাং।
শ্রুত্বা তে পরিবারবারবনিতা গীতানি ভৃঙ্গাঙ্গনা
লীয়ন্তে মুকুলান্তরেষু শনকৈঃ সঞ্জাতলজ্জা ইব॥

হে দেবি! চন্দ্রের শোভাতিরস্কারী তোমার মুখপঙ্কজ কর্তৃক বিজিত হইয়া পঙ্কজ সকল সহসা ম্লানতা প্রাপ্ত হইতেছে দেখ, এবং তোমার পরিবারস্থ বারবণিতাদিগের গীত শ্রবণ করিয়া ভৃঙ্গাঙ্গনাগণ লজ্জিত হইয়াই যেন আস্তে আস্তে মুকুলান্তরে লীন হইতেছে।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, এমন সময়ে এক জন ভাবুক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে আসিলেন এবং কি লিখিতেছি শুনিতে চাহিলেন। তাঁহাকে সমুদায় পাঠ করিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, "ঐ শ্লোকগুলির অনুবাদ মাত্র লিখিয়া দিলেই আপনার মনের কথা সমুদায় খুলিবে না। শ্লোক গুলিতে যে কেবল রসিকতা এবং পাণ্ডিত্য আছে—তেমন প্রেমানুরাগের চিহ্ন নাই—ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, প্রথম শ্লোক যদি প্রেমবিহ্বল ভাবুকের মুখনিঃসৃত হইত, তবে ঐ কুসুম-সুকুমারী, ব্রতশীলা, ক্ষীণ-মধ্যা, অনঙ্গদেবের চাপ-যষ্টি রূপা, অগ্রবর্ত্তিনী নারীমূর্ত্তি যে আপনার নিজের জিনিস তাহা কোনরূপে না কোনরূপে অবশ্যই ব্যক্ত হইত। কিন্তু ঐ শ্লোকে সে ভাবের লেশমাত্র নাই।

"মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা"—ছি! ছি! ওকি প্রকৃত প্রেমিকের কথা? 'আভাতি'—কোথায়? প্রেমিক বলিবে, তাহার নিজের হৃদয়ে—উদয়ন বলিল মকরকেতুর পার্শ্বে!

"দ্বিতীয় শ্লোকেও ঐ কাণ্ড—কেবল রূপের বর্ণন মাত্র—নিজে যে সেই রূপরাশির অধিকারী তাহার কোন চিহ্ন নাই—যদি প্রকৃত গাঢ়তম প্রেম বর্ণনার ইচ্ছা থাকিত, তবে কবি উদয়নের চক্ষুকে অত গাত্রমার্জ্জন এবং অঞ্চলের শোভা দেখিতে দিতেন না—ঐ প্রবাললতিকা যে অশোক বৃক্ষকে জড়ায় না, আর কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকে, এ ভাবও প্রকাশ করিতেন।

"তৃতীয় শ্লোকেও প্রায় ঐরূপ—কিন্তু কিছু ভিন্ন। রূপরাশি দেখিতে দেখিতে একটু সাত্ত্বিক ভাবের যেন আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে।

"বাসবদত্তার করপল্লব অশোক বৃক্ষের গাত্রে লাগিয়াছে—যেন অশোক হইতেই উঠিয়াছে। এতক্ষণে সাত্বিকভাব দেখা দিয়াছে, এবং সেই ভাব চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

"অনঙ্গ অঙ্গহীন বলিয়া তোমার পানিস্পর্শ সুখ পাইতেছেন না—উদয়ন তাহা পাইয়া থাকেন, বুঝি এ কথাটাও মনে উঠিয়া থাকিবে—এই বারে রাজার প্রেমোচ্ছাস হইল। অতএব প্রেম যে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু উহা তেমন সতেজ নয়—উস্কাইতে উস্কাইতে দেখা দেয় আবার শীঘ্রই মিড় মিড়ে হইয়া পড়ে। শীঘ্র মিড় মিড়ে হইয়া পড়ে এই জন্য বলিলাম যে, উদয়ন যখন রাত্রি সমাগম হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন—

উদয়গিরি তটান্তরিত মিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্ নিশানাথং।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিবহৃদয়স্থিতং রমণী ॥

এই পূর্ব্বদিক্ পরিপাণ্ডুমুখে উদয়গিরির তটান্তরিত নিশানাথকে রমণীর হৃদয়-গূঢ় দয়িতের ন্যায় সূচনা করিতেছে—

তখন ঐ কথাটী যে বাসবদত্তার মুখপানে চাহিয়া বলিয়াছিলেন এরূপ ত বোধ হয় না। পরিণীতা ভার্য্যা বাসবদত্তার মুখ স্বামীকে সম্মুখে পাইয়া হৃদয়স্থিত প্রিয়তম স্মরণ করিয়া 'পরিপাণ্ডু' হইতে পারে না। উহা প্রদীপ্ত এবং প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। হৃদয়স্থিত যে প্রিয়ার সংস্মরণে রমণীর মুখমণ্ডল 'পরিপাণ্ডু' বর্ণধারণ করে সে প্রিয় বস্তুতে রমণীর তখন অধিকার হয় নাই। পরিপাণ্ডু বর্ণ অনুভূত বিরহেরই লক্ষণ। বস্তুতঃ উদয়ন যদিও বাসবদত্তার প্রতি প্রেমিক বটেন তথাপি তাঁহার মনে যে অন্য প্রকার প্রেমেরও একটী ছবি নিহিত ছিল, কবি এই সুন্দর শ্লোকটী দ্বারা নায়কের সেই ভাব প্রদর্শন করিলেন। উদয়ন যেন মনে মনে ইচ্ছা করেন যে কোন রমণী তাঁহাকে মনের ভিতরে রাখিয়া পরিপাণ্ডু-মুখী হয়। অঙ্কের শেষ কবিতাটীতে কবি যেন পাঠকের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়াই দেখাইয়াছেন, যে বাসবদত্তার প্রতি

উদয়নের সাত্ত্বিক ভাবটী নিতান্তই মৃদু। রাত্রি হইয়াছে মদনপূজার পরে স্ত্রী পুরুষে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইতেছেন, অথচ উদয়নের মুখে কবির সময়োচিত বর্ণনা ভিন্ন প্রকৃত সাত্ত্বিকভাবের লেশও নাই। কবির যদি উদয়নের গাঢ় প্রেম বর্ণনার ইচ্ছা থাকিত, তবে এমন সময়ে উদয়নকে দিয়া সম্ভ্রমসূচক 'দেবি' সম্বোধন করাইতেন না—তাঁহার মুখ 'পঙ্কজের' দ্বারা শশির তিরস্কার না করাইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলরূপ নিষ্কলঙ্ক সুধাকরের দ্বারা সকলঙ্ক শশির তিরস্কার করাইতেন, এবং ভৃঙ্গের 'অঙ্গনা' বেচারাদিগকে 'লজ্জা' প্রভাবে পদ্মমুকুলের মধ্যে বিলীন না করিয়া—মধুপ বৃন্দকে সমস্ত রাত্রির জন্য পদ্মমুকুলাভ্যন্তররূপপিঞ্জরে বদ্ধ করিতেন, কিন্তু মনে যে ভাব নাই—মুখে তাহা ব্যক্ত হইবে কেন? এইরূপে না দেখিলে রত্নাবলীর কবিত্বে ত্রুটি লক্ষিত হয়—আর এই রূপে দেখিলে উহাতে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়"।

ভাবুক মহাশয়ের উক্তিগুলি আমাদিগের মনঃপূত বলিয়া পত্রস্থ করিলাম।

---

(৮)

রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি রাজা উদয়নের প্রেম যে ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধাদি-মূলক, প্রগাঢ় সাত্ত্বিকরস-সংশ্লিষ্ট নহে, এবং উদয়নের হৃদয় যে অন্যবিধ প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, কবি অতি নিপুণতা সহকারে তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু উদয়নের এই ভাব প্রদর্শন সহকারে বাসবদত্তারও মন উদয়নের প্রতি কিরূপ, তাহাও প্রথম হইতেই দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সাধ্বী বাসবদত্তা গম্ভীর-প্রকৃতি এবং তেজস্বিনী। তিনি স্বামীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, কিন্তু তাঁহাকে চঞ্চলস্বভাব বলিয়াও জানেন! তিনি যখন অন্তঃপুরোদ্যানে মদনদেবের পূজা করিতে আইসেন, তখন

অন্যান্য পরিচারিকার মধ্যে সাগরিকা নাম্নী একটী অতীব সুন্দরী পরিচারিকাকে পূজোপহার লইয়া আসিতে দেখিয়া মনে মনে বলেন—“এ এখানে এলো কেন?—উহাকে ত শারিকা পালনের ভার দিয়া অন্তঃপুরেই রাখিব মনে করিয়াছি—ইহাকে তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইতে দেওয়া হইবে না।” রাজ্ঞী এইরূপ ভাবিয়া সাগরিকাকে অন্তঃপুর মধ্যে যাইবার আদেশ করেন। এটি অবিশ্বাসের লক্ষণ। যে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তিনি বরং ইচ্ছা করেন যে, স্বামী অন্য সুন্দরী স্ত্রীকে দেখুন—তাহা না হইলে প্রণয়ের পরীক্ষা হয় কৈ? সৌভাগ্য গৌরব সংস্থাপিত হয় কৈ? বাসবদত্তার মন উদয়নের প্রতি সে ভাব ধারণ করে নাই—সে ভাব ধারণের কোন যো'ই ছিল না—বাসবদত্তার প্রকৃতি উদয়নের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উদয়ন তাঁহার বশ, কিন্তু তত প্রেমে নয়—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকৃতি বশতঃ কিছু ভয়ে, অনেকটা ভক্তিতে, এবং কিঞ্চিন্মাত্র প্রেমে।

একবার পতি-পত্নী-প্রেমের আদর্শভূত রামসীতাকে মনে করা যাউক। কি বাল্মীকির রামায়ণে, কি ভবভূতির উত্তরচরিতে, যেখানে দেখি, রাম যখন সীতার সৌন্দর্য্য কি স্বভাবের প্রতি আপনার প্রীতিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতেছেন, সীতা তখনি অমনি গলিয়া পড়িতেছেন। আমরা যেন কখন বিস্ফারিত—কখন মুকুলিত—সেই নয়নযুগল, সেই অবনমিত মুখপদ্ম—সেই আরক্ত গণ্ডস্থল একেবারে সম্মুখে দেখিতে পাই। কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তার দেহকে “মদনের চাপযষ্টি” তাহার হস্তটীকে “নবীন কিসলয়”, তাহার রাগরঞ্জিত দেহ এবং বস্ত্রাঞ্চল “প্রবাল বিটপী” বলিয়া এই যে এত প্রশংসা করিলেন—হৃদয়স্থিত প্রিয়কে রমণীমুখ কেমন পাণ্ডু বর্ণের দ্বারা সূচিত করে, জানাইলেন, তাহার মুখপঙ্কজ দর্শনে পদ্ম সকল ম্লান হইতেছে, বলিলেন—তাহাতে বাসবদত্তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সেই খাড়া “চাপযষ্টি”—সেই দেবপূজাপরায়ণ “দেবী”ই রহিলেন। যদি চেষ্টা করিয়া তাঁহার ঐ সময়ের মুখ খানি

মনে মনে চিত্রিত করিতে যাই, তবে কি দেখিতে পাই? উজ্জ্বল গৌরকান্তি—প্রশস্ত ললাট—দৃঢ়সংলগ্ন ওষ্ঠাধর—মুখমণ্ডলে ঈষৎ মলিনতার ছায়া—বোধ হয় ইহাই দেখিতে পাই। তাঁহার কথার মধ্যে কি শুনিতে পাই?—রাজার প্রতি "আর্য্যপুত্র! আপনার জয় হউক—এই আসনে উপবেশন করুন"—দাসীদিগের প্রতি—"পূজার পুষ্প চন্দন আনয়ন কর।" আর কোন কথাই নাই।

ফলতঃ, বড় বড় কবিরা যাহা যাহা বলেন, বা পাত্রদিগের দ্বারা বলান বা করান, তদ্দ্বারা ত গ্রন্থের প্রকৃত ভাব বুঝিতেই হয়, কিন্তু যাহা তাঁহারা বলেন না, বা বলান বা করান না, তাহার দ্বারাও—অনেক বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। বাসবদত্তা যে এতই চুপ করিয়া থাকিলেন তাহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই? পূজাবসরে—অন্ততঃ পূজাবসানে, তাঁহার দুই চারিটী কথা, ন্যূনকল্পে এক আধ বার হাসি—একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত—একটু অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র,—ও সকল ত কিছু না কিছু হইবারই কথা, কিন্তু কিছুই নাই কেন? বাসবদত্তা সাধ্বী, তেজস্বিনী, উচ্চ-প্রকৃতি—তিনি উদয়নের মত শুদ্ধ কথার কথা—ভাববিহীন রসিকতা—সুখের অভাবে তাহার ভাণ মাত্র—করিতে পারেন না। এই জন্যই অত চুপ চাপ।

উদয়নের হৃদয়ে যে অন্য প্রণয়ের অবসর আছে, এবং বাসবদত্তার প্রকৃতি যে অতি উচ্চ বলিয়া উহা ভয় ভক্তির বিশেষ আস্পদ, এই দুইটী তথ্য অতি নিপুণতা সহকারে দেখাইতে দেখাইতে কবি অপর একটী প্রণয়ের ভাব উন্মুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। উদয়ন এবং বাসবদত্তার স্তিমিত-প্রায় প্রেমানুরাগের যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই তীব্রতর অনুরাগের চিত্র প্রদর্শিত হওয়ায় ইহা আরও বিশিষ্টরূপে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাসবদত্তা শারিকার রক্ষার্থ পরিচারিণী সাগরিকাকে অন্তঃপুরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। বাসবদত্তার প্রদত্ত আজ্ঞা যে শ্রবণমাত্র প্রতিপাল্য, তাহা সাগরিকার ব্যব-

হারেই বিদিত হয়। সে নবীনা কৌতূহলপূর্ণা হইয়া পূজা দেখিতে আসিয়াছে কিন্তু রাজ্ঞীর আজ্ঞা পাইয়া কিছুই বলিতে পারিল না। আদেশমাত্র অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল; যাইতে যাইতে ভাবিল, আমি ত শারিকার পিঞ্জর সখী সুসঙ্গতার হস্তে দিয়া আসিয়াছি, অতএব শারিকার জন্য কোন শঙ্কা নাই—একটু অন্তরালে থাকিয়া যাই। এই ভাবিয়া সে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল, এবং ক্ষণেক পরেই পূজাস্থানের সমীপে আসিয়া রাজ্ঞী যে সময়ে উদয়নকে পূজা করিতেছেন, সেই সময়ে রাজাকে দেখিতে পাইল। সে রাজ্ঞীর পূজা গ্রহণকারী উদয়নকে প্রকৃত মদনদেবই মনে করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—

কহং পেক্‌খিদোজ্জেবব অপূর্ব্বো কুসুমাউহো অমূহাণং, তাদস্‌স অন্তেউরে চিত্তগদো অচ্চীঅদি ইহ্‌ পচ্চক্‌খো লক্‌খীঅদি। তা অহং পি ইমেহিং কুসুমেহিং ইহঠ্‌ঠিদা জ্জেবব ভঅবন্তং কুসুমাউহং পূঅইস্‌সং। নমো দে ভঅবং কুসুমাউহ সুভদংসণো মে ভবিস্‌সসি। দিট্ঠং জং দট্ঠববং; অমোঘদংসণো মে ভবিস্‌সসি। দিট্ঠোবি পুণো পেক্‌খিদব্বো।

অপূর্ব্ব কুসুমায়ুধকে দেখিলাম, পিতার ভবনে চিত্রে অর্চ্চনা করে, এখানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ! অতএব আমিও এই সকল কুসুম দ্বারা এই খানে থাকিয়াই ভগবান কুসুমায়ুধকে পূজা করি! হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ তোমাকে নমস্কার; আমার শুভদর্শন হউক! যাহা দেখিবার তাহা দেখিলাম! আমার অমোঘদর্শন হও! আশ্চর্য্য! দৃষ্ট হইয়াও পুনঃ পুনঃ দর্শনীয়।

যখন দেবদেবীদিগের পৃথিবীতে অবতরণ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ ছিল না, সে কালে সাগরিকার এই ভ্রমটী অসম্ভব বলিয়া অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। অতি পণ্ডিতা, অধিকতর প্রৌঢ়া, হিপেসিয়া নাম্নী গ্রীক জাতীয়া একটী রমণীর কোন সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া তাহাকে আপলোদেব বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল—এরূপ বর্ণনা আছে। ইহাও বর্ণিত আছে যে ঐ ভ্রমের সহিত হিপেসিয়ার হৃদয়ে অনিবার্য্য প্রণয়বেগ

প্রবিষ্ট হয়। সাগরিকারও তাহাই হইল। সে পুনঃ পুনঃ ঐ সাক্ষাৎ কামদেব উদয়নমূর্ত্তির প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতি অন্তঃপুর গমনের নিমিত্ত রাজ্ঞীর আদেশ আছে ইহা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইতে লাগিল। এমত সময়ে বৈতালিকের উক্তি দ্বারা জানিতে পারিল যে, ঐ দেবমূর্ত্তিই রাজা উদয়ন। অমনি তাহার স্মরণ হইল, তাহার পিতা এই রাজা উদয়নেরই সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত মনন করিয়াছিলেন। তাহার আর সুখের সীমা রহিল না—সে বলিল—

কহ অঅংসো রাজা উঅঅণো ণাম। জস্স অহং তাদেণ দিণ্ণা। তা পরপ্রেসণদূষিদংবি মে সরীর এদস্স দংসণেন দাবিং বহুমদং সংবুত্তং।

কি এই সেই রাজা উদয়ন; আমি তাতকর্তৃক যাঁহাতে সমর্পিত! তবে দাসত্বে দূষিত হইলেও আমার দেহ অদ্য ইহাঁর দর্শনে গৌরবান্বিত হইল।

---

(৯)

সাগরিকা বলিল "এই সেই রাজা উদয়ন, পিতা আমায় যাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন—তবে আমার শরীর পরপ্রেষণজনিত দোষে দুষ্ট হয় নাই"। সাগরিকার পিতা কে?—তিনি কখন্ কিরূপে রাজা উদয়নকে সাগরিকা সম্প্রদান করিয়াছিলেন?—যদি সাগরিকা উদয়নে সম্প্রদত্তা হইয়াছিল, তবে তাহার দাসীবৃত্তি কি জন্য হইল?।

স্বাধীনতাবস্থায় ভারতবর্ষ অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল বটে, কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র রাজ্যখণ্ডগুলির মধ্যে পরস্পর সম্মিলনের চেষ্টাও বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল। যে কোন রাজা কোন সময়ে প্রাবল্য লাভ করিতেন, তিনিই দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, অন্যান্য রাজাদিগের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেন, এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সমাধান করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্ বা সার্ব্বভৌম উপাধি গ্রহণ করিতেন। দিগ্বিজয়ের

উপযোগী বল সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত রাজাদিগের মধ্যে বিবেচনাপূর্ব্বক বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য হইয়াছিল— সুতরাং বুঝিয়া রাজাদিগের বিবাহ প্রদান করা রাজমন্ত্রীদিগের বুদ্ধিমত্তার এবং কার্য্যক্ষমতার একটী প্রধান প্রমাণ হইয়াছিল। কৌশাম্বী বা কনোজের রাজা উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সিংহলেশ্বর-দুহিতা রত্নাবলীর সহিত উদয়নের বিবাহ দেন। তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, ঐ বৈবাহিক ব্যাপার সিদ্ধ করিতে পারিলে উদয়ন বর্দ্ধিতবল হইয়া 'রাজচক্রবর্ত্তী' হইতে পারিবেন। কিন্তু মন্ত্রিবরের এই অভিলাষ সিদ্ধির পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায় ছিল। সিংহলেশ্বর জানিতেন যে, উদয়নের সহিত তাঁহার ভাগিনেয়ী অবন্তী-রাজদুহিতা বাসবদত্তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অতএব নিজ কন্যাকে ভাগিনেয়ীর সপত্নী করিয়া দিতে সিংহলেশ্বর একান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। মন্ত্রিবরের অভিলাষ সিদ্ধির আরও একটী বিষম অন্তরায় ছিল। রাজ্ঞী বাসবদত্তা যেরূপ তেজস্বিনী এবং উদয়ন তাঁহার যেরূপ বশ, তাহাতে বাসবদত্তার বিনানুমতিতে অন্য ভার্য্যা পরিণয়ে সম্মত হওয়া উদয়নের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য। এই সকল অন্তরায় অতিক্রম করিবার উদ্দেশে যৌগন্ধরায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটী কৌশলজাল বিস্তৃত করেন। তিনি রটাইয়া দেন যে, কৌশাম্বী এবং মগধের অন্তর্বর্ত্তী লাবণক নামক প্রদেশে রাজা যখন মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজ্ঞী বাসবদত্তা গৃহদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই জনপ্রবাদ সিংহলে পৌঁছিল, এবং যৌগন্ধরায়ণের প্রেরিত দূতও সিংহলে উপনীত হইয়া সিংহলেশ্বরের স্থানে বিগতভার্য্য উদয়নের নিমিত্ত তাঁহার রত্নাবলী কন্যাকে প্রার্থনা করিল। সিংহলরাজ ঐ প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং আপন অমাত্যকে সমভিব্যাহারে দিয়া কন্যাকে বহিত্রযোগে প্রেরণ করিলেন। যৌগন্ধরায়ণের অভিসন্ধি সিদ্ধির একটী ব্যাঘাত ঘুচিল বটে, কিন্তু বাসবদত্তা এবং বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের যে ভয়, ইহাতে তাহার কোন প্রতিবিধান হইল না। উহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত অনেকটা কাজ

করিতে হইল। রত্নাবলী যে জাহাজে আসিতেছিল সে জাহাজ সমুদ্রে ডুবিল, এবং রত্নাবলী আপন সমভিব্যাহারী সকল লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকিনী মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের নিকটে সমানীতা হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে রাজ্ঞী বাসবদত্তার নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, কন্যাটীকে সাগরতীরে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। বাসবদত্তা আপন পরিচারিকাদিগের মধ্যে স্থান দিয়া তাহার 'সাগরিকা' নাম রাখিলেন। সে কালের নিয়ম ছিল, আর অনেক দেশে একালেও নিয়ম আছে যে, সমুদ্র হইতে কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস যে পায়, তাহার সম্পত্তি হইয়া যায়। মনুষ্য হইলে দাস্যে নিযুক্ত হয়—কেহ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না—এবং জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলেও না। রাজতনয়া রত্নাবলী এইরূপে—অপরিচিতা দাসী সাগরিকা।

সাগরিকা দেখিল, যে ঘরে সে রাজরাণী হইতে পারিত, সেই ঘরেই সে দাসী হইয়াছে—যে জন তাহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিল, সেই এখন তাহার পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়াছে—দাসী হইয়া সেই রাজ-রাজেশ্বরকে কামনা করাও তাহার গুরুতর লজ্জার কারণ হইয়াছে। হৃদয়ে সেই লজ্জার আঘাতে প্রতিঘাত হইল, "এ পর-প্রেষণ আমার শরীরকে দূষিত করে নাই"—কিন্তু ঐ ভাব কতক্ষণ থাকে। অপার প্রেমে মোহিত 'পরবশ আত্মা', লজ্জা নিবারণের একমাত্র স্থায়ী উপায় যে মরণ তাহা হইতেও নিবারিত করে—হৃদয়বল্লভের মোহনমূর্ত্তিটী পুনঃ পুনঃ দেখিবার নিমিত্তই উত্তেজিত করে।

একবার এই সকল কথা ভাবিয়া লইতে পারিলে সাগরিকার বিরহ বেদনাটী অতি সুন্দররূপেই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত কবিরা বিরহ ব্যাপার লইয়া অনেকটা উৎকট এবং বিসদৃশ বর্ণন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীহর্ষের সাগরিকা বিরহ দুঃখ প্রকাশ জন্য আর কিছুই করে না—কেবল সে আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়, কুসুমায়ুধকে দুই একটী গালি দেয়, এবং দর্শনের সাধ মিটাইবে মনে করিয়া নিভৃতে উদয়নের

মোহনমূর্ত্তি চিত্রিত করে। সাগরিকা যে সময়ে একতান মনে উদয়নের ছবি আঁকিতে মগ্ন ছিল, সেই সময়ে সুসঙ্গতা নাম্নী তাহার সখী শারিকার পিঞ্জর হস্তে লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হয়—এবং সাগরিকা কর্ত্তৃক চিত্রিত উদয়নমূর্ত্তি দেখিয়া তাহা চিনিতে পারিয়া মনে মনে বলে—উপযুক্তই হইয়াছে—রাজহংসী কমলাকর ভিন্ন আর কোথায় অভিরত হইবে'। ইহার পর সুসঙ্গতা জিজ্ঞাসা করে যে, ঐ চিত্রটী কাহার? সাগরিকা বলে মদন দেবের। সুসঙ্গতা চিত্র-ফলকটী স্বহস্তে লয়, এবং কামদেবের নিকটে রতি-দেবীর চিত্র না থাকিলে ভাল দেখায় না বলিয়া রাজার ছবির পার্শ্বে সাগরিকারই চিত্র আঁকিয়া দেয়। আর লুকাচুরি চলে না—সাগরিকা মনের কথা খুলিল; প্রেমিক হৃদয় উদ্ঘাটিত হইলে স্বতঃই গীতিরূপে প্রকটিত হয়—এই জন্য গুণ গুণ স্বরে গান করিল—

দুল্লহ জন অনুরাও লজ্জা গুরুই পরবশো অপ্পা
পিঅসহি বিসমং পেম্মং, মরণং সরণং ণ বরিঅ মেক্কং।

---

(১০)

সাগরিকার বিরহ বর্ণনাটী সুন্দর,—পুরাতন হইয়াও যেন কতকটা নূতন। আর ইহাতে বিরহ ব্রতের চিরপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের অর্থাৎ পদ্ম-পত্রে শয়নাদি ব্যাপারের অযথা বিস্তার নাই। কাব্যনাটকাদিতে যে বিরহবর্ণনাদির আড়ম্বর হয়, তাহার একটী প্রকৃত কারণ আছে। ও সকল বর্ণনা না থাকিলে, প্রেমিক যুগলের হৃদয়ে যে প্রকৃত প্রণয়রস উদ্রিক্ত হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে না—সুতরাং সন্দিগ্ধ-চিত্ততার অবসর থাকায় অন্যোন্যের প্রতি প্রণয় গাঢ় হইবার সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যে পর্য্যন্ত করা আবশ্যক কবি তাহাই করিবেন, তাহার অধিক করিলেই সত্রুচির ব্যাঘাত হয়। রত্নাবলীতে উদয়নের প্রতি সাগরিকার প্রেম যে অতি প্রখর, তাহা অভি-

নয় দর্শকেরা সাগরিকা কর্তৃক মদনভ্রমে রাজার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ হওয়াতেই দেখিয়াছেন; উদয়ন নিজেও যে, সাগরিকার প্রেমের সম্যক্ প্রমাণ পাইবেন, কবি তাহারও বেশ যোগাড় করিয়াছেন। কিন্তু সাগরিকারও ত উদয়নের মনের গতিসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ চাই। সেরূপ প্রমাণ না পাইলে সেই লজ্জাশীলা রাজকুলবালা কেমন করিয়া আপনার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে? পদ্মপত্রে শয়নাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করাইয়া কবি, তাহারই উপায় করিয়া রাখিলেন। উদয়ন ঐ সকল বিরহোপকরণ দেখিয়া অনেক কথা বলিবেন, এবং সাগরিকা অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই সকল কথা শুনিবেন। কালিদাসের শকুন্তলাতে ইহার ঠিক বিপরীত বর্ণন দেখা যায়। সেখানে বিরহিণী শকুন্তলার পদ্মপত্রে শয়নাদি রাজা দুষ্মন্ত নিভৃতে থাকিয়া স্বচক্ষে দর্শন করেন।

রত্নাবলীকারের সরুচির অপর বিশেষ প্রমাণ এই যে, তিনি বিরহ ব্যাপারের বর্ণনা যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়, ঠিক সেই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, অধিক বাড়াবাড়ি করেন নাই। যদি পদ্মপত্রে শয়নাদি কদলীগৃহের অভ্যন্তরেই অভিনীত হয়, দ্রষ্টৃবর্গের সমক্ষে না হয়, নাটিকায় এরূপ কোন নির্দ্দেশ ছিল, মনে করা যায়, তাহা হইলে রত্নাবলীকারের প্রতি কিছুমাত্র দোষ স্পর্শিতে পারে না। যাহা হউক, বিরহ ব্যাপার সংক্ষেপেই সারা হইল। রাজার অশ্বশালা হইতে একটা বৃহৎকায় বানর তাহার শিকল ছিঁড়িয়া বাহির হওয়াতে রাজবাটীতে মহা হুল স্থূল পড়িয়া গেল। কদলীগৃহের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী সখীদ্বয় ভয়ে জড় সড় হইয়া তমাল পাদপচ্ছায়ায় লুকাইলেন। বানরটা কদলীগৃহে প্রবেশ করিল—পাখীর খাঁচায় দই মাখা ভাত ছিল, তাহা খাইবার নিমিত্ত খাঁচাটা নাড়িতে চাড়িতে উহা ভাঙ্গিয়া গেল—শারিকা উড়িয়া পলাইল। সাগরিকা এবং সুসঙ্গতা পাখীটা ধরিবার জন্য, সে যে দিকে উড়িয়াছিল, সেই দিকে চলিল।

রাজ্ঞীর পোষিত শারিকা উড়িয়া গেছে দাসীরা যে বিশেষ ব্যগ্র হই-

যাই তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে, তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এ স্থলে একটু বিশেষ ব্যগ্রতার অপর কারণও ছিল। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে কোন কোন পক্ষিজাতির শিক্ষায় সমধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই শিক্ষার প্রভাবে তাহাদের মধ্যে অনেকে অতি স্ফুট-বাক্ এবং বিলক্ষণ মেধা-শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ রাজস্থানে অনেক পোষিত শুকপক্ষীকে ঠিক মানুষের মত কথা কহিতে শুনা যায়—বাঙ্গালাতেও অনেক কাকাতুয়া, টিয়া এবং ময়না পাখী মানুষের কথার অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যখন ভারতবর্ষে অন্ন ছিল, সুখ ছিল, ঘরে ঘরে পাখী পোষা এবং পাখী পড়ান ছিল—তখন যে রাজা রাজড়াদিগের গৃহে অতি সুশিক্ষিত পক্ষী সকল থাকিত, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং সে সময়ে সেইরূপ পক্ষী সকল ছিল বলিয়াই তাহাদিগের জাতিস্মরতা প্রভৃতি অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে শ্লোক, আখ্যায়িকা এবং পুস্তকাদি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্বন্ধে অতি প্রচলিত একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

দম্পত্যোর্নিশিজল্পতোর্গৃহশুকেনাকর্ণিতং যদ্বচ,
স্তৎপ্রাতগুরুসন্নিধৌ নিগদত স্তস্যোপহারং বধূঃ।
কর্ণালঙ্কৃতি-পদ্মরাগ-শকলং বিন্যস্য চঞ্চুপুটে,
ব্রীড়ার্ত্তা প্রকরোতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্বন্ধনম্॥

দম্পতী রজনীতে পরস্পর যে সকল কথোপকথন করিয়াছিল, গৃহস্থিত শুকপক্ষী তাহা শুনিয়া প্রাতঃকালে গুরুজন সমক্ষে আবৃত্তি করিতে লাগিল; ইহাতে বধূ অতিশয় লজ্জাকুলা হইয়া পকদাড়িম্ব বীজ তুল্য আপনার কর্ণালঙ্কার পদ্মরাগ মণিখণ্ডকে উহার চঞ্চুপুটে উপহাররূপে প্রদান করিয়া কৌশলক্রমে কথা বন্ধ করিল।

বানর কর্ত্তৃক খাঁচা ভগ্ন হওয়ায় যে শারিকাটী উড়িয়া পলাইল সেটীও ঐরূপ অত্যন্ত মেধাবিনী ছিল। তাহার সমীপে কেহ কোন

কথা বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা শিখিয়া ফেলিত, এসং সেই কথার আবৃত্তি করিত। সখী সুসঙ্গতার শঙ্কা হইল যে, শারিকাটী উড়িয়া গিয়া যেখানে সেখানে, তাহার সহিত সাগরিকার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি করিবে—এই শঙ্কা প্রযুক্তই সে শারিকাটীকে ধরিবার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইল, এবং চিত্রফলক খানি যে কদলীগৃহে পড়িয়া রহিল, তাহার সংগ্রহের নিমিত্ত প্রথমে কোন চেষ্টাই করিল না।

কিন্তু ঐ সময়ে অপর একটী ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে রাজা এবং রাণীতে দুইটী ফুলের গাছ লইয়া একটী বাজী রাখা হয়। রাজা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নবমালিকার গাছে আগে ফুল ফুটিবে—রাণী বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মাধবীলতায় আগে ফুল ফুটিবে। রাজা কোন গুণী ব্যক্তির দ্বারা নবমালিকার মূলে এরূপ দোহদ সংযোজিত করিয়াছিলেন যে, তাহার গুণে নবমালিকা পুষ্পরাশিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া সহচর বসন্তকের সহিত বিকসিত-পুষ্প নবমালিকাটীকে দেখিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরোদ্যানে আসিয়াছিলেন, এবং রাজ্ঞীকে তথায় আসিবার নিমিত্ত বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কবি এই উপলক্ষে রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি রাজার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার একটী সুযোগ পাইয়া তাহা ছাড়েন নাই। রাজা বসন্তককে বলিলেন—

> উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচিং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণা
> দায়াসং শ্বসনোদ্গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।
> অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাংধ্রুবং
> পশ্যন্ কোপবিপাণ্ডুরপ্রতিমুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহং॥

উদ্দামোৎকলিকা, বিপাণ্ডুরকান্তি, প্রারব্ধজৃম্ভা, অবিরল শ্বাসোদ্গমে মুহুঃ আয়াস প্রাপ্তবতী, মদনাবস্থাপন্না, অন্য নারীর ন্যায় এই উদ্যানলতাকে প্রদর্শন করিয়া আজি আমি নিশ্চয় দেবীর কোপপাণ্ডুর প্রতিমুখ করিব।

প্রিয়তমাকে এমন সকল বাজীতে হারাইয়া দিয়া তাঁহার একটু রাগাল রাগাল—সলজ্জ সলজ্জ—অভিমানের মুখখানির শোভা দেখিতে রসিক

পুরুষের ইচ্ছা হইতে পারে বটে, কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তার সে মুখ-শোভা দর্শনের লালসায় ব্যগ্র নহেন। তিনি বাসবদত্তার মুখে কোপের প্রভাবই বিস্ফুরিত হইবে, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। কবি, প্রথম হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন, এ স্থলেও দেখাইলেন যে, উদয়ন বাসবদত্তাকে তেমন ভাল বাসিতেন না—অতএব তাঁহার মন প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারেন নাই। রাজা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া নবমালিকা দর্শনে যাইতেছেন, এমত সময়ে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একটী শারিকা পড়িতেছে, শুনিতে পাইলেন শারিকা পড়িতেছে—"সখি! তুই কেন এই চিত্রফলকে আমায় চিত্রিত করিলি?" "সখি! রাগ কর কেন? তুমিও যেমন কামদেবের চিত্র আঁকিয়াছ, আমিও তেমনি রতিদেবীর চিত্র আঁকিয়াছি বই ত নয়।" "সখি!—পদ্মের পাতা, মৃণালের বলয়, খুলিয়া দাও।"

"দুল্লহ জন অনুরাও লজ্জাগুরুই পরব্বসা অপ্পা
পিঅসহি বিসমং পেম্মং, মরণং সরণং ণ বরিঅ মেক্কং।"

---

(১১)

শারিকাটি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই উড়িল—রাজা লক্ষ্য করিলেন যে, সে কদলী গৃহের দিকে গেল। আপনিও সেই দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন—

দুর্ব্বারাং কুসুমশরব্যথাং বহন্ত্যা
তন্বঙ্গ্যা যদভিহিতং পুরং সখীনাং
তদ্ভূয়ঃ শিশু-শুক-শারিকাভিরুক্তং
ধন্যানাং শ্রবণপথাতিথিত্বমেতি।

দুর্ব্বার মদনব্যথা বহনকারিণী কৃশাঙ্গী আপনার সখীজনদিগের সম্মুখে যাহা যাহা বলেন, তাহা শিশু, শুক, শারিকাদিগের কর্ত্তৃক পুনরুক্ত হইয়া যাহাদিগের শ্রবণপথের অতিথি হয়, তাহারা ধন্য।

এই কবিতাটি অতি উপাদেয়। আর কোথাও প্রকৃত প্রণয়ের এরূপ সুন্দর অসন্দিগ্ধ প্রমাণ প্রদানের উপায় করা হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না। কিন্তু এতাদৃশ অপূর্ব্ব এবং রুচিকর প্রমাণের আবিষ্কৃতি মাত্র এই কবিতাটির গুণ নহে। ইহাতে যে বক্তার গূঢ় প্রণয়াকাঙ্ক্ষা সূচিত করিতেছে, উহাই এই কবিতাটীর বিশেষ গুণ। রাজা বলিলেন, যাহাদিগের কর্ণে সখীজনের সহিত বিরহিণীর বিশ্রব্ধ আলাপের কথা শিশু, শুক বা শারিকা কর্ত্তৃক পুনরুক্ত হয়, তাহারা ধন্য। কিন্তু শুদ্ধ ঐরূপ পুনরুক্তি শুনিতে পাইলেই কি ধন্য হওয়া যায়?—কখনই নয়। যদি নিজেই তাদৃশ বিশ্রব্ধালাপের বিষয়ীভূত হওয়া যায়—তা হলেই ধন্য! কবি, এই 'ধন্য' শব্দটির প্রয়োগ করিয়া কতটা ভাবই ব্যক্ত করিলেন। তিনি পূর্ব্বে এক বার দেখাইয়াছেন যে, উদয়নের হৃদয়ে কোন বিরহিণীর প্রণয়াস্পদ হইবার নিমিত্ত একটি গূঢ় আকাঙ্ক্ষা আছে, আবার এই স্থলে সেই ভাব অধিকতর স্পষ্ট করিলেন। উদয়ন ঐরূপ ধন্য পুরুষ হইতে একান্ত অভিলাষী!

রাজা শারিকার অনুসরণে বসন্তকের সহিত কদলীগৃহে প্রবেশ করিলেন—সেখানে গিয়া একটী চিত্রফলকে তাঁহারা নিজের এবং লাবণ্যময়ী একটী যুবতীর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন—

লীলাবধূতপদ্মা কথয়ন্তী পক্ষপাতমধিকন্নঃ।
মানসমুপৈতি কেয়ং চিত্রগতা রাজহংসীব।

আমাদের প্রতি সমধিক পক্ষপাত প্রকাশ করত লীলাচ্ছলে পদ্ম বিকম্পিত করিয়া রাজহংসীর ন্যায় মানসে প্রবেশ করিতেছেন, চিত্রাঙ্কিতা ইনি কে?

রাজহংসী সাগরিকা উদয়নের হৃদয়পদ্ম বিকম্পিত করিয়া তাঁহার মানস সরোবরে প্রবেশ করিল। রাজা সহচর বসন্তককে ঐ চিত্রগত রূপমাধুরীর ব্যাখ্যা করিয়া অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। সে সকল

কথা, বাসবদত্তার রূপবর্ণন সম্বন্ধে যেরূপ শান্ত নির্ম্মল রসিকতাপূর্ণ বাক্যাবলী নিঃসৃত হইয়াছিল, সেরূপ নহে; এ কথা গুলি তীব্র লালসায় পরিপূর্ণ। এবারে আর সমুদয় দেহযষ্টির প্রতি সামান্য দৃষ্টি নয়—এবার, শরীরের প্রতি পর্ব্বে পর্ব্বে চক্ষুর বিলম্বিত অবস্থান—

কৃচ্ছ্রাদূরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে,
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিস্পন্দতামাগতা।
মদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌস্তনৌ,
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥

আমার দৃষ্টি ইহার উরুযুগ কষ্টে অতিক্রম করিয়া নিতম্বস্থলে অনেক ক্ষণ ভ্রমণপূর্ব্বক ত্রিবলীতরঙ্গে বিষমতা প্রাপ্ত মধ্যদেশে একবারে স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়াছিল—সম্প্রতি উন্নত পয়োধরে আরোহণপূর্ব্বক তৃষিতের ন্যায় সাকাঙ্ক্ষ ভাবে জলকণস্রাবিলোচনদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছে।

চিত্রফলকে সাগরিকার ছবিটি কেমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল? রাজা যখন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন—সাগরিকা তাঁহাকে সেই সময়েই দেখে, অতএব তাঁহাকে ক্ষত্রিয়জনোচিত গরুড়াসনোপবিষ্টরূপেই অঙ্কিত করিয়াছিল। যদি রাজার ছবির সেই ভাব হয়, তাহা হইলে রতিব্যপদেশে অঙ্কিত সাগরিকার চিত্রও ঐ চিত্রের বাম দিকে স্ত্রীজনোচিতপদ্মাসনোপবিষ্ট ভাবেই অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। এই জন্য উরুযুগই প্রথম দ্রষ্টব্য হইয়াছে।

এ দিকে সাগরিকা এবং সুসঙ্গতা চিত্রফলকটী সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে কদলীগৃহের নিকটে আসিল এবং রাজা ও বসন্তকের কথোপেকথন শুনিয়া জানিতে পারিল যে, শারিকার মুখে ব্যক্ত হইয়া সকল কথাই রাজার কর্ণগোচর হইয়া গিয়াছে—এবং চিত্রফলকটীও রাজার হাতে পড়িয়াছে। উভয়ে অন্তরালে থাকিয়া রাজার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। যখন রাজা উল্লিখিতরূপে সাগরিকার রূপের বর্ণন করিলেন, তখন সুসঙ্গত সাগরিকাকে বলিলেন, "সহি! শুনচ তু!" সাগরিকা উত্তর;

করিলেন, "তুমিই শোন—তোমারই আলিখিত চিত্রের বর্ণন হইতেছে।"। এই উক্তি প্রত্যুক্তির দ্বারা কবি, রাজার প্রণয় ভাবের আরও প্রমাণ দেখাইবার প্রয়োজন আছে, বুঝাইলেন। কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্তকে দিয়া বলাইয়াছেন—

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা।
নবমেঘোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিতা মুখে॥

পক্ষী পিপাসাশুষ্ককণ্ঠে অম্বু যাচ্ঞা করিল, অমনি নবমেঘপরিত্যক্ত ধারা তাহার মুখে পতিত হইল।

রত্নাবলীকার তাঁহার নায়িকাকে তত ঝট্ করে চাতকের মুখে ফেলিতে চানে না। এই জন্যই ঐ উক্তি প্রত্যুক্তি "ও ত ছবির প্রশংসা—আমার কি?" সেই "আমার কি" সন্দেহ কাটাইবার জন্য প্রথম শ্লোক—

ভাতি পতিতো লিখন্ত্যা তস্যা বাষ্পাম্বুশীকরকণৌঘঃ।
স্বেদোদ্গমইব করতলস্পর্শাদেষ মে বপুষি।

লিখিতে লিখিতে ইহাঁর বাষ্পবারিশীকর সমূহ আমার শরীরে পতিত হইয়া করতল সংস্পর্শজাত স্বেদোদ্গমের ন্যায় দেখাইতেছে। অতএব সামান্য ছবির ভাবে ছবি খানি দেখা হইতেছে না—ছবি হইতেই প্রকৃত ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ইহার পর যে পদ্মপত্রে সাগরিকার শয়নাদি হইয়াছিল—সেইগুলি দেখিয়া, তুলিয়া, নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া, রাজা অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন—আর প্রমাণ প্রাপ্তির পক্ষে কোন ক্রটিই রহিল না।

সুসঙ্গতা আর স্থির থাকিতে পারিল না—সে কদলীগৃহে প্রবেশ করিল, এবং দুই চারিটী কথা কহিয়াই রাজাকে বলিল—মহারাজ! ঐ চিত্রফলকে রতিব্যপদেশে তাঁহাকে চিত্রিত করায়, সখী আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন, মহারাজ আসিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করুন!

রাজা ব্যগ্র হইয়া আসিলেন—এবং সুসঙ্গতার কথায় সাগরিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—

শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লব।
কুতোঽন্যথা স্রবত্যেষ স্বেদচ্ছদ্মামৃতদ্রবঃ॥

ইনি শ্রী, ইঁহার কর পারিজাতের পল্লব, নতুবা স্বেদচ্ছলে অমৃত দ্রব কোথা হইতে?

রাজা সাগরিকার যে হাত ধরিলেন—অমনি ধরিয়াই রহিলেন। কথা প্রসঙ্গে বসন্তক, দেবী বাসবদত্তার নাম করিয়া ফেলিল। অমনি রাজা হাত ছাড়িয়া দিলেন।' সাগরিকা ও সুসঙ্গতা সরিয়া গেল।

বাসবদত্তা আসিলেন—রাজার সুখপূর্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন, আর নবমালিকার পুষ্পোদ্গম দেখিতে যাইবার প্রয়োজন নাই, আর্য্যপুত্রের হাসি হাসি মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি, নবমালিকার পুষ্পোদ্গম হইয়াছে এই বলিয়া বাসবদত্তা আর গেলেন না। কিন্তু চিত্রফলকটি তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল; রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন' এ কি?' বসন্তক উত্তর দিলেন, আমি রাজার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। বাসবদত্তা স্ত্রী চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটিও কি বসন্তকের কারিগুরি?" রাজা বলিলেন, "এটি মনগড়া ছবি—কোন দৃষ্ট-পূর্ব্বার চিত্র নহে।" বাসবদত্তা বলিলেন—আর্য্যপুত্র! এই চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল—সুখে থাক—আমি যাই"। রাজা বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া বলিলেন—

প্রসীদেতি ব্রূয়ামিদ মসতি কোপে ন ঘটতে
করিষ্যাম্যেবং নো পুনরিতি ভবেদভ্যুপগমঃ।
ন মে দোষোস্তীতি ত্বমিদ মপিচজ্ঞস্যসিমৃষা,
কিমেতস্মিন্ বক্তুং ক্ষমমিতি নবেদ্মি প্রিয়তমে॥

কোপ না হইলে প্রসন্ন হও এ কথা বলা সম্ভবে না; পুনরায় এমন কর্ম্ম করিব না, ইহা বলিলে অপরাধই স্বীকার করা হয়। আমার দোষ নাই,

এ কথাও তুমি মিথ্যা জ্ঞান করিবে, অতএব হে প্রিয়তমে, এ বিষয়ে যে কি বলিব তাহা জানি না।

বাসবদত্তা বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া লইয়া বলিলেন—

অজ্জ উত্ত! মা অন্নধা সংভাবেহি, সচ্চং এব্ব মং সীসবেঅণা বাধেদি। তা গমিসসং।

আর্য্যপুত্র! অন্যথা ভাবিবেন না, সত্যই আমাকে মস্তক বেদনা বাধা দিতেছে, অতএব যাই।

বাসবদত্তা চলিয়া গেলেন। বসন্তক বলিল, আমাদের বড় সৌভাগ্য দেবী কুপিতা হয়েন নাই। রাজা উত্তর করিলেন—তুমি দেবীর কোপানুবন্ধ নিগূঢ়রূপে লক্ষ্য কর নাই।

ভ্রূভঙ্গে সহসোদ্গতেঽপি বদনং নীতং পরাং নম্রতা
মীষন্মাং প্রতি ভেদকারি হসিতং নোক্তং বচো নিষ্ঠুরং।
অন্তর্ব্বাস্পজড়ীকৃতং প্রভুতয়া চক্ষুর্নবিস্ফারিতং
কোপশ্চ প্রকটীকৃতো দয়িতয়া মুক্তশ্চ ন প্রশ্রয়ঃ॥

প্রিয়ার সহসা ভ্রূভঙ্গ উপস্থিত হইলেও বদন নত করিয়াছেন, আমার প্রতি ভেদকারী ঈষৎ হাস্য হাসিয়াছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাই; অন্তর্ব্বাষ্প দ্বারা জড়ীভূত চক্ষুকে প্রভুতাগুণে বিস্ফারিত করেন নাই; কোপ প্রকটীকৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রশ্রয় পরিত্যক্ত হয় নাই।'

---

(১২)

রত্নাবলীর নাটিকার রাজ্ঞী বাসবদত্তার চরিত্রচিত্রটী কি অপূর্ব্ব বস্তু।—রাজা তাঁহার রূপ বর্ণন করিয়া সুদীর্ঘ সালঙ্কার কবিতা সকল আবৃত্তি করেন, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ হয় না। তাঁহার আজ্ঞা পালনে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারে না, অথচ তিনি 'পরিজনবৎসলা'। রাজা নবমালিকার পুষ্পোদ্গম দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করেন;

আসিয়া, রাজার মুখ দেখিয়াই বলেন, আর নবমালিকা দেখিবার প্রয়োজন নাই, তোমার হাসি হাসি মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি, আমার হারি হইয়াছে! রাজা অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইতেছেন বুঝিয়া, যেমন ক্রোধের উদ্রেকে ভ্রূভঙ্গ উপস্থিত হয়, অমনি আত্মদমন করিয়া মুখমণ্ডলকে বিনয়নম্র করেন, যেমন অন্তর্বাষ্প উত্থিত হইয়া নেত্রদ্বয়কে সজল করিয়া আনে, অমনি আত্মসংযম বলে চখের জল চখেই শুষ্ক করেন; কটু কথা বলেন না—কেবল মাত্র 'ভেদকারী' ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিয়া যান। এ কি অত্যদ্ভুত স্ত্রী-চিত্র! এরূপ আত্মদমনশীলা, উপেক্ষাকারিণী, অনুগ্রহপরায়ণা, পরিজন বৎসলা, যাঁহার চরণ স্মরণ করিয়া পরিজনবর্গ শপথ গ্রহণ করে, মানুষী-দেবী কি কাব্য নাটকাদিতে আর দেখিতে পাওয়া যায়?

সকল কাব্য-নাটকেই দেখা যায়, উৎকৃষ্টা নায়িকামাত্রেই কোমলা, সরলা, দুর্ব্বলা, মুগ্ধারূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। এত আত্মদমন, এত উপেক্ষা, এত গাম্ভীর্য্য আর কোন নায়িকায় দেখা যায় না। এই বস্তুটি কি রত্নাবলীকারের মনঃ কল্পিত, না রত্নাবলীকার তাঁহার বাসবদত্তা সংগঠনের উপাদান গ্রন্থান্তর হইতে পাইয়াছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে আরও অনেক কথা বাহির হয়—এবং তাহাতে সমগ্র নাটিকাটীরই প্রকৃতি কিছু নূতন ভাব ধারণ করে। রত্নাবলীর আখ্যায়িকা অপর একটী মূলগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। সে মূলগ্রন্থ 'বৃহৎ কথা' বা তাহারই সংক্ষিপ্তসার 'কথা সরিৎ সাগর'। যেমন রামায়ণ এবং মহাভারত, মহাবীর উত্তরচরিতাদি এবং শকুন্তলা বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটকের উপজীব্য, বৃহৎ কথাও সেইরূপ অনেক কাব্য নাটকাদির অবলম্ব। 'মুদ্রারাক্ষস' 'নাগানন্দ' এবং 'রত্নাবলীর' উপাখ্যান ভাগ বৃহৎ কথা হইতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। 'নাগানন্দে'র ত আদ্যন্ত সমুদায়ই 'কথা সরিৎসাগর' হইতে লওয়া। যদিও রত্নাবলীর সমুদায় কথা সেরূপ আনুপূর্ব্বীক্রমে ঐ

গ্রন্থ হইতে লওয়া হয় নাই, তথাপি ইহারও অনেক সার কথা, ঐ গ্রন্থের।

ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত আছে যে, রাজা উদয়ন যখন গর্ভস্থ তখন তাঁহার মাতা একটা লোহিত হ্রদ হইতে গরুড় কর্তৃক আকাশ পথে উদয়গিরির শিখরদেশে সমানীতা হয়েন। উদয়ন সেই স্থানে জন্মেন। এ স্থলে কি এরূপ বোধ হয় না যে, ঐ 'লোহিত হ্রদ' সূর্য্যোদয়-কালীন প্রাচী দিক্?—উদয়নের মাতা উষাদেবীর প্রতিরূপ?—এবং উদয়ন নিজে সূর্য্যদেবের প্রতিরূপ স্বরূপ? সূর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত "সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ"—তিনি সকল দেবতাময়। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সকল দেবতারই স্থানীয় হইতে পারেন।

'কথা সরিৎসাগরের' ত্রয়োদশ তরঙ্গের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—

এষা বাসবদত্তা চ পত্নী তে নৈব মানুষী।
দেবীয়ং কারণবশাদবতীর্ণা ক্ষিতাবিতি॥

এই বাসবদত্তা তোমার পত্নী মানুষী নহেন, ইনি দেবী, কারণবশে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

ঐ শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে যে, বাসবদত্তা কোন দেবীর প্রতিরূপ স্বরূপা। কোন্ দেবী? তাহাও অব্যক্ত নাই। একবিংশ তরঙ্গে দেখা যায়—

পুরাহনঙ্গাঙ্গসংভূত্যৈ রত্যাস্তুতিভিরর্চ্চিতঃ।
তুষ্টো রহস্যসংক্ষেপং ইদং তস্যা শিবোভ্যধাৎ॥
অবতীর্য্য নিজাংশেন ভূমাবারাধ্য মাংস্বয়ং।
গৌরী পুত্রার্থিনী কামং জনয়িষ্যত্যসাবিতি॥
অতশ্চণ্ডমহাসেনসুতা দেবী নরেন্দ্র সা।
জাতা বাসবদত্তেয়ং সম্পন্না মহিষী চ তে॥

পূর্ব্বকালে অনঙ্গের অঙ্গসংঘটন নিমিত্ত রতি কর্তৃক অর্চ্চিত এবং স্তুতিদ্বারা তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে শিব এই রহস্যসংক্ষেপ বলিলেন। গৌরী

নিজ অংশে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া পুত্রার্থিনীরূপে স্বয়ং আমাকে সম্যক্ আরাধনা পূর্ব্বক কামদেবকে জন্মাইবেন। অতএব হে নরেন্দ্র! সেই দেবী গৌরী চণ্ডমহাসেনসুতা বাসবদত্তা হইয়া জন্মিয়াছেন, এবং তোমার মহিষী হইয়াছেন।

তবেই জানা গেল যে, রাজ্ঞী বাসবদত্তা সাক্ষাৎ গৌরী বা আদ্যা প্রকৃতির অংশস্বরূপা। ইহাও জানা গেল যে, ইনিই কামদেব জননী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা রমণী প্রদ্যুম্ন-মাতা রুক্মিণী দেবী হইতে অভিন্না। কিন্তু উদ্ধৃত শ্লোকে শিব বলিতেছেন, ইনি সাক্ষাৎ আমাকে আরাধনা করিয়া কামদেবকে পুত্ররূপে পাইবেন। তাহা হইলে হরি হরের যে অভিন্নতা তাহাও এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। রত্নাবলীর নান্দীর তৃতীয় শ্লোকটীরও দুই পক্ষে—অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে এবং শিবপক্ষে—সমান অর্থ হয়। ঐ শ্লোকটীর তাদৃশ বৈচিত্র্য, মূলগ্রন্থের এই হরিহরের একাত্মতা ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পাঠকের বোধ সৌকর্য্যার্থে নান্দীর ঐ শ্লোকটী এই স্থলে পুনরুদ্ধৃত করা যাইতেছে—

সংপ্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং ত্বত্তো মদর্থে পুরা
তদ্যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নির্লজ্জ বোঢ়ুং তব
তামেবানুনয়স্ব ভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণ কণ্ঠগ্রহং
মুঞ্চেত্যাহ রুষা যমদ্রিতনয়া লক্ষ্মীশ্চ পায়াৎসবঃ॥

পূর্ব্বকালে আমার নিমিত্ত তোমা হইতে মকরধ্বজ (হরপক্ষে কন্দর্প, হরিপক্ষে সমুদ্র) মথন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব হে নির্লজ্জ! আমার সম্মুখে সেই বহুমার্গগাকে (হরপক্ষে গঙ্গা, হরিপক্ষে সরস্বতী) বহন করিতেছ, ইহা কি তোমার উচিত? অতএব (হরপক্ষে)—হে কৃষ্ণকণ্ঠ! গ্রহ—আগ্রহ ত্যাগ কর। (হরিপক্ষে) হে কৃষ্ণ! কণ্ঠগ্রহ ত্যাগ কর। ভাবকুটিলা তাহাকেই অনুনয় কর; এই কথা রোষভরে (হরপক্ষে অদ্রিতনয়া এবং হরিপক্ষে লক্ষ্মী) যাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন্।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে কি এই নাটিকাটী রূপক বর্ণনা। আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। রত্নাবলী কখনই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ন্যায় আধ্যাত্মিক বিষয়ের অভিনয়াকারে প্রদর্শন নহে। কিন্তু ঠিক তেমন না হইলেও যখন ইহার মূলগ্রন্থে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই দেবতারূপে অভিব্যক্তি আছে, তখন এই নাটিকার উপরেও যে দৈব ভাবের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়; বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, রত্নাবলীকার শ্লিষ্ট পদ ব্যবহারে বিশেষ সমুৎসুক, এবং দ্ব্যর্থ ঘটাইয়া লিখিতে বিলক্ষণ নিপুণ, তখন নাটিকাটীর আপাতদৃষ্ট তাৎপর্য্যের অভ্যন্তরে তিনি আর একটী গূঢ় তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এরূপ অনুমান তাঁহার সম্বন্ধে বিলক্ষণ সুসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। যদি কোন গূঢ় দৈব ভাব রত্নাবলীতে থাকে, তবে সে কি ভাব হইবে? নায়ক 'উদয়ন' 'পুরুষোত্তমের' প্রতিরূপ হইলে, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে সম্মিলিত হইবেন, কারণ পুরাণ-শাস্ত্রে বলে—

লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভার্য্যা হরেরপি।
প্রেমাসমাস্তাস্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ॥

লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা (দেবী গৌরীর স্থানীয়া) শ্রীহরির এই তিন ভার্য্যা, প্রেমে সমানা, সর্ব্বদা হরি-সমীপে থাকেন।

প্রথমা স্ত্রী যদি 'গৌরীর' প্রতিরূপা হয়েন, তবে অপর দুই জনের মধ্যে একজন অবশ্যই 'সরস্বতী' এবং একজন অবশ্যই 'লক্ষ্মী' হইবেন।

রত্নাবলীতে উদয়নের দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর নাম নির্দ্দেশ নাই—কিন্তু 'প্রদ্যোতসুতা' বলিয়া প্রথমাঙ্কের প্রারম্ভেই তাঁহার উল্লেখ আছে। 'প্রদ্যোত' শব্দের অর্থ 'অগ্নি' এবং 'ব্রহ্মনন্দিনী' রাণীকে অগ্নির কন্যাও বলিয়া থাকে। মূলগ্রন্থ বৃহৎ কথায় উদয়নের দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর নাম আছে। উহা 'পদ্মাবতী'। 'পদ্মাবতী' বিশেষরূপে দেবী লক্ষ্মীরই নামান্তর, তবে উহা দেবী সরস্বতীরও নামান্তর না হইতে পারে, এমত নহে। কিন্তু

রত্নাবলীকার 'পদ্মাবতী' নামের উল্লেখ না করাতে, এবং প্রদ্যোতসুতা বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করাতে তাঁহাকে 'সরস্বতীর' প্রতিরূপস্বরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করাই যেন তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

যদি তেমন অভিপ্রায় হয়, তবে তৃতীয়া রাজ্ঞী অবশ্যই লক্ষ্মীদেবীর প্রতিরূপস্বরূপা হইবেন। রত্নাবলীই সেই তৃতীয়া রাজ্ঞী। লক্ষ্মীদেবী সমস্ত রত্নরাজির অধিষ্ঠাত্রী—ইনিও রত্নাবলী। লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানে উল্লেখ আছে, "মুক্তাহারবিরাজমানপৃথুলোত্তুঙ্গস্তনোদ্ভাবিনী"—পৃথুল উত্তুঙ্গস্তনদ্বয় মুক্তা-হারদ্বারা উদ্ভাবিত, রত্নাবলীরও একটী অপূর্ব্ব রত্নমালা ছিল। লক্ষ্মীদেবীর নামান্তর সাগরসম্ভবা—ইহাঁরও একটী নাম সাগরিকা। লক্ষ্মীদেবী বরুণ দেবের কন্যা যথা,—

"তদা লক্ষ্মীশ্চ কলয়া পুরা নারায়ণাজ্ঞয়া।
বভূব সিন্ধুকন্যা সা শক্রসম্পৎস্বরূপিণী"॥

পূর্ব্বকালে নারায়ণের আজ্ঞায় ইন্দ্রের সম্পৎস্বরূপা লক্ষ্মীদেবী নিজাংশে সিন্ধুকন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। বরুণদেবের একটী নাম 'মহাবাহু' যথা—

বরুণোধবলোজিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহু স্তস্মৈনিত্যং নমোনমঃ॥

রত্নাবলীরও পিতার নাম 'বিক্রমবাহু'। যখন এতগুলি মিল পাওয়া যায়—তখন নাটিকার মধ্যে সাগরিকার সম্বন্ধে "শ্রীরেষা" ইনি 'লক্ষ্মী' বলিয়া রাজার যে উক্তি আছে সে উক্তিটী যেমন সৌন্দর্য্যপ্রশংসাপর তেমনি স্বরূপাখ্যান বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সেই শ্লোকেই আছে, "পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ" ইহাঁর হস্তও পারিজাতের পল্লব—লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানেও দৃষ্ট হয়, "কাঙ্ক্ষিতপারিজাত লতিকাং" ইনি কাঙ্ক্ষিত পারিজাতলতিকা। আর একটী শ্লোকে যে, 'লীলাবধূতপদ্মা' ক্রীড়ায় পদ্ম বিকম্পিত করিয়া, এই শ্লিষ্ট পদটী আছে তাহার অভ্যন্তরে দেবী লক্ষ্মীর হস্তস্থিত 'লীলাকমলের' উল্লেখ থাকিতে পারে, কারণ 'পদ্মধারিণী' লক্ষ্মীদেবীর দ্বাদশ নামের মধ্যে একটী নাম। রাজা রত্না-

বলীকে পত্নীরূপে পাইয়া বলিলেন, "সসাগরমহীপ্রাপ্ত্যেকহেতুঃ প্রিয়া" প্রিয়াই সসাগরা মহীপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু। শাস্ত্রেও বলে সমস্ত 'বসুন্ধরা' লক্ষ্মীর আবাস।

আর্য্য কবিরা শুদ্ধ মানুষ ভাব বর্ণন করিতে তত ভাল বাসিতেন না। তাঁহাদিগের চক্ষে বাহ্য জগৎ অন্তর্জগতের প্রতিবিম্বরূপেই প্রতিভাত হইত। যে বাহ্য ব্যাপারে তাঁহাদিগের মনোনিবেশ হইত, তাহাই যেন সামান্য বাহ্যমূর্ত্তি পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক আলোকে রঞ্জিত, এবং পরিশেষে দেবলীলায় পর্য্যবসিত হইত।

বিবিধ প্রবন্ধ।

মৃচ্ছকটিক।

(১)

সংস্কৃতে যতগুলি নাটক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকখানি সর্ব্বাপেক্ষায় অতি প্রাচীন। এই নাটক সম্রাট বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্বতন কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ইহার প্রণেতা এক জন রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম বলা হইয়াছে শূদ্রক। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের কোন্ ভাগের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার কোন নির্ণয় হয় নাই। কাহার কাহার মতে তিনি মগধদেশের অন্ধ্র বংশীয় রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ, আবার কাহার মতে তিনি অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিচারেও শূদ্রক রাজার প্রাদুর্ভাবের সময় সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন, ঐ সময় খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, কেহ বলেন দুই শত বৎসর পরে, আবার কেহ বলেন ছয় শত বৎসর পরে।

কিন্তু ঐ সকল কল্পনাপূর্ণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের কোন প্রয়োজন এবং কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতি-বৃত্তিক কাল নির্ণয়ের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যতই গবেষণা করুন, সমুদায় গবেষণার মূল একটী কথা মাত্র। রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একজন গ্রীকজাতীয় রাজদূত রাজধানী পাটলীপুত্রে আসিয়াছিলেন। সেই রাজ-

দূতের প্রণীত গ্রন্থ আছে এবং উহা কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল তাহা জানা আছে, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময়ও তদ্দ্বারা জানা হইয়াছে। এই এক মাত্র পরিজ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া অপর সমুদায় ঐতিহাসিক বিবরণের সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। সুতরাং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার যথেষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত মিলাইবার কোন উপায় না থাকায়, বিচারকদিগের মধ্যে অপরিসীম মতভেদ জন্মিয়া যায়, এবং প্রকৃত বিষয়ের সহিত মিলাইতে না পারিলে, বিচার যেরূপ গলদ্‌গোময় হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হয়।

কিন্তু যিনিই যাহা বলুন, মৃচ্ছকটিক নাটক নিতান্ত অল্প দিনের বস্তু নয়। উহা রামায়ণ এবং মহাভারতের পরবর্ত্তী ত বটেই, রাজা চন্দ্রগুপ্তেরও কিছু পরবর্ত্তী। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া কোনরূপেই প্রমাণিত হয় না। তবে এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন বটে যে, মৃচ্ছকটিকের "আর্য্যক" নামক পুরুষটী যিসুখৃষ্টের ছায়া হইতে প্রাপ্ত। যদি ওরূপ কথা কিছুমাত্র শ্রদ্ধার যোগ্য হইত, তাহা হইলে বিচার করা যাইত। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবরণ অথবা গ্রন্থাদি প্রণয়নের কাল নির্ণয় বাহিরের সহিত মিলাইতে গেলেই অধিক গোলযোগ হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরিক ঘটনামাত্র লইয়া তাহাদিগের পূর্ব্বপরতার নির্ণয়ে সকল স্থলে ততটা গোলযোগ হয় না।

মৃচ্ছকটিক এত প্রাচীন বলিয়াই ইহার রচনা এত সরল। ইহার ভাষায় অলঙ্কার পারিপাট্যের জন্য যত্নের আধিক্য নাই, এবং বর্ণিত বিষয়টী বুঝাইবার দিকে ইহার যত দৃষ্টি, বর্ণন-কৌশলের দিকে দৃষ্টি তত অধিক বোধ হয় না।

কিন্তু ভাষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি অধিক বোধ হয় না বলিয়াই যে, মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা-কৌশল-শূন্য তাহা নহে। একটু নিপুণ হইয়া দেখিলেই, উহাতে গূঢ় রচনাকৌশলের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অথচ সেই রচনাকৌশল এমন অতি সহজ ভাবে আসিয়াছে যে, একবারও কৌশল বলিয়া মনে হয় না।

নাটকটীর নান্দীভাগ লইয়াই দেখ। নান্দীতে দুইটী শ্লোক আছে। তাহার প্রথমটীতে দেবাদিদেব মহাদেবের পর্য্যঙ্কবন্ধ ভুজগবেষ্টনে দৃঢ়ীকৃত, তাঁহার ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ, আত্মমাত্র সাক্ষাৎকার, এবং স্থিরশূন্য দৃষ্টি বর্ণিত [১]; দ্বিতীয় শ্লোকটীতে সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবের ঘোর শ্যামবর্ণ কণ্ঠে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় মহাদেবী গৌরীর উজ্জ্বল গৌর ভুজ-লতার অবস্থান বর্ণিত [২]; প্রথম শ্লোকে মহাদেব শ্মশানবাসী, ধ্যান নিমগ্ন, সমাধিস্থ; জগৎ শূন্য, সংসার শূন্য। দ্বিতীয় শ্লোকে হরগৌরীরূপ একত্রে সম্মিলিত, জগৎ পূর্ণ, সংসার জাজ্বল্যমান। সমুদায় নাটকটীতেই ঐ দুই কথা। এক কথা, নায়কের দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্ব্ব-শূন্যত্ব; দ্বিতীয় কথা, তাঁহার প্রেমিকা প্রেয়সীর লাভ, এবং তৎসহ সমুদায় সাংসারিক সুখ প্রাপ্তি। অতএব মৃচ্ছকটিক নাটকের নান্দীতেই সমুদায় নাটকটীর বীজ নিহিত হইয়া আছে। উৎকৃষ্ট রচয়িতাদিগের লক্ষণই এই যে, তাঁহারা যাহা কিছু লেখেন তৎসমুদায় পরস্পর দৃঢ়সম্বন্ধ এবং সকল কথাতেই মুখ্য বিষয়ের অনুকূলতা সাধিত হয়।

নান্দীর পরে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনাটীও বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ। প্রস্তাবনার আরম্ভে নাটকরচয়িতার পরিচয়। রচয়িতার পরিচয় প্রদান করিবার রীতি প্রায় সকল নাটকেই প্রচলিত আছে। পরিচয়স্থলে রচয়িতার ভূয়সী প্রশংসা থাকে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রস্তাবনার

---

[১] পর্য্যঙ্কগ্রন্থিবন্ধ-দ্বিগুণিতভুজগাশ্লেষসংবীত জানো
রন্তঃ প্রাণাবরোধব্যুপরত-সকল-জ্ঞান-রুদ্ধেন্দ্রিয়স্য ;
আত্মন্যাত্মানমেব ব্যপগতকরণং পশ্যতস্তত্ত্ব দৃষ্ট্যা
শম্ভোর্ব্বঃপাতু শূন্যেক্ষণঘটিত-লয়-ব্রহ্মলগ্নঃ সমাধিঃ ॥

[২] পাতুবো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠশ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরী ভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে॥

ঐ ভাগ, নাটক-রচয়িতা স্বয়ং লেখেন না, তাঁহার শিষ্যাদি কেহ লিখিয়া দেন। এরূপ অনুমান যে অমূলক, তাহা ঐ পরিচয় ভাগের রচনা প্রণালীর সহিত অপরাপর ভাগের রচনা প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিলেই উপলব্ধ হয়। মৃচ্ছকটিকের ঐ পরিচয় ভাগে বলা হইল রচয়িতার নাম শূদ্রক, তিনি রাজা, এবং দ্বিজমুখ্যতম, ঋগ্‌বেদ এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গের শ্রেষ্ঠ, এবং হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে উন্মুখ; তিনি শত বর্ষ এবং দশ দিন আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে রাজ্যদানপূর্ব্বক চিতারোহণে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গ্রন্থরচয়িতার এবম্ভূত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বড়ই সন্দেহ জন্মে। ইনি নামে হইলেন শূদ্র, কাজে হইলেন সমরব্যসনী ক্ষিতিপাল এবং ব্যবহারে হইলেন তপোধন ব্রাহ্মণ। ইহাঁকে রাজা বলা হইল, অথচ কোথাকার রাজা এবং থাকিতেন কোথায়, তাহা বলা হইল না। এমন স্থলে যদি মনে করা যায় যে, গ্রন্থকারের এই শূদ্রক নামটাই কল্পিত, তাহা করিলে কি নিতান্ত কষ্ট কল্পনা করা হয়? আর্য্য গ্রন্থকারেরা বৈদিক সংস্কার বশতঃ আপনাদিগের নাম রূপ পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র লোকোপকার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাদি রচনা করিতে পারিতেন—নাম বাহির করিতে না পারিলে তাঁহাদের বুক ফাটিত না। তাহা ছাড়া আর একটা কথা আছে। আমাদিগের কোন গ্রন্থকার সমাজের বর্ণন করিব এরূপ স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা তাহা করিয়াছেন (৩)। তিনি বলি-

---

[৩] অবন্তি পুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য,
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।
তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবা শ্রয়ং,
নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাং।
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা,
চকার সর্ব্বং কিল শূদ্রকোনৃপঃ॥

য়াছেন তাৎকালিক "নয় প্রচার" "ব্যবহার দুষ্টতা" "খল স্বভাব" "ভবিতব্যতা" প্রভৃতি সমুদায় বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মৃচ্ছকটিক রচনা করিয়াছেন। সমাজ বর্ণনে প্রবৃত্ত গ্রন্থকর্ত্তৃগণ প্রায়ই স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া থাকেন। অতএব কোন নাটক রচয়িতা সমাজের বৃহত্তমভাগ যে শূদ্র জাতি তন্নামানুসারে স্বয়ং শূদ্রক নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক আপনাকেই ক্ষত্রিয় গুণ এবং ব্রাহ্মণ গুণ সমন্বিত এবং সমুদায় সমাজের প্রতিরূপ স্বরূপ দেশ সাধারণের রাজা বলিয়া বর্ণন পূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করিলেও করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে নিজ মৃত্যুবিবরণও সম্মুখে খ্যাপন করিতে পারিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্যও উল্লিখিত কল্পনার অবলম্বনে কিছু বিশদ হইতে পারে। শাস্ত্রে বলে মনুষ্যের পূর্ণ আয়ুষ্কাল শত বর্ষ; অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, এক একটি সমাজ-প্রতিরূপের বয়স এক শতবৎসর। আর মৃত্যুর পর দশ দিন যে অশৌচকাল সে পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির লোকান্তর গতি নাই—এক প্রকার ইহলোকেই স্থিতি; এই জন্য এক একটী সমাজ প্রতিরূপের অবস্থিতিকাল শত বর্ষ দশ দিন। সেই এক শত দশ দিনের পর দ্বিতীয় সমাজপ্রতিরূপ পূর্ব্বগত সমাজ প্রতিরূপের পুত্র স্বরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এই জন্য মৃচ্ছকটিক রচয়িতা—

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং
"লব্ধাচায়ুঃ শতাব্দং দশ দিন সহিতং
শূদ্রকোগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

---

(২)

মৃচ্ছকটিক রচয়িতা নান্দীর দুইটী শ্লোকে অভিনেয় বস্তুর সমস্ত বীজ নিহিত করিয়া এবং প্রস্তাবনার প্রারম্ভে আপনি যে সমাজের প্রতিভূ স্বরূপ হইয়াই তাহার একটী আদর্শ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যেন এইরূপ আভাস প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের এবং দ্রষ্টৃবর্গের

কৌতূহল উদ্দীপনপূর্ব্বক একটী গীতির সহিত প্রস্তাবনার দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গানটী এই—

শূন্যমপুত্রস্য গৃহং,
চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সন্মিত্রং।
মূর্থস্য দিশঃ শূন্যাঃ,
সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য॥

অপুত্রের গৃহ শূন্য, সন্মিত্র বিহীনের চিরশূন্য, মূর্থের দিক্ শূন্য; দরিদ্রের সকলই শূন্য।

নান্দীতে "শূন্যেক্ষণ" শব্দের প্রয়োগে যে বীজ নিহিত হইয়াছে, উল্লিখিত গানটীতে তাহার অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হইল। "সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য" এই কথাই নাটকের সকল কথার ধূয়া হইয়া রহিল, এবং নায়কের সর্ব্বশূন্যতা কি প্রকার বিশিষ্টরূপ তাহারও পরিচায়ক হইল। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত, তাঁহার "নিজ রূপ গুণের অনুরূপ" রোহ-সেন নামক পুত্র আছে, তাঁহার "সর্ব্বকাল মিত্র" মৈত্রেয় নামক একজন সুহৃদও আছেন, এবং তাঁহার গৃহ মধ্যে "পুস্তক সকল" থাকায় এবং অন্যান্য প্রকারেও তাঁহার বিদ্যাবত্তা সূচিত হইয়া আছে—তাঁহার নাই কেবল ধন, এবং ধন না থাকায় ঐ সকল থাকিতেও তাঁহার 'সকল শূন্য', —"সর্ব্বশূন্যং দরিদ্রস্য"।

সমাজ চিত্রণে যে দারিদ্র্যাবস্থার চিত্রণ অত্যাবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ সকল সমাজেই দারিদ্র্যের অতি বিপুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং কোন বস্তুর বৃহত্তম ভাগের অনুরূপ চিত্র না হইলে, সে চিত্র সে বস্তুরই হইতে পারে না।

কিন্তু দারিদ্র্যাবস্থা যদিও দয়াবৃত্তির উত্তেজিকা হয় বটে, তথাপি সকল স্থলে কবিসময়োচিত হইয়া উঠে না। যে দারিদ্র্য দশা, পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ভোগ হইয়া আইসে, যে দারিদ্র্যের প্রভাবে ধর্ম্মজ্ঞানের হিতাহিত বোধের স্ফুরণ হইতে পায় না, যে দারিদ্র্যযন্ত্রণা নিরন্তর সহ্য

করিতে করিতে শরীর এবং মন কঠিন হইয়া উঠে, দুঃখানুভূতিই যেন ন্যূন হইয়া পড়ে, মানুষ পশুবৎ হইয়া যায়—সেরূপ দারিদ্র্য দশার প্রকৃত বর্ণনায় মনুষ্য হৃদয়ের বিকাশ অতি অল্প হইয়া থাকে, এবং সহানুভূতির আকর্ষণও অধিক হইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যা, বিনয়, শীল, আভিজাত্য, দাতৃত্ব, পরোপকারিতা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্পন্ন কোন গৃহস্থের দারিদ্র্যদশা ঘটিলে, তিনি প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করেন, এবং সেই যন্ত্রণা কখন কিরূপে অনুভূত হয়, তাহাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন।

এই জন্য উচ্চ দ্বিজকুলসম্ভূত, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তির পুত্র, প্রাসাদবাসী, পরমাতিথেয়, জন্মভূমির উন্নতিসাধক, সাধারণের হিতার্থে সুবহু সরোবর, দেবভবন, উদ্যানাদির নির্ম্মাণ কর্ত্তা, এবং এবম্বিধ দানশৌণ্ডতা নিবন্ধন স্বয়ং বিত্তবিহীন এবং দুর্গত যে চারুদত্ত, তিনিই দারিদ্র্যাবস্থার কাব্যোচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া সমাজচিত্র করণে কৃতসঙ্কল্প মৃচ্ছকটিক রচয়িতার নাটকের নায়করূপে উপকল্পিত। এই জন্যই বোধ হয় উক্ত চারুদত্তের মুখ দিয়াই কবি একস্থলে উল্লিখিত ভাবটী এইরূপে ব্যক্ত করাইয়াছেন, যথা—

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে।
ঘনান্ধকারেম্বিব দীপদর্শনম্।
"সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং।
স জীবদীপান্মরণান্ধমাপ্নুতে॥

দুঃখভোগপূর্ব্বক যে সুখ তাহা গভীর অন্ধকারে দীপদর্শন স্বরূপ। সেইরূপ সুখের অবস্থা হইতে যে ব্যক্তি দুঃখের অবস্থায় পড়ে, সে জীবনের আলোক হইতে মৃত্যুরূপ অন্ধকারে পতিত হয়।

(৩)

"সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য" এই গীতিধ্রুব দ্বারা অতি বিস্পষ্টরূপে সূচিত মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত দারিদ্র্য দশাগ্রস্ত হইয়া কেমন মর্ম্মে মর্ম্মে এবং পদে পদে সেই দশার যন্ত্রণা সকল ভোগ করিতেছিলেন, তাহা সেই নায়কের রঙ্গভূমে প্রবেশ হইতেই প্রদর্শিত হইতে চলিল, এবং নায়ক যে সর্ব্বতোভাবেই আর্য্যভাবসমন্বিত তাহাও প্রথম হইতেই প্রদর্শিত হইল। তিনি সায়-সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গৃহদেবতাদিগের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিতেছেন এইরূপে দৃষ্ট হইলেন, এবং তৎকালে তাঁহার উক্তি হইল—

যাসাং বলিঃ সপদি মদ্‌গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্ব্বঃ।
তাস্বেব সম্প্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্কুরাসু,
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ॥

যে গৃহদ্বারের সম্মুখভাগে প্রদত্ত বলি হংস সারসাদি কর্তৃক সত্বর বিলুপ্ত হইত, এখন সেই গৃহাঙ্গনে জাত তৃণাঙ্কুর মধ্যে পতিত অঞ্জলি প্রমাণ বীজমাত্র বলি কীটগণের মুখভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে।

নায়কের চিরসুহৃদ মৈত্রেয় ঐরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া বলিলেন—"ভাই! তোমার দুঃখ কি, তুমি আত্মীয়স্বজনকে আপনার ধন দান করিয়া সুরপীতাবশিষ্ট প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় পরিক্ষয়েও শোভমান হইয়া আছ"। কি অপূর্ব্ব উপমা! ইহার মূল, বোধ হয়, কামন্দক নামক নীতি শাস্ত্র। মল্লিনাথধৃত ঐ শাস্ত্রে একটী কবিতায় উক্ত হইয়াছে—

ধর্ম্মার্থং ক্ষীণবিত্তস্য ক্ষীণত্বমপি শোভতে
সুরৈঃ পীতাবশেষস্য কৃষ্ণপক্ষে বিধোরিব।

সুহৃদ্ বাক্যের প্রত্যুত্তরে চারুদত্ত বলিলেন—

বয়স্য ন মমার্থান্ প্রতি দৈন্যং। পশ্য
এতত্তু মাং দহতি যদ্ গৃহমস্মদীয়ং!

ক্ষীণার্থমিত্যতিথয়ঃ পরিবর্জ্জয়ন্তি।
সংশুষ্কসান্দ্রমদলেখমিব ভ্রমন্তঃ
কালাত্যয়ে মধুকরাঃ করিণঃ কপোলং॥

বয়স্য! অর্থ গিয়াছে বলিয়া আমি দুঃখ করিতেছি না। যেমন ভ্রমরেরা মদক্ষরণ কাল গত হইলে হস্তীর শুষ্ক সান্দ্র কপোলদেশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ অর্থহীন হইয়াছি বলিয়া অতিথিরা যে আমাদিগের গৃহ বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই দুঃখেই পুড়িতেছি।

আর পূর্ব্বে অপরিচিত হঠাৎ আগন্তুক, এমন অতিথিরাই যে আমাদের বাটী বর্জন করিয়াছেন তাহাও নয়।

সত্যং ন মে বিভবনাশকৃতাস্তি চিন্তা,
ভাগ্যক্রমেণ হি ধনানি ভবন্তি যান্তি।
এতত্তু মাং দহতি নষ্টধনাশ্রয়স্য,
যৎ সৌহৃদাদপি জনাঃ শিথিলীভবন্তি॥

সত্যই, ধননাশ হইয়াছে বলিয়া চিন্তা করিতেছি না, ধন ভাগ্যে হয় ভাগ্যে যায়। আমার দুঃখ এই যে, ধনহীন হইলে সৌহার্দ্দ হইতেও লোকে শিথিল হইয়া পড়ে। আরও—

দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি, হ্রীপরিগতঃ, প্রভ্রশ্যতে তেজসো,
নিস্তেজাঃপরিভূয়তে, পরিভবান্নির্বেদমাপদ্যতে।
নির্ব্বিণ্ণঃ শুচমেতি, শোকপিহিতো, বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে,
নির্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদম্॥

দারিদ্র্য হইতে লজ্জা হয়, লজ্জাপরিগত ব্যক্তি তেজোভ্রষ্ট হয়, তেজোহীন ব্যক্তি পরিভব প্রাপ্ত হয়, পরিভব হইতে নির্বেদ উপস্থিত হয়, নির্ব্বিণ্ণ ব্যক্তি শোক পায়, শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তি হতবুদ্ধি হইয়া যায় হতবুদ্ধির ক্ষয় হয়; অতএব নির্ধনতা সকল আপদের আস্পদ।

নিবাসশ্চিন্তায়াঃ, পরপরিভবো বৈরমপরং,
জুগুপ্সা মিত্রাণাং স্বজনজনবিদ্বেষকরণং।

বনং গন্তুং বুদ্ধির্ভবতি চ কলত্রাৎ পরিভবো,
হৃদিস্থঃ শোকাগ্নির্ন চ দহতি সন্তাপয়তি চ ॥

দারিদ্র্য চিন্তার আস্পদ, দারিদ্র্য হইতে পর কর্ত্তৃক পরিভব প্রাপ্ত হইতে হয়। লোকে শত্রুতা করে, মিত্র ব্যক্তিরাও ঘৃণা করে, দরিদ্রতা হেতু আত্মীয় বন্ধুরাও বিদ্বেষ করিয়া থাকে, বনে যাইতে মতি হয়, ভার্য্যাও তিরস্কার করে। হৃদয়স্থ শোকাগ্নি ভস্ম করে না, কিন্তু পোড়াইতে থাকে।

উল্লিখিত কয়টী কবিতাতে আর্য্য নায়কের মনে দারিদ্র্যাবস্থায় যে সকল দুঃখ অতি প্রবল হইয়া উঠে, তাহাই বলা হইল—অনার্য্যের অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদির মনে স্বতঃই যে প্রথম এবং প্রবল অনুভব হয়, সে কথার নামগন্ধও এখানে নাই। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়িলে আপনি খাবে কি, এই প্রথম চিন্তা, তাহার পর স্ত্রী পুত্র খাবে কি, এই দ্বিতীয় চিন্তা; তাহার পর আপনাদের ভাল খাওয়া ভাল পরা ভাল থাকার কি হইবে, এই চিন্তা—কিন্তু আর্য্যনায়ক চারুদত্তের ও সকল চিন্তা নাই। অতিথি আইসে না, সুহৃজ্জনেরা শিথিলপ্রণয় হয়, লজ্জা, নিস্তেজস্বিতা, পরিভব, নির্ব্বেদ, শোক, বুদ্ধিভ্রষ্টতা প্রভৃতি দোষ দারিদ্র্য হইতে জন্মে, এই সকল চিন্তাই তাঁহার মনে অতি বলবতী।

কবি এইরূপ আপন নায়ককে প্রথম হইতেই উদাত্ত গুণে বিভূষিত করিয়া তাহার পর তাঁহাকে অতি বিস্পষ্ট আর একটী মুদ্রাঙ্কণে মুদ্রিত করিয়া তাঁহার আর্য্য ভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহার বয়স্য মৈত্রেয় বলিলেন —"দেবতাদিগের এরূপ পূজা করিয়াও যখন তোমার প্রতি তাঁহারা প্রসন্ন হয়েন নাই, তখন আর তাঁহাদের পূজার গুণ কি?" চারুদত্ত এই কথার উত্তরে বলিলেন,—

মা মৈবং, গৃহস্থস্য নিত্যোয়ং বিধিঃ।
তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ পূজিতা বলিকর্ম্মভিঃ।
তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈঃ ॥

তা নয়, গৃহস্থের এই নিত্য বিধি। তপস্যা, মন, বাক্য এবং বলি দ্বারা পূজিত হইয়া দেবতারা শান্তিমান ব্যক্তিদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই।

এই আর্য্য—এই প্রকৃত হিন্দু। পৃথিবীর অপর কোন নরকুলে আর এরূপ বিশুদ্ধ আচরণ শিক্ষিত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মে রত হয়, ধর্ম্ম-ফলাভিসন্ধিতে। হিন্দু বিনা ফলাভিসন্ধিতেই ধর্ম্মাচরণে শিক্ষিত। তিনি বিধি প্রতিপালনেরই কর্ত্তব্যতা জানেন। বিধি প্রতিপালন নিবন্ধন যে সুখপ্রাপ্তিরূপ শুভ ফল হইবে, তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে তিনি ভূয়োভূয়ঃ নিষিদ্ধ হইয়াছেন। চারুদত্তের চরিত্র এইরূপ শাস্ত্রশিক্ষার ফল।

---

(৪)

মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত দরিদ্র দশায় পতিত এবং আর্য্য শাস্ত্রের শিক্ষা গুণে সর্ব্বতোভাবে উদার-চেতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ইহা প্রদর্শিত হইলে রঙ্গভূমিতে নায়িকা বসন্তসেনার অবতরণ আরম্ভ হইল। এই নায়িকার চরিত্রে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য আছে। সেই বৈচিত্র্যটী সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে সমাজ চিত্রই পরিষ্কাররূপে বুঝিবার প্রয়োজন হয়; এবং তাহা হয় বলিয়াই সমাজ চিত্রাঙ্কনে কৃতসংকল্প মৃচ্ছকটিক-রচয়িতার তাদৃশ নায়িকা লইয়াই নাটক রচনা।

বসন্তসেনা একটী গণিকা। সে বহুল ধনশালিনী। তাহার বাটী আট মহল। সে বাটীর তোরণ-দ্বার অতি উচ্চ। বাটীর ভিতরে কত পুষ্পোদ্যান, দীর্ঘিকা, কত রত্নবেদী, কত রত্ন-স্তম্ভ, কত গোরু, হাতী, ঘোড়া, কত লোক জন, কত কত দাস দাসী, কত পড়ুয়া পণ্ডিত, কত গান বাদ্য, কত রঙ্গ রস। তাহার বাটীর বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শিল্প-নৈপুণ্যের, কলাবিদ্যানুশীলনের, এবং বিভব-শালিতার বিলক্ষণ আতিশয্য অনুভূত হয়। বসন্তসেনা যে উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেন, সেই নগরের

সর্ব্বপ্রধান শোভা বলিয়াই নাগরিকেরা তাঁহার উল্লেখ করিত। তিনি যেমন ধনবতী তেমনি মাননীয়াও ছিলেন।

গণিকার এরূপ গৌরব এবং সমাদর বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গ্রীকদিগের, রোমীয়দিগের এবং মিশরীয়দিগের মধ্যে অতি গৌরবান্বিতা এবং গুণান্বিতা গণিকাসকল ছিল, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এথেন্স নগরীর একটী গণিকার গৃহ হইতেই সর্ব্বপ্রধান রাজকার্য্যাদির মন্ত্রণা সকল বাহির হইত, আর একটী গণিকার গৃহে দার্শনিকপ্রবরেরা স্বয়ং গমন করিয়া তাহাদিগকে কলাবিদ্যাসকল শিক্ষা করাইতেন। কিন্তু শুদ্ধ পূর্ব্বকালেই যে ঐরূপ হইত, তাহা নহে। সকল কালেই এবং সকল দেশেই ঐরূপ বিবরণ কতকটা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন দার্শনিক তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকাগার এক জন গণিকার দান হইতে পাইলেন, কোন কবি এক জন গণিকার কৃপালাভে ধনাঢ্য হইয়া উঠিলেন, কোন রাজ নীতিবিশারদ এক জন গণিকার প্রিয়পাত্র হওয়াতেই কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় বহুবিধকুটিল রাজমন্ত্রণা উচ্ছেদ করিবার উপায় প্রাপ্ত হইলেন, নব্য ইউরোপীয় ইতিহাসেও এইরূপ কথার অভাব নাই।

তবে যে সামাজিক নিয়মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব বশতঃ ভারতবাসীদিগের সর্ব্ব বিষয়েই একটী বিশিষ্টতা জন্মিয়া আছে, মৃচ্ছকটিকের গণিকা নায়িকার প্রকৃতি বিচারেও সেই বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। ভারতবর্ষীয় সমাজে বর্ণভেদ প্রথার যেন একটী ছাঁচ জন্মিয়া গিয়াছে। এখানকার সকল ব্যবসায় ঐ ছাঁচে ঢালা হইয়া গঠিত হয়। এখানকার গণিকার ব্যবসায়ও একটা জাতি ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য। কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, কোন গণিকার কন্যা যদি মাতৃব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত, তবে রাজদ্বারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইতে পারিত। মৃচ্ছকটিকের নায়িকা বসন্তসেনা ঐ রূপ "কনেলী মাতা" (অর্থাৎ অনূঢ়াগর্ভজাত) এবং মাতৃব্যবসায়াবলম্বনে একান্ত

অনিচ্ছাবতী। তাদৃশ অনিচ্ছার প্রতিকারণ—নায়ক চারুদত্তের প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ। বসন্তসেনা সেই অনুরাগের বশীভূতা হইয়া সখীজনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ সময়ে ঐ চারুদত্তের কথাই কহে। স্বয়ং একাকিনী বসিয়া চারুদত্তের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির প্রতি নিরীক্ষণ করে। ঐ চিত্রলিপিখানি আপনার শয্যার উপর রাখিতে বলে, অনুক্ষণ চারুদত্তের প্রতি তন্মনস্ক ভাবে থাকে, চারুদত্তের ব্যবহৃত কোন বস্ত্র হস্তগত হইলে তাহা আপনার অঙ্গাবরণ করিয়া কৃতার্থ হয়, দূর হইতেও চারুদত্তকে দেখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হয়, চারুদত্তের শরীরসেবক কোন ভৃত্যের দর্শন পাইলেও তাহার সমূহ সমাদর এবং গৌরব করে, এবং মাতা কর্ত্তৃক পুরুষান্তর গ্রহণে আদিষ্ট হইলে বলে—"জই মং জীঅংতীং ইচ্ছসি তা এব্বং ন পুণের অহং অজ্জাত্ত অণবি দব্বা" (অর্থাৎ যদি আমাকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে মাতা কর্ত্তৃক যেন আর এরূপে অনুজ্ঞাতা না হই)।

গণিকা জাতীয়া এবং এরূপ অনুরাগসম্পন্না বসন্তসেনা দেখিতে কেমন ছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত স্বতঃ কৌতূহল জন্মে। তিনি যে বিশিষ্টরূপেই সৌন্দর্য্যসম্পন্না যুবতী, তাহা "বসন্তশোভেব" "দেবতোপস্থানযোগ্যা" ইত্যাদি বিশেষণ পদের দ্বারাই প্রকটিত হইয়াছে। তবে একটী কথা এই—ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং খাঁটি শূদ্র অপেক্ষা নানা প্রকার সংমিশ্র বর্ণের লোকই অধিক এবং সেই মিশ্র বর্ণের লোকদিগের মধ্যে শূদ্র বা অনার্য্য সম্বন্ধই অধিক। অতএব সম্ভবতঃ পূর্ব্ব কালের গণিকাজাতীয়াদিগের মধ্যে অধিকাংশই অনার্য্যশোণিত সম্বন্ধ ছিল। কবি যেন সেই কথাই কতকটা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয়। এক জন দাস (সুতরাং শূদ্র-জাতীয় ব্যক্তি) বসন্তসেনাকে অত্তিকা (অর্থাৎ দিদি) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। বসন্তসেনা উচ্চজাতীয়া হইলে তাঁহার প্রতি দাসের ঐরূপ সম্বোধন কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না। অপর এক স্থলে এক জন বসন্ত-

সেনাকে গালি দিয়া "নীনাসা" (নিম্ননাসা) বলিতেছে। "নিম্ন নাসা" বিশুদ্ধ আর্য্য স্ত্রী পুরুষের লক্ষণ নয়—যেখানে নিম্ন নাসা দেখা যায়—সেই স্থলেই অনার্য্য শোণিতের মিশ্রণ বুঝিতে হয়। অপর এক স্থলে বসন্তসেনাকে গাঢ়ান্ধকারে হারাইয়া বলা হইতেছে মসীরাশি মধ্যে যেন "অঞ্জি গুড়িয়া" (অঞ্জন গুটিকা) হারাইয়া গেল। এই কথায় বসন্তসেনার বর্ণটা গৌর না হইয়া কিছু কাল বলিয়াই বোধ হয়। কৃষ্ণবর্ণতাও অনার্য্য সংস্রবের স্পষ্ট লক্ষণ! অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, বসন্তসেনা "বিশাললোচনা" শ্যামাঙ্গী সুন্দরী।

বসন্তসেনা যে সমস্ত কলাবিদ্যায় বিদ্যাবতী, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি? তাঁহার স্বর-বৈচিত্রীকরণ ক্ষমতা, পদবিন্যাসাদির লঘুতা, সর্ব্বকার্য্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশিষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়া তাঁহার বাটী যে, সমস্ত কলাবিদ্যার আগারস্বরূপ, তাহা স্পষ্টরূপেই কথিত হইয়াছে।

বসন্তসেনা অন্যান্য সংস্কৃত নাটকাদির অত্যুৎকৃষ্ট নায়িকাদিগের ন্যায় সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন। তবে তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতা কিরূপ ছিল, তাহা কবি একটু বিশেষ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বড় পরিষ্কাররূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন। বসন্তসেনা কদাপি উচ্চ শ্রেণীর পাত্রদিগের নিকট সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে যান না। তিনি কলাবিদ্যার শিক্ষাদাতা বিটের সহিত সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন, আর বিদূষককেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে হয় তাহা সংস্কৃতে বলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বগত উক্তি গুলিও প্রাকৃত ভাষায় হয়, সংস্কৃতে হয় না। কবি এইরূপে দেখাইলেন যে, স্ত্রীলোককে বিদ্যা ফলাইতে দেখিলে ভদ্র লোকের যে অশ্রদ্ধা হয় বসন্তসেনা তাহা বুঝিতেন, এবং বসন্তসেনার সংস্কৃতজ্ঞতা এমন পাকা রকমেরও ছিল না যে, স্বয়ং সংস্কৃতে চিন্তা করিতে পারেন।

(৫)

মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত, উহার নায়িকা বসন্তসেনা। নাটকোল্লিখিত অপরাপর পাত্রদিগের মধ্যে সমূহ দোষ গুণে জড়িত অপর একটী বিশিষ্ট ব্যক্তির বর্ণন আছে। তাঁহার নাম শর্ব্বিলক। অন্যান্য নাটকাদিতে যে সকল কাজ দৈবশক্তি বা সম্যক্ অতি-মানুষশক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, মৃচ্ছকটিক নাটকে এই শর্ব্বিলকের দ্বারাই সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে। ইনিই রাজার কারাগৃহ হইতে ভাবী ভূপতিকে মুক্ত করিয়া দেন, ইনিই রাজবিদ্রোহের অধিনেতা এবং ইনিই পরিশেষে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পাদন করিয়া দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন সুসিদ্ধ করেন। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত তিনি যথার্থে হিন্দুর আদর্শ স্বরূপ। এরূপ লোককে আদর্শ জ্ঞান করিবার মানুষই এদেশে অধিক। ঐরূপ লোকের গঠন করাই আর্য্য শাস্ত্রের এবং আর্য্য শিক্ষার উদ্দেশ্য। চারুদত্তই আমাদিগের অলঙ্কার শাস্ত্র মতে ধীরোদাত্ত অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নায়ক। নাটককারও পদে পদে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার চারুদত্ত নিজ ঔদার্য্য "গুণশস্ত্রের" বলেই শস্ত্রধারীদিগের অপেক্ষাও বলীয়ান্, তিনি জনগণের "তৃষ্ণার অপনয়ন করিয়াই বিশুষ্ক হ্রদের ন্যায় নীরহীন", তিনি জনসাধারণের চক্ষে 'ভূদল মিঅংক্কা' (ভূতল মৃগাঙ্ক), তিনি নির্দ্ধন হইলেও 'ভৃত্যানুকম্পক' বলিয়া ভৃত্যদিগের প্রিয়, এবং তিনি স্বভাবতঃ এমনি সুশীতল যে, অপকারী ব্যক্তিরও অপকারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, "ন চন্দ্রা দো আদবো হোদি" (ন চন্দ্রাদাতপো ভবতি)।

কিন্তু শর্ব্বিলক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনিও ব্রাহ্মণ কুলপতির সন্তান, তিনিও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তিনিও দরিদ্র, এবং তিনিও একটি যুবতীর প্রণয় পাশে একান্ত সম্বদ্ধ। ঐ যুবতী বসন্তসেনারই একটী দাসী, তাহার নাম মদনিকা। সেই মদনিকার নিষ্ক্রয়সাধনপূর্ব্বক তাহাকে "অভূজিষ্যা" বা অনন্যভোগ্যা করিবার জন্য দরিদ্র শর্ব্বিলকের অর্থ

সংগ্রহ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার শারীরিক বলবীর্য্য যেরূপ তাহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা—

মার্জ্জারঃ ক্রমণে, মৃগঃ প্রসরণে, শ্যেনোগ্রহালুঞ্চনে,
সুপ্তাসুপ্ত-মনুষ্যবীর্য্যতুলনে শ্বা সর্পণে পন্নগঃ।
মায়ারূপশরীরবেশরচনে, বাগ্‌দেশভাষান্তরে।
দীপো রাত্রিষু সঙ্কটেষু ডুডুমো বাজীস্থলে, নৌর্জলে॥

আমি উৎক্রমণাদিতে মার্জ্জারের তুল্য অর্থাৎ আমার উঠা নামা প্রভৃতি নিঃশব্দে ; বেগগমনে হরিণের সমান ; গৃহীত বস্তুর আচ্ছিন্দনে আমি শিকারী পক্ষীর সদৃশ ; নিদ্রিত বা জাগরিত মনুষ্যের বীর্য্য পরীক্ষণে আমি কুকুরের সমান ; চলনে আমি সর্পবৎ (লক্ষ্যাতীত); নানা বেশ রচনা দ্বারা শরীরকে ছদ্ম করায় আমি সাক্ষাৎ মায়া, বিভিন্ন দেশীয় ভাষাজ্ঞতায় আমি সরস্বতী ; আমি রাত্রিকালে দীপ ; সঙ্কটপথে অশ্বতর ; সমভূমিতে অশ্ব ; জলে নৌকা।

অপিচঃ

ভূজগ ইব গতৌ, গিরিঃ স্থিরত্বে,
পতগপতেঃ পরিসর্পণে চ তুল্যঃ।
শশইব ভুবনাবলোকনেঽহং,
বৃকইব চ গ্রহণে বলে চ সিংহঃ॥

আমি গমনে সর্পের, স্থৈর্য্যে পর্ব্বতের, বেগে গরুড়ের তুল্য। সকল দিক দেখিয়া চলায় আমি শশ, গ্রহণে ব্যাঘ্র, বলে সিংহ।

এই রূপ সবল, সক্ষম, কর্ম্মঠ, বিক্রান্ত এবং সুঘটিত শরীর বিশিষ্ট দরিদ্র শর্ব্বিলকের অর্থ প্রয়োজন বোধ হওয়াতে তিনি অন্য কোন উপায় দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং এই দুষ্টবৃত্তির দোষ প্রচ্ছাদিত করিয়া বলিতেছেন।

কামং নীচমিদং বদন্তি পুরুষাঃ স্বপ্নেচ যদ্বর্দ্ধতে,
বিশ্বস্তেষু চ বঞ্চনাপরিভবশ্চৌর্য্যং ন শৌর্য্যং হি তৎ।

স্বাধীনা বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জলিঃ,
মার্গোহ্যেষ নরেন্দ্রসৌপ্তিকবধে পূর্ব্বংকৃতো দ্রৌণিনা ॥

লোকে ঘুমাইলে (অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে) এ কাজটাকে নীচ বলে বটে; কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি বঞ্চনা করা চৌর্য্য— কারণ তাহাতে শৌর্য্য নাই। পরন্তু লোকের নিন্দনীয় হইলেও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেবা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা এ কর্ম্ম স্বাধীন এবং শ্রেষ্ঠ। আর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সুপ্ত রাজাদিগের বধবিধানে এইরূপ কাজের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

সিংহ-বিক্রমশরীর, প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি, পরাধীন বৃত্তিপরাঙ্মুখ, স্বাভাবিক প্রখরা ইচ্ছাবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বাবলম্বিত চৌর্য্য ব্যবসায়ের উৎকর্ষ খ্যাপনপূর্ব্বক সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শর্ব্বিলক সাহসকার্য্যে রত হইয়াছেন। শর্ব্বিলকের সমান প্রকৃতির লোক পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ছিল। ইউরোপে পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে—বস্তুতঃ শর্ব্বিলককে ইউরোপীয় ছাঁচের মানুষ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ওরূপ প্রবল স্বৈরাচারের একান্ত বিরোধী আর্য্যশাস্ত্রের শিক্ষাপ্রভাবে ঐ প্রকার লোক এদেশে ক্রমেই ন্যূন হইয়া গিয়াছিল—চারুদত্ত প্রকৃতির লোকই বাড়িয়াছিল, এবং এখনও বাড়িয়া আছে। দেখ মৃচ্ছকটিক প্রণেতা চারুদত্ত এবং শর্ব্বিলক উভয়কে গঠন করিয়া নিজগ্রন্থে চারুদত্তেরই প্রধান স্থান কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শর্ব্বিলকের স্থান উচ্চ নয়। শর্ব্বিলক যে সাহসের কর্ম্ম করেন তাহা বলিয়াই গ্রন্থকার নিবৃত্ত হয়েন নাই। শর্ব্বিলক যে কোন প্রকার ধর্ম্মকথাই মানে না, যাহা কিছু তাহার ইচ্ছার গতিরোধ করে, তাহাই উল্লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত, নাটককার তাহাও পদে পদে দেখাইয়া দিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। শর্ব্বিলক চৌর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সন্ধিখনন করিতে করিতে পরিমাণসূত্র ভুলিয়া আসিয়াছে মনে হওয়াতে বলিল—

ধিকষ্টং প্রমাণসূত্রং মে বিস্মৃতং,বিচিন্ত্য—আং ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণ-সূত্রং ভবিষ্যতি; যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যং; বিশেষতো মদ্বিধস্য।

কি দুঃখ! পরিমাণসূত্র ভুলিয়া আসিয়াছি। চিন্তা করিয়া—হাঁ এই যজ্ঞোপবীতই প্রমাণসূত্র হউক; পৈতাটা ব্রাহ্মণদিগের, বিশেষতঃ আমার সদৃশ ব্রাহ্মণদিগের বড়ই উপকরণ-দ্রব্য।

অতএব পৈতা দিয়াই শর্ব্বিলক সিঁদ মোয়ান মাপিয়া লইলেন।

---

(৬)

মৃচ্ছকটিকের মুখ্যপাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্য্য। তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি শাস্ত্র শাসনের অধীনা। মৃচ্ছকটিকের গৌণপাত্র শর্ব্বিলক ইউরোপীয় ছাঁচের লোক। তিনি সক্ষম, পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণধী। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব বলবতী—ধর্ম্ম-শাসনের ততটা বশীভূতা নহে। এক কথায় চারুদত্ত সাত্ত্বিক, শর্ব্বিলক, রাজস পুরুষ। স্বৈর-স্বভাব ইউরোপীয়ের চক্ষে সত্ত্বগুণের আদর অল্প, রজোগুণের সমাদর অধিক। এক জন ইউরোপীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থ-কারের মতে মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির নহেন। উহার নায়ক অর্জ্জুন। সেইরূপ ইউরোপীয় আলঙ্কারিকের চক্ষে মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত না হইয়া শর্ব্বিলক হইলেই ভাল হইত। আজি কাল ইউরোপীয় শিক্ষা, ইউরোপীয় ভক্তি এবং ইউরোপীয় অনুকরণের দিন পড়িয়াছে। অতএব বোধ হয়, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এতদ্দেশীয় নব্যেরাও যদি মৃচ্ছকটিক পাঠ করেন, তবে তাহাদিগেরও মনে চারুদত্ত অপেক্ষা শর্ব্বিলককেই ভাল লা-গিবে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে এতদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়ে যে চিত্তা-দর্শের প্রভেদ জন্মিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথার উল্লেখ করা গেল। এই কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিলেই এখনকার নাটক নাটিকা, আখ্যায়িকাদি গ্রন্থে যে কি জন্য সত্ত্বগুণপ্রধান পাত্রদিগের অপেক্ষা

রজোগুণপ্রধান পাত্রদিগের অধিকতর গৌরব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহারও কারণ উপলব্ধ হইবে। কিন্তু এই যে পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে, তাহার প্রকৃতি কি? আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যেরা যে সকল গুণ এবং চরিত্রকে অপেক্ষাকৃত তুষ্ট এবং হেয় জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাহাই ভাল এবং আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে বই ত নয়। ইউরোপীয় শাস্ত্রে শিক্ষিতেরা যদি মনে করেন যে, তাঁহারা ঐ শিক্ষার প্রভাবে শৌর্য্য গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন, এই জন্য বলা আবশ্যক যে, শৌর্য্যগুণের মধ্যেও বিলক্ষণ ভেদ আছে। যে শৌর্য্যের মূলে যশোলিপ্সা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, অথবা আত্মগৌরব থাকে, সে শৌর্য্য এক প্রকারের, আর যাহার মূলে বিশুদ্ধ-ধর্ম্মজ্ঞান, সে শৌর্য্য আর এক প্রকারের। এই মৃচ্ছকটিকেই ঐ তুই প্রকার শৌর্য্যের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শর্ব্বিলকের শৌর্য্য প্রথম প্রকারের —উহা আত্ম-গৌরবমূলক এবং রজোগুণসম্ভূত। নাটকের যে অংশে শর্ব্বিলককে অতি প্রোজ্জ্বলরূপ দেখা যায়, সেই স্থানটী লইয়া বিচার করা যাইতেছে। শর্ব্বিলক মদনিকার নিষ্ক্রয় হেতু উহার চৌর্য্যলব্ধ অলঙ্কার মঞ্জুষা লইয়া বসন্তসেনার বাটীতে আসিয়াছে, এবং মদনিকাকে নিভৃতে বলিতেছে;

দারিদ্র্যেণাভিভূতেন ত্বৎ স্নেহানুগতেন চ।
অদ্য রাত্রৌ ময়া ভীরু! ত্বদর্থে সাহসং কৃতম্।

আমি দারিদ্র্যাভিভূত এবং তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত, তোমার জন্যই অদ্য রাত্রিতে সাহসের কর্ম্ম করিয়াছি।

মদ। সর্ব্বিলজ! ইথী কল্লবত্তস্স কারণে ণ উহঅংপি সংসএ বিণিকৃখিত্তং।

শর্ব্বিলক! তুমি একটা স্ত্রীস্বরূপ সামান্য বস্তুর নিমিত্ত তুইটীকে সংশয়ে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ।

শর্ব্বি। কিং কিং?

কি কি?

মদ। সরীরং চারিত্তংচ।

শরীর এবং চরিত্র।

শর্ব্বি। অপণ্ডিতে! সাহসে শ্রীঃ প্রতিবসতি।
অপণ্ডিতে! সাহসে লক্ষ্মীর বাস।

মদ। সর্ব্বিলঅ! অখণ্ডিত চারিত্তাসি; তাণ হু দে মম কারণাদেব
সাহসং করন্তেন অচ্চংত বিরুদ্ধং আচরিদং।

শর্ব্বিলক। তোমার চরিত্র অখণ্ডিত আছে—আমার জন্য সাহস কর্ম্ম করায় অতি বিরুদ্ধ আচরণ করা হয় নাই?

শর্ব্বি। নোমুষ্ণ্যাম্যবলাং বিভূষণবতীংফুল্লামিবাহং লতাম্।
বিপ্রস্বং নহরামি কাঞ্চনমথো যজ্ঞার্থমভ্যুদ্ধৃতং॥
ধাত্র্যুৎসঙ্গগতং হরামি ন তথা বালং ধনার্থী কচিৎ,
কার্য্যাকার্য্যবিচারিণীমম মতিশ্চৌর্য্যেঽপি নিত্যং স্থিতা।

পুষ্পবতী লতার ন্যায় বিভূষিতা কোন অবলার ধন চুরি করি নাই—যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত বিপ্রসঞ্চিত স্বর্ণ হরণ করি নাই—ধনার্থী হইয়া ধাত্রীক্রোড়স্থিত বালককে অপহরণ করিয়া লই নাই—চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও আমার বুদ্ধি কার্য্যাকার্য্য বিচার বিষয়ে সুস্থিরাই থাকে।

অপর এক স্থলেও শর্ব্বিলক বলিয়াছেন—"ভীতে সুপ্তে ন শর্ব্বিলকং প্রহরতি" (ভীত এবং নিদ্রিত ব্যক্তিকে শর্ব্বিলক আঘাত করেন না)।

শর্ব্বিলকের আরও শূর-লক্ষণ আছে। কর্ত্তব্যাবধারণে তাঁহার বিলম্ব হয় না। যেমন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়মিত্র "আর্য্যক" রাজা "পালক" কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন, অমনি সদ্যঃপ্রাপ্তা "মদনিকা"কে ছাড়িয়া প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারার্থ গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন—

কথং রাজ্ঞা পালকেন প্রিয়সুহৃদার্য্যকো মে বদ্ধঃ। কলত্রবাং শ্চাস্মি সংবৃত্তঃ।
আঃ কষ্টম্। অথবা
দ্বয়মিদমতীব লোকে প্রিয়ঃ নরাণাং সুহৃচ্চ বনিতা চ।
সম্প্রতি তু সুন্দরীণাং শতাদপি সুহৃদ্বিশিষ্টতমঃ॥

কি! রাজা পালক কর্ত্তৃক আমার প্রিয় সুহৃদ আর্য্যক বদ্ধ হইয়াছেন, আর আমি এই সময়ে কলত্রবান্ হইলাম! কি দুঃখ! অথবা ইহলোকে

মনুষ্যের প্রিয় দুইটী, সুহৃদ্ আর বনিতা। সম্প্রতি শতসুন্দরীর অপেক্ষা সুহৃদ্ বিশিষ্টতম।

শর্ব্বিলকের আরও শূর-লক্ষণ তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে উপলব্ধ হয়। তিনি আর্য্যককে কারামুক্ত করিবার উপায় ক্ষণমাত্রে স্থিরকরিয়া কহিলেন—

অহমিদানীম্
জ্ঞাতীন্ বিটান্ স্বভুজবিক্রমলব্ধবর্ণান্
রাজাপমানকুপিতাংশ্চ নরেন্দ্রভৃত্যান্।
উত্তেজয়ামি সুহৃদঃ পরিমোক্ষণায়,
যৌগন্ধরায়ণ ইবোদয়নস্য রাজ্ঞঃ॥

আমি এক্ষণে জ্ঞাতিগণকে, বিটদিগকে, স্ব স্ব ভুজাবিক্রম দ্বারা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আর কৃতাপমান কুপিত রাজভৃত্যদিগকে সুহৃদের মুক্তিসাধন করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিব, যেমন উদয়ন রাজার জন্য যৌগন্ধরায়ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অন্যের উত্তেজনা ত পরের কথা। সম্প্রতি শর্ব্বিলক স্বয়ংই আর্য্যককে কারামুক্ত করিতে চলিলেন। ইহাই ত যথার্থ সৌহার্দ্দ।

প্রিয়সুহৃদমকারণে গৃহীতং রিপুভিরসাধুভিরাহিতাত্মশঙ্কৈঃ।
সরভসমভিপত্য মোচয়ামি, স্থিতমিব রাহুমুখে শশাঙ্কবিম্বম্॥

অসাধু রিপুবর্গ মনে মনে ভীত হইয়া বিনা দোষে প্রিয় সুহৃদকে বন্দী করিয়াছে। আমি সত্বরেই যাইয়া যেমন রাহুগ্রাস হইতে শশাঙ্ক মুক্ত হয়েন সেইরূপে তাঁহাকে মুক্ত করি।

শর্ব্বিলক যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। তাঁহাকর্ত্তৃক আর্য্যকের দল পুষ্ট হইল। পরিশেষে যজ্ঞাগারে রাজা পালক তৎকর্ত্তৃক হত, এবং আর্য্যক রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। শর্ব্বিলক বলিতেছেন—

হত্বা তং কুনৃপমহং হি পালকং ভো
স্তদ্রাজ্যে দ্রুতমভিষিচ্য চার্য্যকং তম্।

তস্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় শেষভূতাং
মোক্ষেঽহং ব্যসনগতঞ্চ চারুদত্তং॥

আমি সেই দুষ্ট নরপতি পালককে বধ করিয়া এবং তাহার রাজ্যে আর্য্যকের অভিষেক করিয়া তাঁহার শেষ আজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিব।

কিন্তু বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিবার জন্যও তাঁহার সমীপস্থ হইতে শর্ব্বিলকের মনে ভয় হইতেছে। তিনি বলিলেন—

তৎকৃতমহাপাতকঃ কথমিবৈনমুপসর্পয়ামি
অথবা, সর্ব্বত্রার্জ্জবং শোভতে।

ইহাঁর বাটীতে চুরি করিয়া আমি মহাপাতক করিয়াছি। কেমন করিয়া নিকটে যাইব। অথবা সর্ব্বত্র সরলতাই শোভনীয়।

---

(৭)

মৃচ্ছকটিক রচয়িতা তাঁহার নাটকের গৌণপাত্র শর্ব্বিলকের বীর্য্যশালিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি অত্যুচ্চ গুণাবলী প্রদর্শন করত তিনি রাজস-প্রকৃতিক, অতএব নিজ ইচ্ছাবৃত্তির একান্ত অধীন, এবং পরিশেষে সত্ত্বগুণপ্রধান চারুদত্তের সমীপে লজ্জান্বিত। ইহা দেখাইয়া সত্ত্বগুণেরই যে সম্যক্ প্রাধান্য, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নহে। মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা যে সাত্ত্বিক শৌর্য্যগুণেরই বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাও চারুদত্তের চরিত্র সংঘটন প্রণালীতে দেখাইয়াছেন। চারুদত্তও বীরপুরুষ। তবে তাঁহার বীরতা বলবিক্রম প্রকাশে অথবা সুহৃদের কারামোচনে কিম্বা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটনে পর্য্যবসিত হয় না। তাঁহার শৌর্য্য কিরূপ, এবং আর্য্য হিন্দুর শৌর্য্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নাটক হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) রাজার শ্যালক অতি দুষ্ট এবং গর্ব্বিত এবং রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র। সে চারুদত্তকে কোন অকার্য্য করিবার নিমিত্ত আদেশ

করিয়া বলিয়া পাঠাইল, যদি এই কাজটী কর, তবে ভাল, নচেৎ আমি তোমার চিরশত্রু হইব। চারুদত্ত এই কথার উত্তরে অধিক কিছুই বলিলেন না। ধৃষ্টতার প্রতি প্রযোজ্য উপেক্ষা মাত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন—"মূর্খঃ সঃ" (সেটা মূর্খ)।

(২) বড় একটা বিপদের সময় কোন বন্ধু তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে তিনি ঘৃণাপূর্ব্বক বলিলেন—

অহমিদানীমনৃতমভিধাস্যে ?
ভৈক্ষ্যেণাপ্যর্জ্জয়িষ্যামি পুনর্ন্যাস প্রতিক্রিয়াম্।
অনৃতং নাভিধাস্যামি চারিত্রধ্বংসকারণং।

কি! আজি আমি মিছা কথা বলিব? বরং ভিক্ষা করিয়া ন্যস্ত ধন প্রত্যর্পণের উপায় করিব, তথাপি চরিত্রদূষণ অনৃত বাক্য বলিব না।

(৩) রাজ-দৌরাত্ম্যে প্রপীড়িত, অপরিচিত পূর্ব্ব আর্য্যক তাঁহার গাড়ি চড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলিল—

শরণাগতো গোপালপ্রকৃতিরার্য্যকোঽস্মি।

আমি গোপালজাতীয় আর্য্যক, আপনার শরণাগত।

চারু। কিং ঘোষাদানীয় যোঽসৌ রাজ্ঞা পালকেন বদ্ধঃ ?

কি! পল্লীগ্রাম হইতে আনিয়া যাহাকে রাজা পালক বদ্ধ করিয়াছেন সেই ?

আর্য্য। অথ কিং (হাঁ, সেই)।

চারু। বিধিনৈবোপনীতস্ত্বং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অপি প্রাণানহং জহ্যাং ন তু ত্বাং শরণাগতং॥

বিধাতা কর্ত্তৃকই তুমি উপনীত হইয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইলে, আমি বরং প্রাণ ত্যাগ করিব, তথাপি শরণাগত তোমাকে ত্যাগ করিব না।

(৪) এই ব্যাপারের পর হইতে রাজার শ্যালক যে চিরশত্রুতার ভয় দেখাইয়াছিল, সেই শত্রুতার কার্য্যারম্ভ হইল। সে স্বয়ং বসন্তসেনা কর্ত্তৃক ঘৃণিত এবং প্রত্যাহত হইয়া তাহার গলা টিপিয়া মৃতপ্রায় করিয়া

রাখিয়া গেল। এবং সে মরিয়াছে মনে করিয়া চারুদত্তই অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে মারিয়াছে এই কথা ব্যক্ত করিল। আদালতে চারুদত্তের বিচার হইল। আনুসঙ্গিক প্রমাণের বলে তিনি দোষী সাব্যস্থ হইলেন। রাজা তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। চারুদত্ত বলিতেছেন—

অহো! অবিমৃশ্যকারী রাজা পালকঃ।

অথবা

ঈদৃশে ব্যবহারাগ্নৌ মন্ত্রিভিঃ পরিপাচিতাঃ।
স্থানে খলু মহীপালা গচ্ছন্তি কৃপণাং দশাং॥

হায়! রাজা পালকের কি অপরিণামদর্শিতা। অথবা দুষ্টমন্ত্রিগণ কর্তৃক এইরূপ ব্যবহারাগ্নিতে পাচিত হইয়া রাজারা বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

(৫) তাহার পর রাজদণ্ডের বিবরণ ঘোষণা করিতে করিতে যখন বধ্যভূমিতে লইয়া যায় তখন একজন তাঁহাকে নির্দোষী বলিতেছেন, ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—

ভোঃ! শ্রুতং ভবদ্ভিঃ

ন ভীতোমরণাদস্মি, কেবলং দূষিতং যশঃ
বিশুদ্ধস্যহি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমো ভবেৎ॥

আপনারা শুনিলেন, আমি মরিতে ভীত নই, আমার যশ দূষিত হইয়াছিল এই দুঃখ। যদি যশ বিশোধিত হইল, তবে এই মৃত্যুও পুত্রজন্মের সমান আনন্দকর হইল।

(৬) কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথা রহিল না। রাজ শ্যালকের চাতুর্য্যে সেই ব্যক্তির কথা অবিশ্বাস্য হইয়া গেল। অতএব চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে লইয়াই উপস্থিত করিল। তখন তিনি বলিলেন—

প্রাপ্যৈতদ্ব্যসনমহার্ণব-প্রপাতং
ন ত্রাসো ন চ মনসোঽস্তি মে বিষাদঃ॥

একো মাং দহতি জনাপবাদবহ্নি।
র্বদ্ধব্যং যদিহ ময়া হতা প্রিয়েতি॥

এই দুঃখ মহার্ণবের প্রপাতে উপস্থিত হইয়া আমার ভয় অথবা মরণের বিষাদ হইতেছে না। কেবল এক জনাপবাদ বহ্নি আমাকে দহন করিতেছে, আমি প্রিয়াকে হনন করিয়াছি।

(৯) সেই প্রিয়া বসন্তসেনাকে স্মরণ করিয়া চারুদত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছেন—

প্রভবতি যদি ধর্ম্মো দূষিতস্যাপি মেহদ্য,
প্রবলপুরুষবাক্যৈর্ভাগ্যদোষাৎ কথঞ্চিৎ।
সুরপতিভবনস্থা যত্র তত্র স্থিতা বা;
ব্যপনয়তু কলঙ্কং স্ব স্বভাবেন সৈব॥

আমি প্রবল পুরুষদিগের বাক্যে এবং নিজ ভাগ্যদোষে যদিও আজি দূষিত হইলাম, তথাপি যদি আবার ধর্ম্মের প্রভাব হয়, তবে সুরপতি ভবন হইতেই হউক, আর যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থান হইতেই হউক, সে নিজ স্বভাবগুণেই আমার এই কলঙ্কের অপনোদন করিবে।

(৮) ইহার পর শর্ব্বিলক এবং তাঁহার সহকারিবর্গ যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহার প্রভাবে চারুদত্তের নিষ্কৃতি হইল, এব তাঁহার মাহাত্ম্য বাড়িল। মৃত রাজার শ্যালক বন্দীকৃত হইয়া চারুদত্তের সমক্ষে আনীত হইল। সেই সময়ে ঐ রাজ শ্যালকের সম্বন্ধে চারুদত্তের সহিত শর্ব্বিলকের যে কথোপকথন হয়, তাহা শ্রবণ যোগ্য।

শর্ব্বি। আর্য্য চারুদত্ত! আজ্ঞাপ্যতাং কিমস্য পাপস্যানুষ্ঠীয়তাং।
আর্য্য চারুদত্ত! আজ্ঞা করুন, এই পাপের সম্বন্ধে কি করা যাইবে?
চারু। কিম্ অহং যদ্ ব্রবীমি তৎ ক্রিয়তে?
কি, আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে?
শর্ব্বি। কোঽত্র সন্দেহঃ?
তাহাতে সন্দেহ কি?

চারু। সত্যম্ ? (সত্য ?)

শর্ব্বি। সত্যম্ ? (সত্য।)

চারু। যদ্যেবং শীঘ্রময়ম্—(যদি তাহাই হয় তবে ইহাকে—)

শর্ব্বি। কিং হন্যতাম্ ? (কি মারিয়া ফেলিব ?)

চারু। নহি নহি মুচ্যতাম্। (না না, ছাড়িয়া দাও।)

শর্ব্বি। কি মর্থম্ ? (কি জন্য ?)

চারু। শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ শস্ত্রেণ ন হন্তব্যঃ।

যে শত্রু অপরাধ করিয়া শরণাগত হইয়া পায়ে পড়ে, তাহাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করিতে নাই।

শর্ব্বি। এবং তর্হি শ্বভিঃ খাদ্যতাম্।

তবে তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতে হয় ?

চারু। নহি, উপাকরহতস্তু কর্ত্তব্যঃ।

না, তাহাকে উপকার-হত (অর্থাৎ উপকার দ্বারা তাহার শত্রুতা হত) করিতে হয়।

শর্ব্বি। অহো আশ্চর্য্যম্ ! কিং করোমি বদত্বার্য্য।

অহো আশ্চর্য্য ! আর্য্য আমাকে বলুন কি করিব।

চারু। তন্মুচ্যতাম্। (ছেড়ে দাও।)

আর্য্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্ম্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, মরণে নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ন, ধর্ম্ম-প্রভাবে বিশ্বাস, এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা, এই সাত্ত্বিক ধীরতা। এই ধীরতার প্রকৃতি আর কোন জাতি এমত সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

---

(৮)

মৃচ্ছকটিক নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান দুই জনের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সাত্ত্বিক এবং রাজস, হিন্দু আর্য্য এবং ইউরোপীয় আর্য্য, এতদুভয়ের মধ্যে যে চিত্তাদর্শ সম্বন্ধীয় মৌলিক ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউরোপীয় পুরুষ সাহস, নির্ভীকতা এবং স্বৈরাচারকে বীরস্বভাবের প্রধান উপকরণ মনে করেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবীরই বীর। সংস্কৃত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার গৌরব করিয়াও উহাদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই মনে করেন। তাঁহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে, দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, ক্ষমাবীর, ধৈর্য্যবীর প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়—যুদ্ধবীর সকলের পশ্চাত্তাপে আইসেন।

সমালোচ্য মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের সাত্ত্বিক ঐতিহাসিক লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠ করিয়া এই বোধ জন্মে যে, জনগণের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ হইলেই তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিদ্বেষ করে। কিন্তু সকল দেশেই ঐ বিদ্বেষ সমানরূপে প্রখর হয় না। ইউরোপীয়েরা রজোগুণপ্রধান। তাহারা কামক্রোধের একান্ত বশীভূত। আবার তাহাতে পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করা তাহাদের শাস্ত্রানুমোদিত। ভারতবর্ষীয়েরা ব্রাহ্মণদিগের সাত্ত্বিক শিক্ষার গুণে চিরকাল রিপুদমনে প্রবণ এবং পরামার্থদৃষ্টি। তাহাদিগের শাস্ত্রেও ভেদ জ্ঞানের ভূয়সী নিন্দা ও অভেদ জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা। এই সকল কারণে এ দেশে মতভেদ হইলেই ইউরোপের ন্যায় পরস্পর পীড়ন, নির্য্যাতন, মারামারি, কাটাকাটী প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারের সূচনা হয় না।

আমাদের ইংরাজীশিক্ষিত নব্যেরা অনেকেই মনে করেন যে, যখন বৌদ্ধ মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন সনাতন হিন্দুমতাবলম্বীরা বৌদ্ধদিগের যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইবার কারণ এই যে, ইউরোপে যখন প্রটেষ্টাণ্ট মতের সূত্রপাত হয়, তখন রোমান কাথলিকেরা ঐ নূতন মতাবলম্বীদিগের প্রতি অনেক

অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করেন, বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রটেষ্টাণ্ট স্থানীয়, আর সনাতন মতাবলম্বীরা যেন কাথলিকদিগের স্থানীয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহাদিগের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য নাই। এই মৃচ্ছকটিক নাটকেই দেখা যায় যে, হিন্দু এবং বৌদ্ধ পরস্পর অবিরোধেই একত্রে বাস করিত, কোন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত হইলে ঘৃণা অথবা বিদ্বেষের ভাজন হইতেন না, এবং হিন্দু রাজারাও বৌদ্ধদিগের মঠধারী প্রভৃতির নিয়োগ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মশালা সকলের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নপর হইতেন। হিন্দুরাজারা বৌদ্ধ বিহারাদির রক্ষা করায় অধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। তাঁহাদের সাত্বিক চক্ষে ধর্ম্মালয়মাত্রেই লোকোপকারক এবং রক্ষণীয়।

সর্ব্বেশ্বরমতবাদ হইতে পরধর্ম্মবিদ্বেষ কখনই স্বতঃ উত্থিত হয় না। ভারতবর্ষে জাল্মস্বভাব এবং একেশ্বরবাদী মুসলমানেরাই আসিয়া ধর্ম্ম বিদ্বেষের আগুন ক্রমে ছড়াইয়া দেয়। তাহারাই মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করে এবং তাহাদেরই দেখাদেখি, শিখেরা যখন প্রবল হইয়াছিল, তখন কোথাও কোথাও মসজিদ ভাঙ্গিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজারা বৌদ্ধ ধর্ম্মশালা সকল ভগ্ন করিতেন না, এবং বৌদ্ধ রাজারাও হিন্দু ধর্ম্মশালা সকল নষ্ট করিতেন না। ইহাঁরা শুদ্ধ পরস্পরের ধর্ম্মশালা নষ্ট করিতেন না এমত নহে, পরস্পরের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলাই ইহাঁরা আপনাপন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন। যে ঔদাসীন্যের গূঢ় কারণ বিদ্বেষ, সেরূপ ঔদাসীন্যকেও সাত্বিকস্বভাব ভারতবর্ষীয় রাজগণ আপনাদিগের হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই। রাজ সাহায্য ব্যতিরেকে যেরূপে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী অনেক মন্দির, মসজিদ, হর্ম্ম্যাদি বিনাশ পাইয়াছে এবং আজও কতক পাইতেছে হিন্দুর বা বৌদ্ধের আমলে সেরূপ পূর্ব্ব কীর্ত্তি রক্ষণে উদাসীন্য ছিল না।

সম্পূর্ণ

বিবিধ প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় ভাগ।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

চুঁচুড়া

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

গ্রন্থের আভাস।

—•()•—

এডুকেশন গেজেটে ও শিক্ষা দর্পণে পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক সমালোচনা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। অপর প্রবন্ধের কিছু এই দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইল। পুরাবৃত্তসারের প্রথমাংশও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বলিয়া ইহারই প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা গেল। সামাজিক প্রবন্ধ ছাপা হইবার অনেক পূর্ব্বে সমাজসম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কিন্তু কোথাও ছাপান নাই। উহা তাঁহার দেহত্যাগের পর এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। ঐ প্রবন্ধগুলির সহিত সামাজিক প্রবন্ধে প্রকাশিত অনেক বিষয়ের মিল আছে বটে কিন্তু কোন কোন বিষয় একটু বিশদভাবেও বর্ণিত থাকায় সে প্রবন্ধগুলিরও কতক ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনায় যাহা একসময়ে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র, সাধারণে প্রকাশ করিবার উপযোগী করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাতে তন্ত্রের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ এবং উহার সভক্তিক অনুশীলন সম্বন্ধে সাহায্য হইতে পারে মনে করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইল।

ফাল্গুন ১৩১১। প্রকাশক।

সূচীপত্র।

—*—

প্রথম অধ্যায়।

পুরাবৃত্তের কথা—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—*—

বিবিধপ্রবন্ধ ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায় ।

মনুষ্য সৃষ্টি, সত্যযুগ এবং জলপ্লাবন বিবরণ ।

কোন ব্যক্তিই কখন স্বয়ং নিজ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন না। পিতৃমাতৃসন্নিধানে তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত না হইলে, আমরা কে কত দিন জন্মিয়াছি, আর এখনই বা আমাদের বয়স কত হইয়াছে, তাহা কিছুই বলিতে পারিতাম না। ইহাতেই বোধ হইবে যে, মনুষ্যজাতির আদিম সৃষ্টির বিবরণ কখনই কোন মনুষ্যকর্তৃক প্রকাশিত হইবার নহে। মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং কোনরূপে না বলিয়া দিলে তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারা যায় না।

এই হেতু সর্ব্বজাতীয় লোকেই সৃষ্টি বিবরণ বিষয়ে যাহা কিছু বলেন, তাহা প্রায়ই আপনাদের ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রকেই মূল করিয়া কহিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ইউরোপীয় যাজকেরা কহেন যে, জগৎকর্ত্তা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া তাহার কিয়ৎকাল পরে একটী মনুষ্য দম্পতীর উৎপাদন করেন। কাহার কাহার মতে এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হয়।

উক্ত মানবদম্পতীর মধ্যে যে পুরুষ জন্মে, তাঁহার নাম 'আদম' এবং তাঁহার পত্নীর নাম 'ইব'। ইহাঁরা প্রথমে অতি রমণীয় কোন উদ্যানে

নিবাস করিতেন। তখন রোগ শোক কিছুই জানিতেন না। পরে পাপাসক্ত হইয়া জগৎপাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে উহাদিগকে মর্ত্তলোকের দুঃখদায়ক যাবৎ নিয়মের অধীন হইতে হয়।

ফলতঃ প্রাচীন জাতিমাত্রেই স্ব স্ব জাতীয় আদিম অবস্থার বর্ণনাকালে সেই অবস্থাকে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণশাস্ত্রে যে প্রকার সত্যযুগের কথা আছে, সকল জাতীয় লোকের মধ্যেই ঐ প্রকার একটি সময়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। 'গ্রীক' জাতীয়েরা ইহাকেই 'সুবর্ণকাল' কহিয়াছেন, এবং খৃষ্টীয় বাইবেল ও মহম্মদীয় কোরাণের মতে উহাই আদম এবং ইবের 'ইডন্' উদ্যানে নিবাসের সময়।

ফলতঃ সত্যকাল মানবজাতির শৈশবাবস্থা। যেমন কৌমার কালের কোন কথা স্পষ্টরূপে অথবা আনুপূর্ব্বিক মনে আইসে না, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী অতি প্রধান প্রধান ঘটনা স্বপ্নবৎ স্মৃতি-পথারূঢ় হয়, সেই রূপ ঐ সত্যযুগের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও দুর্ব্বোধ অদ্ভুত ব্যাপার সম্মিলিষ্ট দুই একটী বোধগম্য বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জলপ্লাবনবিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে, কোন সময়ে দুর্বৃত্ত অসুর সকল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার সমুদায় অত্যন্ত দুষ্ট হওয়াতে ধরা সেই পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব জগৎকর্ত্তা ঐ ভারাবতরণের অভিপ্রায়ে পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণীকে একোদ্যমে বিনাশ করিয়াছিলেন।

এই বিষয়ে প্রধান প্রধান কতিপয় প্রাচীন জাতীয় লোকের যেরূপ বিশ্বাস, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আমাদিগের পুরাণে কথিত আছে, ভগবান্ মৎস্যাবতার হইয়া বৈবস্বত মনুকে একখানি সুবৃহৎ বহিত্র নির্ম্মাণের আদেশ করেন। পরে উক্ত মহাত্মা সর্ব্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী আর সাত জন সুবিখ্যাত ঋষি সমভিব্যাহারে সেই বহিত্রে আরোহণ করিলে পৃথিবী প্রলয়জলে প্লাবিতা হইলেন।

প্রাচীন 'কাল্ডীয়' জাতির ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, আদিম মনুষ্যের দশম পুরুষের সময় জলপ্লাবন হয়। সেই সময়ে 'যিসুথ্রুস্' নামক কোন ধর্ম্মাত্মা তদ্দেশে রাজ্য করিতেন। তিনি মীন-নরাকার 'ওয়ানে' নামা কোন দেবতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া একখানি অতি বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করেন। পরে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার জীবের এক এক দম্পতী সমভিব্যাহারে সবান্ধবে ঐ পোতারূঢ় হইলে পৃথিবী প্লাবিতা হয়েন।

'মিসরীয়দিগের' মধ্যেও জলপ্লাবনের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের মতে 'অসিরিস্' নামা কোন ব্যক্তি রক্ষা পায়েন।

'সাইরিয়া' দেশবাসীরা বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের দেশে একটী গুহা দেখাইয়া কহিত "এই গুহা দিয়া জলপ্লাবনের জল পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" ইহাতেই বোধ হয় সাইরিয়াবাসী লোকেরাও জলপ্লাবনে বিশ্বাস করিত।

'চীনীয়' জাতি অতি প্রাচীন। উহাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এক সময়ে চীন দেশে এক মহাজলপ্লাবন হইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হইতে কেবল 'পয়ান্‌সু' নামক এক ব্যক্তি সপরিবারে রক্ষা পায়েন—আর সকলেই জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু চীনীয়েরা ঐ জলপ্লাবন যে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছিল, এমত বলে না।

'গ্রীক্' জাতীয়েরা দুইটী জলপ্লাবনের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তদুভয়ই বিশেষ বিশেষ দেশব্যাপক হইয়াছিল—ঐ জলপ্লাবনের দ্বারা সমুদয় ভূমণ্ডল একবারে প্লাবিত হইয়াছিল, এমত কথার প্রসঙ্গ নাই। ঐ দুই জলপ্লাবনের, প্রথমটী হইতে 'ওগাইইজেস্' এবং দ্বিতীয়টী হইতে 'ডিউকেলিয়ন্' এই দুই ব্যক্তি মাত্র রক্ষা পায়েন।

'ফিনিকীয়' নামে আর একটী অতি প্রাচীন জাতির পুরাতন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু সেই ইতিহাসে জলপ্লাবনের কোন কথারই উল্লেখ নাই।

খৃষ্টানদিগের বাইবলে কথিত আছে যে, 'নোয়া, স্বয়ং এবং "সেম্" "হাম" ও "যাফেৎ" নামক তাঁহার তিন পুত্র, ইহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে

স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করত জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। উক্ত বাইবল গ্রন্থের ব্যাখ্যাতৃগণ কেহ কেহ বলেন যে, এই জলপ্লাবন খৃষ্ট জন্মিবার ২৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উল্লিখিত বিবরণ সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় নরগণের পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে সঙ্কলিত হইল। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্য-জীব অপরাপর জীবের পরিণামেই উদ্ভূত হইয়াছে—স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট হয় নাই। সে উদ্ভবের কাল নিরূপণ অসাধ্য—এবং তাহা কোন এক সময়ে বা কোন্ এক নির্দ্দিষ্ট স্থানেও হয় নাই। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, পৃথিবীর এক্ষণে যে ভাগ ভূমি বা পর্ব্বত, কোন কালে সেই সকল ভাগ সাগরগর্ভস্থ ছিল—এবং সেই জন্যই ঐ সকল স্থানে সমুদ্রচর জীবদিগের কঙ্কালাদি এবং জলসংঘর্ষের চিহ্ন দর্শনে একটী সাধারণ জলপ্লাবনের কল্পনা হইয়া গিয়াছে।

মানব জাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক।

সত্যযুগ সম্বন্ধে অনেক অত্যাশ্চর্য্য কথা প্রথিত আছে। তন্মধ্যে তাৎকালিক নরজাতীয়দিগের সহিত দেবতাদিগের সংস্রব বিষয়ে অতীব চমৎকারজনক বিবরণ সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন লোকে শিশু-দিগকেই বিশিষ্টরূপে দেবাধিষ্ঠিত জ্ঞান করে, বোধ হয় সেইরূপ পৃথিবীর আদিম অবস্থাকেও দেবাবির্ভূত বলিয়া জন সমূহের প্রতীতি হইয়াছিল।

মনুষ্যসৃষ্টির সর্ব্ববাদিসম্মত কোন বিবরণই যে স্বতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। পরন্তু মানবকুল যে প্রকারে সৃষ্ট হউক, তাহারা প্রথমে কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিল, কিরূপে আপনা-দিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কেমন করিয়াই বা প্রথমে পরস্পর বাক্যালাপ করিতে শিখিল, আর এখন মনুষ্যগণ যে বিবিধ বিদ্যায়

নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, সেই সকল বিদ্যার আরম্ভই বা কি প্রকারে হইয়াছিল, ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল হয়। ঐ কৌতূহল পরিপূরণার্থ যথার্থ ইতিবৃত্তের অভাববশতঃ যে বিবিধ উপায় পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা যে সর্ব্বস্থলে সকলের মনঃপুত হয় না, ইহা বলা বাহুল্য।

ভাষা, লিপি, শিল্প ও চিকিৎসা প্রভৃতি নানাবিদ্যার সৃষ্টি—এই সমুদয় কি কেবল মনুষ্যের অভিজ্ঞতামূলক, না প্রথমতঃ ইহাদিগের উপদেষ্টা কেহ ছিল,সকলের মনেই এই সকল প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে,কিন্তু বোধ হয়,কেহই ইহাদিগের নিশ্চয়রূপ মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়েন না।

পূর্ব্বতনকালের সর্ব্বদেশীয় জনগণের এই সিদ্ধান্ত স্থির ছিল যে, নরজাতির আদিম অবস্থায় সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং, অথবা তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তিরা মনুষ্যদিগকে তাহাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সমস্ত শিখাইয়া দিতেন। এই হেতু সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাই জগদীশ্বর প্রদত্ত অথবা দেববিশেষ দ্বারা প্রকাশিত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আমা-দিগের পুরাণে প্রায় সকল বিদ্যাই মহাদেবের প্রকটিত বলিয়া প্রথিত আছে। "মিশর" দেশীয়রা "আইরিস্" "আইসিস্" ও "হর্ম্মিস্" এই দেবত্রয়কে মনুষ্য জাতির আদিম উপদেষ্টা বলিয়া বর্ণন করিয়া-ছেন। প্রাচীন আসিরীয় লোকেরা আপনাদিগের "বিলস্" দেবকে সকল বিদ্যার স্রষ্টা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীকেরা মিসর দেশ হইতেই আপনা-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহারাও যে মিসরীয়দিগের অনুমত কথা বলিবেন, ইহা বলা বাহুল্য।

খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা অনেকেই কহিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে পরমেশ্বর স্বয়ং মনুষ্যদিগের কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন। তখনকার লোকের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত এবং কখন মনুষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আপন অনুচর দেবতাদিগকে এই মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ সকল সময়ে মনুষ্যেরা তাবৎ প্রয়োজনীয় বিদ্যাতেই উপদিষ্ট হয়েন।

পরন্তু অনেকানেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আধুনিক বিদ্বান ব্যক্তিরা এক্ষণে কহিয়া থাকেন যে, জগদীশ্বর নরজাতিকে যেরূপ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার উদ্ভাবনে সক্ষম। তাঁহারা বলেন যেমন পশ্বাদিকে তাহাদিগের কি প্রয়োজনীয় কিছুই শিখাইতে হয় না, তাহারা আপনাদিগের নৈসর্গিক জ্ঞানের প্রভাবেই সমুদায় জানিতে পারে, মনুষ্যদিগেরও সেইরূপ হয়। ফলতঃ আদিম অবস্থায় মনুষ্যের নৈসর্গিক জ্ঞান সভ্যাবস্থা অপেক্ষা অনেক প্রবল থাকে। অতএব বিদ্যামাত্রকেই ঈশ্বরের উপদিষ্ট বলিতে গেলে অনেক গৌরব স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, পূর্ব্বতন কালের লোকেরা যে সকল দেবতাকে নরজাতির উপদেষ্টা বলিয়া ব্যান করিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিক কোন প্রকার অমানুষশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধিবলে কোন প্রকার অতি প্রধান প্রধান কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই অজ্ঞ লোক সকল কর্ত্তৃক দেবতা বলিয়া পূজিত হয়েন।

সত্যকালের মনুষ্যের বিশাল শরীর।

সর্ব্বদেশীয় লোকেরই এমত বিশ্বাস আছে যে, অতি পূর্ব্বকালে মনুষ্যগণ যেমন উদারপ্রকৃতি, অতীব বিক্রমশালী এবং দেবাবিষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগের শরীরও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল। আমাদিগের পুরাণে বর্ণিত যে, সত্যযুগে সাধারণ মনুষ্যশরীর শত হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ ছিল। মুসলমানদিগের কোরাণে লিখিত আছে, প্রথমে আদমের শরীর পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে এমত সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে পাপসংস্পর্শে তদ্দেহ খর্ব্ব হইয়া আধুনিক নরশরীরের সদৃশ হইল। 'আসিরীয়' লোকসকল আপনাদিগের পূজ্যপাদ বিল্‌স্‌ দেবের মূর্ত্তি ৪০ ফুট পরিমিত করিয়াছিলেন। গ্রীকজাতীয় কবিগণ যে সকল অসুরের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা এক এক জন এক একটি পর্ব্বত হস্তে লইয়া সংগ্রাম করিত। উহাঁদিগের সর্ব্ব

প্রধান কবি 'হোমার' বহুস্থলে এমত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সময়ে লোক সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হীনবীর্য্য এবং খর্ব্বাকৃতি হইয়াছিল। ইহুদিদিগের কোন কোন গ্রন্থে কথিত আছে যে, পূর্ব্বে মানবীগণের গর্ভে অতি প্রকাণ্ডাকার দেবপুত্র সকল জন্মগ্রহণ করিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিত।

অধুনাতন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক বিষয়ে পৃথিবীর পূর্ব্বাবস্থা নিরূপিত করিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, অতি পূর্ব্বকালে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের জীবনোপায় উদ্ভিদাদি কিছুই প্রস্তুত হইত না, এবং ভূগর্ভস্থ প্রচণ্ড অগ্নিতাপে পৃথিবীর উপরিভাগ পর্য্যন্তও তুষ্মাহুরূপে উত্তাপিত ছিল। সুতরাং তৎকালে পৃথিবী মনুষ্য বাসোপযুক্ত ছিল না। সেই সময়ে অতি বিশাল শরীর বহুবিধ প্রাণী ইহাতে নিবাস করিত। তাহারা অধিকাংশই বর্ত্তমান কোন জাতীয় জীবের সদৃশ নহে। তাহাদিগের অনেকের সমুদায় কঙ্কাল, কাহার কাহার কতিপয় অস্থি, কতকগুলির শরীরের অন্যান্য চিহ্ন অনেক স্থলেই ভূগর্ভে দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কোথাও মনুষ্য শরীরের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে অবধি মনুষ্য দেহের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, সেই খান হইতেই মনুষ্য শরীরের এক্ষণে যে পরিমাণ দৃষ্ট হইতেছে তাহাই দেখা গিয়াছে। অতএব অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি পূর্ব্বকালে মনুষ্য শরীর এক্ষণকার অপেক্ষা সমধিক বৃহৎ ছিল এমত হয়, তবে সেই শরীরের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না কেন? যে সময়ে তাদৃশ মনুষ্যগণ পৃথিবীতে বাস করিতে পারিত তাহার পূর্ব্বকালের জীবদিগের চিহ্ন সমূহ রহিয়াছে, তাহার পর সময়েরও সমুদায় চিহ্ন রহিয়াছে, কেবল সেই সময়েরই কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না ইহার কারণ কি?

অতএব এক্ষণে অনেকেই কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বতনকালে মনুষ্য শরীর যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল সে কথা প্রামাণিক নহে। তাঁহারা বলেন যে, অতি পূর্ব্বকালের কোন যথার্থ ইতিবৃত্তই নাই, অথচ সেই প্রাচীন বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই একান্ত বাসনা

আছে। বিশেষতঃ পূর্ব্ব কালের কোন লোকদিগের মধ্যে ঐ বাসনা সমধিক প্রবল ছিল, সুতরাং তাৎকালিক কবিগণ সেই বাসনা পরিপূরণের চেষ্টা পাইয়া আপনাদের অলৌকিক কবিশক্তি প্রভাবে প্রাচীন বৃত্তান্ত সমুদায় পরিকল্পিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহাঁদিগের মতে পূর্ব্বকালিক লোকের যে বৃহৎ শরীর বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল কবিগণের কল্পনামাত্র, উহা কোন প্রকার প্রকৃত শরীরের বর্ণনা নহে।

ঐ সকল আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহাও কহিয়া থাকেন, "দেখ জনসাধারণের সংস্কার এই যে, প্রশস্তমনা ব্যক্তির শরীর তদনুরূপ প্রশস্ত না হইলে শোভা পায় না। অতএব মনুষ্য প্রকৃতির রহস্যানুসন্ধায়ী কবিগণ যখন সত্যকালকে পরম ধর্ম্মের কাল বলিয়া বর্ণন করিলেন, তখন সেই সময়ের লোকসমূহকে সুবিন্যস্ত সুদীর্ঘাবয়বও বলিলেন. ইহাতে বৈচিত্র্য কি?"

——()**()——

সত্যকালে মনুষ্যের সুদীর্ঘ আয়ুঃ।

জগতে মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য নানা প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আমরা বার বার লোকের মৃত্যু দর্শন করিতেছি, অনেকের মৃত্যু হইতেছে শুনিতেছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সমস্ত ক্রমে ক্রমে ঐ মৃত্যুর কবলিত হইয়াছেন জানিয়াছি, তথাপি কোন ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে একাকী বসিয়া থাকিলে মনের কেমন ঔদাস্য জন্মে, ভয়াবহ মৃত্যুর প্রতি একবার নিবিষ্টমনা হইলে আর শীঘ্র অন্যমনা হইতে পারা যায় না, একেবারে তদ্গতচিত্ত হইয়া উহারই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

যদি এত দেখিয়া শুনিয়াও আমাদিগের এইরূপ ঘটে, তবে পৃথিবীর আদিমাবস্থায় মৃত্যু দর্শনে জনসমূহের মন যে কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন, ভীত, সঙ্কুচিত এবং বিচলিত হইত তাহা কে বলিতে পারে? তখন লোকসংখ্যা অধিক ছিল না, বহু মৃত্যুঘটনাও ঘটে নাই, সুতরাং মৃত্যু যে একটি অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য বস্তু তাহা সম্যক্ প্রতীতই হয় নাই।

বোধ হয় যে, এই জন্যই পূর্ব্বতন কালের লোক সকল অমর হইবার নিমিত্ত এত অধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সাধ্যায়ত্ত কার্য্যের সাধনেই লোকে যত্নবান হইয়া থাকে—যাহা কদাপি হইবার নহে, তাদৃশ কার্য্য সম্পাদনে কেহই সচেষ্ট হয়েন না। পূর্ব্বকালের লোক সকল অমর হইবার চেষ্টা করিত। এক্ষণে কেহই সেই চেষ্টা করেন না। কিন্তু তাঁহারাও জানিয়াছিলেন যে অমর হওয়া অতীব দুঃসাধ্য। এই জন্য ধর্ম্মোপদেশকগণ অমর হইবার অতি কঠিনতর উপায় সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং সেই সুযোগে লোক সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দানকরণের মানসে প্রায়ই এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ধর্ম্মই অমর হইবার একমাত্র উপায়। পুরাণে আছে, সুরাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন দ্বারা অমৃত উদ্ভাবিত করেন, পরন্তু সত্বপ্রধান দেবতারাই সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ কঠোর তপস্যা সহকারে দেবতার স্থানে অমর বর যাচ্ঞা করেন। ফলতঃ অমর হওয়া অথবা মরিলে পুনর্ব্বার জীবিত হওয়া—ইহা পূর্ব্বকালে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইত না। মিশর দেশীয়েরা শবকে দাহ বা অন্যপ্রকারে বিনষ্ট করিত না, তাঁহাদের মতে জীবাত্মা শরীর ত্যাগ করিয়া বহুকাল পরে, পুনর্ব্বার সেই শরীরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই বিশ্বাস বশতঃ মিশরীয়েরা 'পিরামিড' নামক অতি প্রধান প্রধান সমাধি স্তম্ভের গর্ভ মধ্যে শব রক্ষা করিত। গ্রীকদিগেরও এমত বোধ ছিল যে, এই মর্ত্তলোকে কেহই অমর হইতে পারে না বটে, কিন্তু দেবতারা অনুগ্রহ করিলে মনুষ্যদিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন এবং তথায় যাইলে মৃত্যুর অধিকার থাকে না। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মর্ত্তে অমর হইবার প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু তাঁহাদের অন্যান্য গ্রন্থে এমত অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে যে, দ্রব্যগুণ বিশেষের দ্বারা লোকে অমর হইতে পারে। বাইবেলে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে যে, ঈশ্বর প্রথমে মনুষ্যকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে আদিম মানব পাপাসক্ত হওয়াতে তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্য হইলেন।

বাইবেলে ইহাও প্রকাশিত আছে যে, কোন ধর্ম্মাত্মাব্যক্তি জগদীশ্বর

প্রসাদাৎ সশরীরে স্বর্গারূঢ় হয়েন, সুতরাং তাঁহার মর্ত্ত্যদেহ মৃত্যু কবলিত হয় নাই।

বস্তুতঃ সর্ব্ব জাতির শাস্ত্রেই এই উপদেশ যে, ধার্ম্মিক না হইলে অমর হওয়াযায় না। ধর্ম্মই অমর হইবার একমাত্র কারণ। যদি তাহাই হইল তবে যথায় ধর্ম্মের আধিক্য সেই স্থলে সুতরাং আয়ুরও দীর্ঘতা হইবে। অতএব সত্যযুগ ধর্ম্মপ্রধান বলিয়া তৎকালের লোক দীর্ঘায়ুঃ ছিল।

পুরাণে বর্ণিত আছে সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ুঃ লক্ষ বর্ষ, ত্রেতায় অযুত-বর্ষ এবং দ্বাপরে সহস্র বর্ষ পরিমিত ছিল। খৃষ্টের বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বকালে মনুজগণ অতি দীর্ঘ ছিলেন। তখন কেহ কেহ নয় শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিতেন। খৃষ্টান এবং মুসলমান উভয়েই ইহুদীদিগের মূলগ্রন্থ হইতে স্ব স্ব ধর্ম্মপুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং অনেক স্থলে ঐ দুই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে একবাক্যতা হইবে তাহার সন্দেহ কি?

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ অনেকে কহিয়া থাকেন যে, সমুদয় মানব জাতি এক আদিম দম্পতী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে জগৎকর্ত্তা যে, সেই পূর্ব্বকালের মনুষ্যদিগকে সুদীর্ঘ আয়ুষ্মান্ করিবেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়।

মনুষ্যদিগের বর্ণভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

বিভিন্নবর্ণ, বিভিন্নাকার, বিভিন্নাচার এবং বিভিন্নভাষী কতকগুলি ব্যক্তিকে একত্র অবস্থিত দেখিলে অবশ্যই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, এইরূপ প্রভেদ ঘটিবার হেতু কি? পণ্ডিতেরা অদ্যাপি এই প্রশ্নের সর্ব্ববাদি-সম্মত উত্তর প্রদানে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু হেতুনির্দ্দেশ করিতে না পারুন, অধুনাতন প্রকৃতি-তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহোদয়েরা এই সকল ভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলি অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্য জাতি পাঁচ প্রধান বর্ণে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটীর নাম "ককেসীয়"। এই ককেসীয় বর্ণের লোকদিগের বর্ণ গৌর, মস্তক

গোল, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত, এবং মুখ-কোণ * সুবিস্তৃত। ইহারা বুদ্ধিবলে এবং ধর্ম্মজ্ঞানে অপর সমুদায় বর্ণের মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। উত্তরে 'স্কট্‌লণ্ড' এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অন্তর্গত যাবৎদেশ, প্রায় সকলই এক্ষণে ককেসীয় লোকের আবাস হইয়া আছে।

দ্বিতীয় বর্ণের নাম "মোগল"। ইহারা পীতবর্ণ, খর্ব্বনাস ও উন্নতগণ্ড। ইহাদিগের মস্তক ঠিক গোল নহে, উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিৎ চাপা এবং মুখ-কোণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মোগলেরা ককেসীয়দিগের অপেক্ষা বুদ্ধিবলে নিকৃষ্ট। উত্তরমেরুসন্নিহিত সমস্ত দেশে এবং পশ্চিমে "তুরস্ক" হইতে পূর্ব্বে "জাপান" দ্বীপ পর্য্যন্ত এই সমুদয় ভূভাগে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

তৃতীয় বর্ণ 'মালাই' নামে অভিহিত হয়। ইহারা কপিশ বর্ণ, প্রশস্ত-নাস, উন্নত-ললাট, এবং বিস্তৃত মুখরন্ধ্র। ইহাদিগের উপরিস্থ দন্তপঙ্‌ক্তির মাড়ি কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে। ইহাদিগের মুখ-কোণ মোগলদিগের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়। ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অতিশয় দুর্ব্বল। পূর্ব্ব প্রায়দ্বীপ এবং তৎসমীপবর্ত্তী দ্বীপসকলে ইহারা বাস করিয়া থাকে।

চতুর্থ বর্ণের লোক সকলকে 'আমেরিক' বলা যায়। ইহাদিগের বর্ণ লোহিত, মস্তক ক্ষুদ্র এবং নাসিকা শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় আভুগ্ন। ইহাদিগের মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ উন্নত এবং পশ্চাদ্ভাগ চাপা। ইহাদিগকে শীঘ্র কোন বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারা যায় না। ইহারা অতিশয় বৈরনির্য্যাতক। আমেরিকা-খণ্ডের প্রায় সর্ব্বস্থানেই ইহাদিগের বাস ছিল। এক্ষণে ককেসীয় বর্ণের লোকেরা ইউরোপ হইতে গিয়া ইহাদিগকে স্বাধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে।

---

* ললাটের উন্নত ভাগ হইতে উপরিস্থিত দন্তপংক্তি পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা কল্পনা কর, আর সেই স্থান হইতে কর্ণের মূল পর্য্যন্ত আর একটী রেখা কল্পনা কর। উক্ত রেখাদ্বয়ের সম্পাতে যে কোণ জন্মে তাহারই নাম মুখ-কোণ।

পঞ্চম বর্ণের লোক সকল 'ইথিয়োপীয়' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বনাস, সঙ্কীর্ণললাট, কুঞ্চিতকেশ এবং স্থূলোষ্ঠ। ইহা-দিগের কফোণি হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ভুজভাগ প্রায়ই দীর্ঘ হয়। ইহারা অতি নির্ব্বোধ এবং অল্প কিন্তু প্রণয়শীল। আফ্রিকার মধ্যভাগে এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপে এই সকল লোক বসতি করিয়া আছে।

আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন যে, মনুষ্য-দিগের বর্ণভেদ বিভিন্ন দেশে আবাস বশতঃই ঘটিয়াছে—বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা মূলতঃ একই জাতি। কিন্তু কাহার কাহার মতে বিভিন্ন বর্ণের মনুষ্য বিভিন্ন মূল হইতেই সমুদ্ভূত।

——()**()——

ভাষাভেদের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

আপাততঃ বোধ হয়, প্রত্যেক জাতীয় লোকের ভাষা ভিন্ন। এক জাতীয় মনুষ্য অন্য জাতীয়ের কথা বুঝিতে পারে না। যে কেবল বাঙ্গালা জানে, সে ইংরাজী বুঝে না। আবার যে ইংরাজী মাত্র জানে, সেও কদাপি বাঙ্গালা বা পারসী কথা বুঝিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, সকলই কতিপয় মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। ঐ মূল ভাষাগুলির অবান্তর-ভেদে অপরাপর সমস্ত ভাষা জন্মিয়াছে। চমৎকারের বিষয় এই যে, প্রাকৃতিক বর্ণ-ভেদের অনুক্রমেই মনুষ্যদিগের ভাষাভেদও হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত মূল ভাষার মধ্যে এক প্রকারের নাম আর্য্য বা 'ইরাণী'। কেহ কেহ ইহাকে 'হিন্দু ইউরোপীয়' বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। এই ভাষা এক্ষণে কোন দেশবিশেষে প্রচলিত নাই। এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, আসিয়া খণ্ডের মধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত হিন্দুকুশ নামক পর্ব্বতের দ্রোণীভূমি সকলে হিন্দু-ইউরোপীয় জাতিদিগের আদিম পুরুষেরা বাস করিতেন, এবং সেই দেশে হিন্দু-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মূল ভাষা কোন কালে প্রচলিত ছিল। ঐ হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দ্রোণীদেশ

হইতে দক্ষিণে হিন্দু এবং পারসিক, পশ্চিমে এবং পশ্চিমোত্তরে কেল্ট ও টিউটোনীয় এবং স্লাবোনিক জাতি সমস্ত বিভিন্ন সময়ে নির্গত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য অর্থাৎ মূল এক হওয়াতে ঐ সকল বিভিন্ন জাতীয়-দিগের ভাষার প্রধান লক্ষণ একইরূপ হইয়া আছে।

আর্য্য বা হিন্দুইউরোপীয় ভাষায় এই কয়েকটী প্রধান প্রধান শাখা আছে যথা,—১ম, সংস্কৃত, এতদ্দেশপ্রচলিত; ২য়, জেন্দ, প্রাচীন পারসিক-দিগের ব্যবহৃত; ৩য়, লাটিন, অতি প্রসিদ্ধ রোমক জাতীয়দিগের ভাষা; ৪র্থ, গ্রীক, বিখ্যাত গ্রীকজাতির ভাষা; ৫ম, স্লাবোনিক রুশীয় সাম্রাজ্যান্তর্গত বহু দেশে প্রচলিত; ৬ষ্ঠ, লেটিস, লিথুয়ানিয়া প্রদেশে ব্যবহৃত; ৭ম, গথিক, ইহা হইতে জর্ম্মণ ভাষা সমুদায় জন্মিয়াছে; ৮ম, কেল্টিক, এই ভাষা রোমীয়দিগের সময়ে ইউরোপের বহুস্থলে প্রচলিত ছিল; এখন ওয়েল্স্, আয়র্লণ্ড ও অপরাপর স্থানে প্রচলিত আছে। এই সকল ভাষার অনেক কথারই মূল এক বলিয়া বোধ হয়। দেশভেদে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই উহাদিগের শব্দ সকল বিভিন্নরূপে শ্রুত হইয়া থাকে। পরন্তু কোন্ ভাষায় উচ্চারণের কিরূপ বৈলক্ষণ্য হয়, পণ্ডিতেরা তাহারও অনেক নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত আটটী ভাষার মধ্যে যে কোন ভাষায় হউক না কেন একটী শব্দ বলিলে, অপর কোন্ ভাষায় সেই শব্দটী কিরূপে উচ্চারিত হইবে, তাঁহারা তাহা প্রায়ই বলিয়া দিতে পারেন। আর্য্য ভাষা মাত্রেরই আর একটী প্রকৃতি এই যে, ইহাদিগের কোন শব্দের কিঞ্চিৎ অর্থান্তর করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে বা পরে অপর শব্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সকল সংযুক্ত শব্দ প্রধান শব্দের সহিত মিলিত হইয়া তাহারই বিভক্তি, অথবা উপসর্গরূপে পরিণত হয়।

ককেসীয় বর্ণের অন্তর্গত অপর কয়েকটী জাতি আছে। তাহাদিগের ভাষা পূর্ব্বোক্ত আর্য্যজাতীয় ভাষা নহে। ইহাদিগের ভাষার নাম 'সেমেটিক।' সাইরীয়, প্রাচীন আবিসিনীয়, আরব এবং ইহুদী বা হিব্রু ভাষা এই প্রকার। সেমেটিক ভাষার প্রায় সকল কথাই ধাতুমূলক হয়। কিন্তু সেই সকল ধাতুর উত্তর বিভক্তি হইয়া রূপান্তর হয় না। অনেক

স্থলেই ধাতুর অন্তর্গত স্বর বর্ণের রূপান্তর হইয়া অর্থান্তর প্রতিপন্ন করে। সেমেটিক জাতীয় ভাষা সমস্তের সকল ধাতু প্রায়ই তিন মূল বর্ণের যোগে জন্মিয়া থাকে—একমাত্র, অসংযুক্ত বর্ণে কদাচ উৎপন্ন হয় না। এই ভাষা প্রথিত শেমের সন্তানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে বলিয়া ইহার নাম সেমেটিক হইয়াছে।

আর এক প্রকার ভাষার নাম 'তুরাণী' বা 'তাতার'। এই জাতীয় ভাষা ভাষী লোকেরা যে কোন সময়ে ইউরোপ খণ্ডের অতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত দেশে বাস করিত, এমত অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। আমাদিগের দক্ষিণ দেশে যে 'তামিল' ভাষা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহা যে তুরাণী ভাষামূলক, ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যে সকল অসভ্য চুয়াড় লোক আমাদিগের দেশের স্থানে স্থানে বাস করিতেছে, তাহাদিগের ভাষাও তাতার জাতীয় ভাষার সদৃশ। তুরাণী ভাষায় বিশেষ কৌশল কিছুই দৃষ্ট হয় না। ইহার ক্রিয়াপদ সকলের প্রায়ই রূপান্তর হওয়ার ব্যবস্থা নাই। শব্দেরও রূপভেদ অধিক হয় না।

চীনীয়দিগের আচার ব্যবহার যেমন অন্য সর্ব্বজাতির আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন, ইহাদিগের ভাষাও সেইরূপ—অন্য কোন জাতীয় ভাষার সদৃশ নহে। ইহাদিগের ভাষা 'এক-বর্ণাত্মক', অর্থাৎ সেমেটিক ভাষার মূলশব্দ সকল যেমন অধিকাংশই 'ত্রি-বর্ণাত্মক', অর্থাৎ তিন বর্ণের যোগে জন্মে, চীনীয়দিগের মূল শব্দ সকল সেরূপ হয় না। উহারা এক একটী বর্ণমাত্র। অপরন্তু চীনীয়দিগের ভাষায় ক্রিয়া, গুণ এবং দ্রব্য-বাচক এই তিন প্রকারের পৃথক পৃথক শব্দ নাই। তাহাদিগের সকল শব্দই দ্রব্যবাচক। ঐ সকল দ্রব্যবাচক শব্দ উচ্চারণ বিশেষে কখন ক্রিয়াবাচক, এবং কখন বা গুণবাচক হইয়া থাকে। এই ভাষাকে তুরাণী ভাষারই আদিম অবস্থা বলিলে বলা যাইতে পারে।

আর এক প্রকার মূল ভাষার নাম 'আফ্রিক'। এই জাতীয় ভাষা-সমূহ আফ্রিকা খণ্ডে প্রচলিত। ইহার প্রকৃতি সেমেটিক এবং আর্য্য উভয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কিন্তু কোন কোন অংশে উক্ত উভয় ভাষা-রই সহিত ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অতএব পণ্ডিতেরা আফ্রিক

ভাষা সকলকে উক্ত দুই প্রকার ভাষার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রাচীন মিশরীয়দিগের ভাষা এই আফ্রিকজাতীয় ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আমেরিক বর্ণের মূল ভাষা পূর্ব্বোক্ত সকল ভাষা হইতে ভিন্ন। ইহাকে 'বহু বর্ণাত্মক' বলা যায়। কারণ এই সকল ভাষায় যদিও বিভক্তিযোগাদির কোন সুকৌশল দৃষ্ট হয় না বটে, তথাপি অনেকানেক মূল শব্দকে একত্র করিয়া অর্থ প্রতিপন্ন করা উহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ বোধ হয়। এই সকল ভাষা আমেরিকাখণ্ডের আদিমনিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি এই ভাষার প্রকৃতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায় নাই।

——**:**——

ভাষাভেদ বিষয়ক পুরাবৃত্ত—নানা দেশে মনুষ্যসঞ্চার।

পূর্ব্বে ভাষাভেদের যেরূপ ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল, কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে তাহার কোন স্পষ্ট বিবরণ নাই। বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জলপ্লাবনের কতিপয় বৎসর পরে নোয়ার সন্ততিগণ 'টাইগ্রিস্' এবং 'ইউফ্রেটিস্' নদীর মধ্যবর্ত্তী 'সিনার' নামক কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় একটী নগর এবং সুবৃহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা সেই সময়ে ঐ সকল ব্যক্তির ভাষা ভেদ করিয়া দেন। তাহাতে জনগণ পরস্পর বাক্যালাপ করণে অশক্ত হইয়া নানা দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্যসমূহ বিবিধ জাতিতে বিভক্ত হয়। অনেকে কহেন, এই ব্যাপার খৃষ্ট জন্মিবার ১৯৯৬ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

উক্ত বাইবেল গ্রন্থকে মূল স্বরূপ করিয়া এবং অপরাপর কতিপয় প্রাচীন জাতির ইতিহাস হইতে কোন কোন স্থলে সাহায্যগ্রহণ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ জাতিসমূহের আদিম বসতির স্থান যেরূপ নিরূপিত করেন, তাহাতে বোধ হয় যে, উত্তরে 'ককেসস্' পর্ব্বত এবং 'মিডিয়া,' পশ্চিমে 'লিবিয়া' এবং 'গ্রীস' আর দক্ষিণে 'ইথিয়োপীয়া' বা 'হাবেশ' এই চতুঃ-

সীমাবচ্ছিন্ন দেশেই প্রথমে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। পরে প্রতিপুরুষে মনুষ্যদিগের আবাসভূমি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া এক্ষণে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মনুষ্য জাতির ইতিহাস সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে কোন দেশের সম্যক্ আদিম বিবরণ প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কোন দেশ হউক, একটীর নাম মনে কর। সেই দেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইবে, এক্ষণে যে জাতি সেই দেশে বাস করিতেছে তাহাদিগের তথায় আগমনের পূর্ব্বে অবশ্যই অপর কোন জাতি সেই দেশ অধিকার করিয়াছিল। যদি সেই পূর্ব্ব জাতির কোন ইতিহাস থাকে, তাহা হইলে আবার দেখা যাইবে যে, তাহারাও ঐ দেশে অন্য কোন অধিকতর প্রাচীন জাতির স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সেই জাতির কোন ইতিহাস নাই— কেবল তাহাদিগের নির্ম্মিত কতকগুলি সমাধি,তাহাদিগের ভাষায় কতিপয় শব্দমাত্র,অথবা তাহাদিগের ব্যবহৃত অতি জঘন্য অস্ত্রাদি, অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তাহারাই যে ঐ দেশের আদিমনিবাসী ছিল, ইহারই বা প্রমাণ কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমেরিকা খণ্ড অতি অল্পকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে। 'কলম্বস' নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ নাবিক ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ঐ খণ্ড ইউরোপীয়দিগকে অবগত করান। ইউরোপীয়েরা আমেরিকায় গিয়া প্রথমতঃ যে সকল তাম্রবর্ণ অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকেই ঐ খণ্ডের আদিম নিবাসী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ঐ দেশের নানা স্থানে সুবৃহৎ দুর্গপ্রাচীর এবং সমাধি-স্থান প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়াছে। ইণ্ডিয়ানেরা বলে, ঐ সকল দেব-নির্ম্মিত। অতএব বোধ হয় যে, ইণ্ডিয়ানদিগের পূর্ব্বেও কোন সুসভ্য জাতি আমেরিকাখণ্ডে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশ নির্ম্মূল হইয়া গেলে ইণ্ডিয়ানেরা তথায় বাস করে।

এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশে 'জর্ম্মণ' জাতীয়

লোকেরা প্রবল হইয়াছে। তাহাদিগের পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে 'কেল্‌টিক' জাতীয়েরা নিবাস করিত। জর্ম্মণ এবং কেল্টিক উভয়ই ককেসীয় জাতীয় লোক, এবং উহাদিগের ভাষা আর্য্য প্রকৃতিক। এক্ষণে অনেক স্থলে ঐ দুই প্রকার লোক সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেল্টিকদিগের পূর্ব্বেও ইউরোপ খণ্ডে যে অন্য কোন জাতি বাস করিত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল লোক ককেসীয় বর্ণের নহে। তাহারা মোগলজাতীয় ছিল।

আসিয়া খণ্ডের অনেক স্থলেও ঐরূপ দেখা যায়। আমাদিগের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে মোগলজাতীয় কোন ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণেও যে সকল অসভ্য চুয়াড় জাতি বনে ও পর্ব্বতে বসতি করিতেছে, তাহারাও ককেসীয় বর্ণের লোক নহে। কিন্তু হিন্দুরা ককেসীয় বর্ণসম্ভূত। ইহাতেই দেখা যায় যে, হিন্দুজাতির আগমনের পূর্ব্বেও এই দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু জাতি যে কত প্রাচীন, তাহাও নির্ণয় করা যায় না।

আফ্রিকাখণ্ডেরও স্থানে স্থানে ককেসীয় বর্ণের লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এই খণ্ডের সর্ব্বদক্ষিণে যে 'হটেণ্টট্,' জাতি নিবাস করিতেছে, তাহারা যে মোগলজাতীয় লোক, এমন বিলক্ষণ বোধ হয়। অতএব অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রথমে ঐ খণ্ডে মোগলজাতীয় লোকের আগমন হয়, পরে ককেসীয় এবং ইথিয়োপীয় জাতি উহাতে যাইয়া বাস করিয়াছে।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে, কোন দেশেরই যথার্থ আদিম বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইবার নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে, মনুষ্যজাতির অনাদিত্বাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে, এমত নহে। ভূতত্ত্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন সময়ে এই পৃথিবী মনুষ্যজাতির বাসোপযুক্ত ছিল না। অতএব অবশ্যই তাহার পর ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কাল যে এক্ষণকার কত পূর্ব্ব, যুক্তিদ্বারা তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত স্থির সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অসাধ্য।

মনুষ্য-সমাজ।

আমরা বাল্যাবধি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় ও সুখোপযোগী সামগ্রীসম্ভারপরিবৃত হইয়া থাকি, নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ সেই দ্রব্য যে কত যত্ন ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের এক একটী প্রস্তুত করিতে প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের যে কত বিবেচনা, কত পরিশ্রম ও কত কাল লাগিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। দেখ, লৌহাদি ধাতু আমাদের কত প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু অনেক জাতীয় লোক বহুকাল পর্য্যন্ত লৌহের ব্যবহার জানিত না। লৌহের কথা দূরে থাকুক, লবণ যে এমন প্রয়োজনীয় দ্রব্য—যাহা ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদিগের কোন প্রধান খাদ্য বস্তুই প্রস্তুত হইতে পারে না, অনেক দেশের লোকে সেই লবণ প্রস্তুত করিতেও জানিত না। আর কোন কোন দেশের লোক এমত বর্ব্বর ছিল যে, তাহারা অগ্নিরও ব্যবহার অবগত ছিল না। তৎকালে তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা অনুমান মাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়; তাহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন মনুষ্যগণ ঐরূপ বর্ব্বরী দশা হইতে মুক্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি দুই একটী অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে, এক এক প্রকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে জানিয়াছে, যখন তাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবোধ জন্মিয়াছে, পরস্পর কথোপকথন করিবার নিমিত্ত এক প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পর সময় হইতেই মানবগণের যে যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে, ইতিহাসে তাহারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সমাজবদ্ধ হইলেই নরগণ যে একেবারে বহুসংখ্যক লোকমিলিত হইয়া এক একটী সুবিস্তীর্ণ রাজ্যশাসনের প্রণালী প্রস্তুত করে, এমত নহে। প্রথমে কেবল এক একটি পরিবারের লোকই একত্র থাকিত। পরিবারস্থ অপরাপর লোকেরা তাহাদিগের পিতা বা তৎসদৃশ অন্য কোন প্রধান ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত। তখন মনুষ্যগণ মৃগয়াদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত, এবং কোন এক স্থানেও বাসস্থান

নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত না। পরন্তু মৃগয়াদ্বারা জীবনোপায় করা অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোন কোন দিন মৃগয়া সফল না হওয়াতে হয়ত কিছুই ভক্ষ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উপবাসেই দিনযাপন করিতে হয়। বার বার এইরূপ হইলে, মনুষ্যেরা ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে, এবং সহজেই দেখিতে পায় যে, কতকগুলি পশু পোষিত করিয়া রাখিলে তাদৃশ কষ্টের নিবারণ হইতে পারে। এইরূপে মৃগয়া করিতে করিতেই জনগণ পাশুপাল্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন লোকেরা আপন আপন 'কুলপতির' শাসনাধীনে থাকিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অতএব ইহাদিগের শাসন-প্রণালীকে 'কুল-তন্ত্রতা' বলা যাইতে পারে।

পশুপালন দ্বারা যত লোক প্রতিপালিত হয়, কৃষিদ্বারা তদপেক্ষা অধিক লোকের সচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হইতে পারে। দেশভেদে এবং প্রকৃতিভেদে এই জ্ঞান কোন কোন জাতীয় লোকের মনে অতি শীঘ্রই উদ্ভূত হয়। তাহা হইলেই উহারা আর নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায় না—কোন উর্ব্বর ভূমিখণ্ড দেখিয়া লইয়া তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় প্রথমে মানববর্গ কুল-তন্ত্রতারই বশীভূত থাকে। কিন্তু অধিক স্থলেই এই অবস্থা অতি শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোন একটী কুলের লোক অধিকসংখ্যক, অধিক পরাক্রান্ত বা অধিক দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অপর কুলজাত লোকের প্রতি আক্রমণ করে, এবং তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনাদিগের অধীন করিয়া রাখে। এইরূপে তিন চারিটী কুল একত্র হইলে, তৎসমুদায়ের কর্ত্তাকে রাজোপাধি প্রদত্ত হয়। এই প্রকারেই বর্ত্তমান বিস্তীর্ণ রাজ্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অবস্থায় রাজগণ যুদ্ধদ্বারাই অধিক লাভ দেখিয়া অনুক্ষণ তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং রাজ্য সকল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া উঠে।

শাসন-প্রণালী।

একত্র সমাজ-বদ্ধ হইয়া থাকাতে মনুষ্যের যেরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, সেইরূপ কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতেও মানবগণের

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। সেই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইলে বিশুদ্ধ-চিত্ত, সমধিক বুদ্ধিবিদ্যাসম্পন্ন কতকগুলি লোক প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহারা জনসাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। তাঁহাদিগের শিষ্যেরা তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া চলে। রাজা যত দিন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ থাকেন, তত দিন তাঁহারা রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজা দুর্বৃত্ত হইলে যাজকেরা রাজার বিপক্ষ হন। এইরূপে কোথাও কোথাও রাজপক্ষে এবং যাজকপক্ষে ঘোরতর বিবাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যাজকবর্গ প্রায়ই সর্ব্বস্থলে লব্ধবিজয় হইয়াছে। আর যে সকল দেশে যাজকদিগের সহিত রাজার স্পষ্ট বিবাদ হয় নাই, সে সকল স্থলেও রাজাকে যে যাজকদিগের মতানুসারে অনেক কর্ম্ম করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ অতি পূর্ব্বকালে যাজকেরাই সাধারণ প্রজাগণের এক মাত্র সহায় ও শরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা না থাকিলে দুর্বৃত্ত রাজাদিগের দৌরাত্ম্যে ও নিরন্তর যুদ্ধে প্রজাদিগের দুঃখের সীমা থাকিত না।

রাজদৌরাত্ম্য নিবারণের আরও এক উপায় ছিল। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, কোন এক কুলের লোক অপরাপর কুলোদ্ভব জনসমূহকে অধীন করিয়া আপনাদিগের কুলপতিকে সমুদায় প্রজার রাজা করিতেন। কিন্তু আপনারাও যে বিজিত জনগণের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতেন না, এমত নহে। তাঁহারা রাজার স্বকুলোদ্ভব ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সহায়তাতেই তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা রাজার স্থানে বিস্তীর্ণ ভূম্যধিকার গ্রহণ করিতেন, আর এরূপ নিয়ম করাইতেন যে, রাজা তাঁহাদিগকেই প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত এবং তাঁহাদিগকে লইয়াই রাজকার্য্যের মন্ত্রণা করিবেন। এই সকল লোক 'কুলীন-ভূম্যধিকারী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারাও প্রজা সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল। রাজা তাঁহাদিগের ভয়ে নিতান্ত যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না, আর ভূম্যধিকারীরাও রাজার ভয়ে প্রজাদিগের প্রতি উচিত ব্যবহারের অধিক অন্যথা করিতেন না। এইরূপে শাসন-শক্তি, রাজা, যাজক এবং ভূম্যধিকারিবর্গেরই হস্তে সমর্পিত থাকে। প্রজা-সাধারণের কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি

হইয়া দেশমধ্যে শান্তিভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে বণিক্‌বৃত্তির সোপান প্রশস্ত হয়। বাণিজ্যদ্বারা লোকের ধনসঞ্চয় হয়। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে প্রজাসাধারণের মধ্যে কাহার কাহার মনে শাসন-শক্তির কিয়দংশ গ্রহণের ইচ্ছা জন্মে। অনেকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে সুতরাং রাজা, ভূম্যধিকারী ও যাজকবর্গের রাজশক্তি হ্রস্ব হইয়া পড়ে। তখন যদিও নামে উহাঁরাই রাজ্যশাসনকর্ত্তা হউন, কিন্তু বাস্তবিক কতকগুলি আঢ্য প্রজার হস্তেই রাজশক্তির অধিকাংশ সমর্পিত হয়। অনেকগুলি ইউরোপীয় জাতি এবং আমেরিকাবাসী ইউরোপীয়েরা এই অবস্থাপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপেও অদ্যাপি প্রজাসাধারণের বিশেষ গৌরব হয় নাই। যাবৎ সকলেই জ্ঞানবান্ ও ধনবান্ না হইবে, তাবৎকাল তাহা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব।

মানব জাতির শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা যাহা কথিত হইল, তদ্দ্বারা অবশ্যই এইরূপ প্রতীতি হয় যে, যেমন মনুষ্যগণ শৈশবে স্ব স্ব পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়, এবং ক্রমে বয়োধিক ও কার্য্যক্ষম হইলে বন্ধুবৎ আচরিত হয়, মনুষ্যসমাজেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। একান্ত বর্ব্বর দশায় কুলপতি, রাজা, যাজক কিম্বা ভূম্যধিকারিবর্গ—ইহাঁরাই প্রজাসাধারণের শাসন করেন। কিন্তু প্রজাগণের জ্ঞানোন্নতি হইলে তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হইতে থাকে। ফলতঃ বুদ্ধিই বল। সমাজ মধ্যে যাঁহারা অধিক বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন হইবেন, তাঁহাদিগের হস্তে অধিক রাজশক্তি সমর্পিত হইবে। এই নিয়মের কদাপি অন্যথা ঘটিতে পারে না। যখন যেখানে এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়াছে, সেই স্থানেই অতি ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে।

শাসন-প্রণালীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে করিতে আরও একটী প্রাকৃতিক নিয়মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সকল সমাজেই পরস্পর-বিভিন্ন পরামর্শী কতিপয় দল থাকে। দেখ, রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ এক দল, এবং যাজকেরা তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন; আবার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গ পূর্ব্বোক্ত উভয় দল হইতেই স্বতন্ত্র; আর আঢ্য প্রজাগণ ঐ তিন দল হইতেই পৃথক্। পরন্ত, প্রজা সাধারণ ঐ চারি দলের কোন দলেরই

সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইতে পারে না। এই সকল দল কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী। ধর্ম্মপ্রণোদিত না হইলে সকলেই স্ব স্ব হস্তে সমধিক রাজ-শক্তি গ্রহণের নিরন্তর চেষ্টা করে। তাহা করাতে সমাজের কর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না—কেহই স্থায়িভাবে অতি প্রবল হইয়া অপর সকলের প্রতি অধিক অত্যাচার করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের হিতসাধন হয় না।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে মনুষ্যসমাজকে একটী তুলাদণ্ড স্বরূপ বোধ করা যায়। যেমন তুলাদণ্ডের এক এক দিকের ভার ঐ দণ্ডকে স্ব স্ব অভিমুখে নত করিবার চেষ্টা করে, তেমনি সমাজ-সম্ভুক্ত প্রত্যেক দলই সমধিক শক্তি গ্রহণের চেষ্টা করিয়া উহাকে আপনাপন পক্ষপাতী ব্যবস্থায় আয়ত্ত করিতে চায়; কিন্তু যেমন তুলাদণ্ডের অবলম্ব যথাযোগ্য স্থানে নিবেশিত থাকিলে দণ্ডের সাম্যাবস্থা থাকে, তেমনি যথোচিত ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা ন্যায়পরতার প্রাধান্য সংরক্ষিত হইলেও সমাজের সাম্যাবস্থা পরিভ্রষ্ট হইতে পারে না। রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই নিয়মকে "সামাজিক সাম্যাবস্থার নিয়ম" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক মাত্রেরই এই মৌলিকসূত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করেন, তাহা হইলেই ব্যবস্থার দোষ হয়; এবং সেই দোষে হয়ত সমাজ একবারে হীনবল হইয়া যায়, অথবা তদ্দোষ সংশোধনার্থ পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লবাদি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকে। যত দিন উক্ত দোষ সংশোধিত হইয়া পুনর্ব্বার ন্যায়পরতার প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়া সাম্যাবস্থা না হয়, তাবৎকাল সমাজের কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

ব্যবস্থা-প্রণালী।

যদি মনুষ্যমাত্রেই অস্বার্থপর, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ হইত, তবে সচ্ছন্দে সকলে সমাজবদ্ধ হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারিত। কেহ কাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিত না; সুতরাং কোন প্রকার

শাসনেরও আবশ্যকতা থাকিত না। যিনি বিদ্যা ও বয়সে শ্রেষ্ঠ হইতেন, সকলে তাঁহার মতানুযায়ী হইয়া সমাজের সাধারণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত, আর নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদনে কাহাকেও কোন প্রকার শাসনের অধীন থাকিতে হইত না। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি তেমন বিশুদ্ধ নয়। ধর্ম্মশিক্ষিত না হইলে সকলেই আত্মম্ভরী হইয়া থাকে। শিশুদিগের স্বভাবে ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হয়। তাহাদিগের মনে সদাশয়তার লক্ষণ সমস্তও যেমন দেখা যায়, একান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ সমস্তও তেমনি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহাতেই ধর্ম্মশিক্ষা এবং শাসনের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। মনুষ্য-সমাজের আদিমাবস্থায় যখন এক একটী পরিবারের লোকমাত্র একত্র সম্বদ্ধ থাকে, তখন ঐ পরিবারের কর্ত্তা যেরূপ শাসন করেন, সকলে তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে। নিজ পরিবারের প্রতি তাঁহার যে নৈসর্গিক স্নেহ থাকে তদ্দারাই তাঁহার শাসন-বিধি পক্ষপাতশূন্য এবং সকলের সুখাবহ হয়। ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হইয়া কুলতন্ত্রতার কাল উপস্থিত হইলে কুলপতিগণ স্ব স্ব ইচ্ছা এবং জ্ঞান অনুসারে শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু সেই সময় হইতেই এক প্রকার ব্যবস্থাও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। কোন বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কুলস্বামী যে প্রকারে স্থলবিশেষে বিচার করিয়া যান, তাহা সকল লোকের হৃদগত হইয়া থাকে। তাহার পর আবার সেই প্রকার স্থল উপস্থিত হইলে তদনুযায়ী হইয়া বিচার করাই আবশ্যক হয়। তাহা না করিলে বিচারকের নিন্দা হয়, এবং জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে।

এইরূপে ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া উঠিতে থাকে। কবিগণ তৎসমুদয়কে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিতে থাকেন। লোকে যত পারে স্মরণ করিয়া রাখে। পরে লিপিসৃষ্টি হইলে অগ্রেই ব্যবস্থা সকল লিপিবদ্ধ হয়। যে মহাত্মাকর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে কোন দেশের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, তিনিই তদ্দেশের ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। আমাদের দেশে ব্যবস্থাপকদিগকে 'সংহিতাকার' কহে।

অনেক প্রাচীন জাতীয় লোকের সংহিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

দেশভেদে ও তৎকালীন ব্যক্তিদিগের অবস্থাভেদে সংহিতার প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে সংহিতাদিগের ঐক্য আছে। সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই মানবগণের কেমন অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। অতএব সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ব্যবস্থা সকল লোকোপকারী হয় বলিয়া বহু পূর্ব্বকাল হইতে পারম্পর্য্যোপদেশানুসারে ভক্তিসহকৃত প্রচলিত হইয়া আইসে। সুতরাং ঐ সকল ব্যবস্থা মঙ্গলময় ঈশ্বর প্রণীত, অথবা ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাত্মার প্রণীত বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ আদিমাবস্থায় লৌকিক ব্যবস্থা ধর্ম্মব্যবস্থা হইতে অভিন্নরূপ থাকায় সকল ব্যবস্থাই ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক বলিয়া সমধিক মান্য হয়।

কিন্তু মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ বিস্তৃত এবং নানা-ব্যবসায়ীলোক সঙ্ঘটিত হইলে উহার প্রথমাবস্থার অত্যুদার ব্যবস্থাসূত্রের প্রয়োগস্থল সর্ব্বর্দ্ধিত হয় এবং সেই জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্র বহুমুখ হইয়া উঠে। প্রথমতঃ ব্যবস্থাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ ধর্ম্মকর্ম্মের আচারগত, অপর ভাগ লৌকিকব্যবহার সম্পৃক্ত। সকল দেশেরই 'স্মৃতিশাস্ত্র' এইরূপ আচারকাণ্ড ও ব্যবহার-কাণ্ডে বিভক্ত হইয়া আছে।

বন্যদশায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও নিতান্ত অসদ্ভাব থাকে; এবং সেই সকল দ্রব্যাদির সংরক্ষণের নিমিত্ত জনগণকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়। তাহাতে নিরন্তরই অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই সময়ে মনুষ্যজীবন যে কেমন অমূল্য রত্ন, তাহা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় না। তখন মনুষ্যের ধন-বিশেষ হরণ করা এবং প্রাণনাশ করা উভয়ই সমান দোষ বলিয়া গণ্য হয়। প্রাচীন কালের ব্যবস্থামাত্রেই দেখা যায় যে, পরদ্রব্যবিষয়ক অপরাধে এবং পরশরীরবিষয়ক-সাহস কর্ম্মে প্রায় অধিক প্রভেদ নাই। উভয় প্রকার দোষেই সমান দণ্ড বিহিত আছে। বরং সাহস কর্ম্মের অপেক্ষা কোথাও কোথাও অপহরণের দণ্ড অধিক ছিল। পরন্তু যখন লোকের সভ্যাবস্থা হয়, তখন এইরূপ ব্যবস্থা সকল প্রচলিত থাকিতে পারে না। তখন দ্রব্য-বিষয়ক অপরাধের দণ্ড এক

প্রকার, আর শরীর-বিষয়ক অপরাধের দণ্ড অন্য প্রকার হইয়া থাকে। এইরূপে ব্যবহারকাণ্ডও দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক ভাগের নাম 'দেওয়ানী আইন' ও অপর ভাগের নাম 'ফৌজদারী আইন'।

ব্যবহারকাণ্ড এইরূপে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইলেও ঐ দুই প্রকার আইনের দণ্ড কিছু কাল বহু স্থলে সমানই থাকে, একবারে সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না। ফৌজদারী আইনের দণ্ড সমস্ত যেন বৈর-সাধনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, এমত বোধ হয়। কোন অপরাধে হস্তচ্ছেদ, কাহাতেও বা পদচ্ছেদ, অপর কোন প্রকার অপরাধে চক্ষুরুৎপাটন, আর কাহাতে বা অগ্নিদ্বারা দহন ইত্যাদি অতিনৃশংস দণ্ড সকল প্রচলিত হইয়া থাকে। দেওয়ানীর দণ্ডও এইরূপ অতি কঠিন হয়। যে ব্যক্তি ঋণগ্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে না পারে, উত্তমর্ণ তাহার শরীর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। বিক্রয় করা কি, কোথাও কোথাও এমন আইন প্রচলিত ছিল যে, অধমর্ণকে একবারে হত্যা করিলেও দোষ হইত না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে আইনের এই সকল দোষ সংশোধিত হইয়া আইসে। রাজকর্ম্মচারিগণ, ভূম্যধিকারিবর্গ এবং যাজকমণ্ডলীরাই প্রথমে ঐ প্রকার নৃশংস ব্যবস্থার অধীনতা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পায়েন। তাঁহারা প্রথমতঃ কেবল আপনাদিগকেই উক্ত আইনের বিশেষ বিশেষ দণ্ড হইতে মুক্ত করেন। পরে প্রজাসাধারণের প্রতিও উহার কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনন্তর সমাজ যত দৃঢ়বদ্ধ ও শান্তিবহুল হইতে থাকে, ততই ব্যবস্থা সকল বিশুদ্ধ হইয়া অপরাধীর প্রতি বৈরনির্য্যাতক ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং যাহাতে দোষী ব্যক্তির দুষ্ট স্বভাব সংশোধিত হয়, তখন কেবল এইরূপ চেষ্টাই হইতে থাকে। অদ্যাপি কোন দেশে এইটী সম্পূর্ণরূপে হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন দেশে প্রাণদণ্ডের বিধি একবারে রহিত হইয়া গিয়াছে এবং কোথাও কোথাও ঋণ জন্য কারাদণ্ড রহিত হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। ইহাতেই অবস্থাভেদে আইনের প্রকৃতি যে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতে পারে।

শিল্পপ্রণালী এবং বাস্তুশিল্প।

যেরূপ মানবজাতির ব্যবস্থা প্রণালী, শাসন প্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ দেশের লোক কেমন অবস্থাপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ শিল্পবিদ্যারও উৎকর্ষ পরীক্ষা করিয়া জনগণের সভ্যাবস্থা কত উন্নত হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। অতএব শিল্পতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই বিষয়োপলক্ষে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইবে। প্রথমতঃ বাস্তু-শিল্পের প্রণালী বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রায় সকল প্রকার জীবই স্ব স্ব নৈসর্গিক সংস্কার প্রভাবে আপন আপন বাসোপযোগী স্থান প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। পক্ষীদিগের কুলায় আছে, হিংস্র পশুগণ স্ব স্ব গহ্বরে গিয়া বিশ্রাম করে, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদিগেরও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকে। মনুষ্যেরাও প্রথমে উক্তরূপ কোন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া থাকিত, সন্দেহ নাই। দেশের প্রকৃতিভেদে বর্ব্বর নরগণের আবাস কোথাও বা তরুস্কন্ধে, আর কোথাও বা পৃথিবীগর্ভে হয়। শীতপ্রধান দেশে মনুষ্যেরা পৃথিবীতে খাত করিয়া থাকে। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহাদিগের বাস তরুতলে বা তদুপরিভাগে হয়। ইউরোপের স্থানে স্থানে ঐ সকল আবাস গর্ত্তের চিহ্ন সমস্ত অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গর্ত্তের মুখ প্রস্তরদ্বারা বদ্ধ, প্রবেশ ও নির্গমনের নিমিত্ত কেবল এক একটী অতি সঙ্কীর্ণ ছিদ্রমাত্র ছিল। গর্ত্তের ভিতরে কাষ্ঠদহনজাত অঙ্গার দৃষ্ট হইয়াছে, এবং শিলা বা অস্থিনির্ম্মিত শরমুখাদি স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতএব ঐ সকল স্থান যে নরগণের আবাস ছিল, তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ঐ সকল গর্ত্তে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সকলই শিলানির্ম্মিত, একটিও ধাতুনির্ম্মিত নয়। আর তথাকার লোকেরা যে কোন প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিত, এমত কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে, ঐ প্রকার আবাসগর্ত্ত অনেকগুলি করিয়া এক এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হয় যে, তখনও

মনুষ্যেরা এক প্রকার সমাজসম্বদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই ভাষা সৃষ্টির আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ইহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে যে সকল আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রকৃতি পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তখনও মনুষ্যেরা গর্ত্তের ভিতর বাস করিত, কিন্তু তখন গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মুখ একেবারে বদ্ধ করিত না, উহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর বসাইয়া তদুপরিভাগে একপ্রকার ছাদ প্রস্তুত করিত। সুতরাং গর্ত্তে গমনাগমনের পথও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত থাকিত। এই সকল গর্ত্তের ভিতর যেমন পূর্ব্ববৎ অস্থি ও প্রস্তরবিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায়, তেমনি পিত্তলনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তখনকার লোকেরা কোন কোন ধাতুর ব্যবহার শিখিয়াছিল।

বোধ হয়, ইহার অত্যল্প কাল মধ্যে মনুষ্যদিগের মনে হিংস্র পশুর ভয় অনেক খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহারা আর গর্ত্তে বাস না করিয়া বাহিরে কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। তখনকার যে সকল আবাস স্থানের বা দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তদ্দর্শনে বোধ হয় যে, সে সময়ের লোকেরা লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিল।

সকল জাতীয় লোককেই ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্ত দুইটী অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। তবে বিশেষ এই যে, যে দেশের জল বায়ু ভাল এবং ভূমি উর্ব্বরা তথায় অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই বর্ব্বরদশা শেষ হইয়া সভ্যাবস্থা প্রবৃত্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি সেই দেশ পৃথিবীর এমত স্থলে অবস্থিত হয় যে, তাহাতে বৈদেশিক লোকের সহজে গমনাগমন হইতে পারে, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতীয় লোকের পরস্পর পরিচয়দ্বারা অতি শীঘ্রই নানা বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং সেই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রেই সুসভ্য হয়। আসিয়া খণ্ডের যে ভাগ হইতে অন্য সকল দেশে মনুষ্যসঞ্চার হইবার কথা প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভাগ উক্ত সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত। অতএব তত্রত্য লোকেরা যে প্রথমেই সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইবে, তাহা সম্ভবপর। আসিরিয়া, বেবিলন, পারস্য, মিশর, নিউবিয়া এবং তৎসমীপবর্ত্তী সকল দেশে যে সমস্ত

প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছে, সে সকলই অতি আশ্চর্য্য এবং মনোহর। তাহাদিগের কাহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ শিলা বা পিত্তল ঘটিত অস্ত্র শস্ত্রাদির চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহাতেও নির্ম্মাতৃগণের বিভিন্ন প্রকৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, অতি স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয়।

(মিসরীয় হর্ম্ম্য প্রণালী।)

পূর্ব্বোক্ত সকল জাতির হর্ম্ম্যই এক প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর অধুনা আমেরিকা খণ্ডের মধ্যভাগে যে সকল ভগ্ন প্রাসাদসমূহের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ও এই জাতীয় হর্ম্ম্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকলই যে সর্ব্ব প্রাচীন হর্ম্ম্য প্রথা, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মিসর দেশেই ইহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে 'মিসরীয়' বলা যায়। ইউরোপের অন্তর্গত সিসিলীতে এবং গ্রীসে যে সমস্ত অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যে সমস্তকে কেহ কেহ 'সাইক্লোপিস' (অর্থাৎ অসুরনির্ম্মিত) বলিয়া আখ্যাত করেন, অধিকাংশ হর্ম্ম্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে তাহাও এই জাতীয় নির্ম্মাণ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

মিসরীয় হর্ম্ম্য-প্রণালীর কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ ইহার প্রাচীর সকল নীচে অত্যন্ত স্থূল হইয়া উপরিভাগে ক্রমশঃ স্বল্পায়ত হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ছাদ সকল সমপৃষ্ঠ এবং এরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর যোগে নির্ম্মিত হয় যে, তাহার নীচে কড়ির আবশ্যকতা থাকে না; প্রস্তরফলক সমস্ত একবারে এক প্রাচীর হইতে সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীর পর্য্যন্ত অথবা এক স্তম্ভ হইতে অন্য স্তম্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ স্তম্ভ সকল অতিশয় স্থূল, খর্ব্ব, নানা খণ্ডে বিভক্ত ও বিচিত্র খোদকতায় পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থতঃ বৃহৎ বৃহৎ ভাস্করীয় শিল্প গৃহের স্থানে স্থানে থাকে। পঞ্চমতঃ কোথাও কোথাও পর্ব্বতের অন্তর্ভাগ খনন করিয়া তন্মধ্যে এইরূপ হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষেই এই সকল 'গুহামন্দিরের' বিশেষ বাহুল্য এবং বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়।

পণ্ডিতেরা কহেন যে, যে সকল লোক প্রথমতঃ পর্ব্বত গুহায় বাস করিয়া পরে মৃত্তিকাদ্বারা বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারাই ক্রমে

প্রবল ও শিল্পকুশল হইয়া এই প্রকার হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করে। তাঁহারা কহেন, মৃণ্ময় প্রাচীর ও স্তম্ভাদির অনুকরণ করিতে গেলেই অট্টালিকা সমস্ত উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। আর পর্ব্বত গুহায় বাস করিতে করিতেই প্রয়োজন-বশতঃ ঐ সকল গুহাকে প্রশস্ত করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব যখন তাদৃশ লোকের মনোমধ্যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য স্থান প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাহারা যে পর্ব্বত খনন দ্বারাই দেবালয় নির্ম্মাণ করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে।

(গ্রীক হর্ম্ম্য-প্রণালী।)

গ্রীকেরা মিসরীয়দিগের স্থানে সকল বিষয়েরই শিক্ষা পাইয়াছিল। উহারা মিসরীয়দিগের হর্ম্ম্য বিদ্যাও শিখে। কিন্তু উহারা আপনাদিগের সহৃদয়তাগুণে অল্পকালমধ্যেই ঐ শিল্পবিদ্যার এতাদৃশ উন্নতি করিল যে, মিসরে কখনই সেরূপ হয় নাই। প্রথমতঃ উহারা প্রাচীর সমস্তকে সমপৃষ্ঠ করিল, এবং স্তম্ভগুলির গাত্রের অন্য খোদকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সরল রেখাগুলি মাত্র রাখিল। উহারা স্তম্ভ সকলকে প্রথমাবধি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল বটে, তথাপি আদৌ ব্যাস পরিমাণে চতুর্গুণের অধিক দীর্ঘ করে নাই। এইরূপ হর্ম্ম্য-প্রণালীকে 'ডোরীয়' কহিয়া থাকে।

ইহার কিয়ৎকাল পরে গ্রীকেরা স্তম্ভ সকলের দৈর্ঘ্য ব্যাসপরিমাণের ৮।৯ গুণ করিত, স্তম্ভের নীচে সমচতুরস্র পীঠিকা গ্রথিত করিত এবং স্তম্ভের মস্তক 'কান্‌মোচড়া' করিত। এইরূপ করাতে হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য যে অধিক হইবে, তাহার সন্দেহ কি? ইহাকে 'আইওনীয়' প্রথা কহে।

তৃতীয় প্রকার গ্রীক হর্ম্ম্যের স্তম্ভ সকল দৈর্ঘ্যে ব্যাসের দশ গুণ হইত। তাহাদিগের পীঠিকার গঠন বিচিত্র এবং শিরোভূষণ সপল্লবপাদপ-শিরোভাগের অনুরূপ হইত। এই প্রথাকে 'করিন্থীয়' কহা যায়।

গ্রীকদিগের দেশ অতি রমণীয়। তথায় ঝড় বৃষ্টির উৎপাত প্রায়ই হয় না। তথায় সমস্ত বৎসরই যেন ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজ করিতে থাকেন। এই হেতু অট্টালিকা সমস্তের দ্বার অতীব প্রশস্ত হইত, নাট্যশালা- প্রভৃতি সাধারণ সমাগম গৃহের ছাদ থাকিত না, এবং দেবালয় সকলের চতুর্দ্দিকেই

অতি সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী দৃষ্টি-গোচর হইত। অতএব ইহাদিগের হর্ম্ম্য সকল যে সমধিক শোভাসম্পন্ন হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। চমৎকারের বিষয় এই যে, গ্রীকজাতীয় লোকের মনের প্রকৃতি যখন যেরূপ হইয়াছিল, তাহাদের তৎকাল নির্ম্মিত হর্ম্ম্য সকলও সেই সেই প্রকার মনের ভাব প্রকাশক হইয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন গ্রীকজাতির প্রথম অভ্যুদয়কাল সুতরাং লোকমাত্রের মনে দৃঢ়তা, ঔদার্য্য এবং সারল্য গুণের আধিক্য, তখন হর্ম্ম্য সকল সুদৃঢ় ডোরীয় প্রথায় বিনির্ম্মিত হয়। যখন তাহারা প্রবল পারসীক জাতিকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভব করিয়া আপনাদের বলবিক্রম উত্তমরূপে অবগত হইল, এবং কাব্যরসের রসিক হইতে লাগিল, তখন শোভমান আইয়োনীয় প্রথায় উহাদিগের হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। পরে যখন তাহারা চতুর্দ্দিক জয় করিয়া সাতিশয় অর্থশালী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইল, তখন নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করীন্থীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী তাহাদের সমধিক আদরণীয়া হইল। গ্রীকেরা হর্ম্ম্য-শিল্পের যে পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়া গিয়াছে, অদ্যাপি পৃথিবীর অপর কোন জাতি তাহা অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট করিতে পারেন নাই!

(চীনীয় হর্ম্ম্য প্রণালী।)

চীনদেশীয় লোকেরা মোগল-বর্ণ-সম্ভূক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ইহারা চীন দেশে বাস করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান তাতারীয় লোকের ন্যায় পশুচারণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তাহার সন্দেহ নাই। তখন উহারা বস্ত্র বা পশুচর্ম্মাদি নির্ম্মিত তাম্বু মধ্যে অবস্থান হইত। অতএব যখন উহারা চীন দেশে স্থায়ী হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং পশুপাল্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্যুপজীবী হইল, তখন কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সকল আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিল, তাহাও অবিকল তাম্বুর ন্যায় হইল। ইহাদিগের হর্ম্ম্য-প্রণালী অদ্যাপি সেইরূপ আছে। পর্য্যাটকেরা কহেন যে, দূর হইতে কোন চীনীয় নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন কতকগুলি তাম্বু একত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যেমন বস্ত্রের চন্দ্রাতপ খাটাইয়া দিলে মধ্যস্থান নিম্ন এবং পার্শ্বভাগ উন্নত হয়, চীনীয়দিগের বাটীর ছাঁদ সকল অবিকল সেইরূপ দেখায়। মোগলজাতীয় লোকের

অনুকরণ বৃত্তি কি প্রবল!—চীনীয়েরা কত সহস্র বর্ষ হইল সমাজবদ্ধ হইয়া সভ্যরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি বনবাসী পূর্ব্ব পুরুষদিগের তাম্বুগুলি ভুলিতে পারে নাই—অদ্যাপি যেন কাষ্ঠের তাম্বু নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছে।

(গথিক হর্ম্ম্য-প্রণালী।)

অনুকরণবৃত্তি যে ককেসীয়দিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এমত নহে। অনুকরণ মনুষ্যমাত্রেরই সাহজিক ধর্ম্ম। ইউরোপের টিউটন জাতীয় লোকেরা এক্ষণে সুসভ্য এবং খৃষ্টানধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে উহারা বনচর এবং জড়োপাসক ছিল। সেই সময়ে উহারা নিবিড় বনমধ্যে পর্ণচন্দ্রাতপতলে উপবিষ্ট হইয়া অভীষ্ট দেবতার উপাসনা করিত। অতএব কেহ কেহ বলেন যে, যখন উহারা খৃষ্টান হইয়া গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই গির্জ্জা তাদৃশ বনস্থলীর অনুকরণে নির্ম্মিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের শাখায় শাখায় মিলিত হইয়া বনস্থলীর উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিলে যেরূপ দেখায়, উহাদের গির্জ্জাঘরও সেইরূপ দেখাইয়া থাকে। গথিক গির্জ্জার খিলান ঠিক গোল হয় না, খিলানের মধ্যস্থলে এক একটি কোণ থাকে, এবং বহির্ভাগের প্রাচীরগুলি বৃক্ষের ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া ঊর্দ্ধে সূচ্যগ্রবৎ হইয়া উঠে। এক প্রকার গির্জ্জার বাতায়নে যে কাচ থাকে, তাহাও নানা বর্ণে চিত্রিত হওয়াতে তন্মধ্যদিয়া ভিতরে আলোকের সম্পূর্ণ প্রবেশ হয় না। বনস্থলীতে যেরূপ অস্ফুট আলোক দর্শন হয়, ইহাও তাহারই অনুকৃতি মাত্র।

(মুসলমানীয় হর্ম্ম্য-প্রণালী।)

যেমন ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা সচেতা ছিল, পশ্চিম আসিয়ায় আরব জাতিও সেইরূপ। ইহারা প্রথমতঃ তাম্বু মধ্যে বাস করিত, পরে মহম্মদ প্রণীত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একেবারে অতীব শৌর্য্যশালী এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিল। উহারা নানা দেশ জয় করিয়া সমূহ সম্পত্তিশালী হইলে যে সকল হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ করে, তাহা চীনীয়দিগের বিরচিত তাম্বুবৎ না হইয়া অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক জাতীয়দিগের হর্ম্ম্য সদৃশ হইয়াছিল। বিশেষ এই যে, ইহারা তাম্বুর

অনুকরণে অশ্বক্ষুরাকারে খিলান নির্ম্মাণ করিত এবং যেমন তাম্বুর অন্তর্ভাগ পুষ্প লতাদি দ্বারা সুশোভিত হইত হর্ম্ম্য প্রাচীরেও সেইরূপ খোদকতার বাহুল্য করিত। অপিচ তাম্বুর বিষ্কম্ভ সমস্ত যেমন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হয়, ইহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার স্তম্ভসকলও সেইরূপ অধিক সূক্ষ্ম হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতিরিক্ত রোমীয়, টস্কান, বাইজান্‌শীয় প্রভৃতি কতিপয় হর্ম্ম্য-প্রথা আছে। কিন্তু সেই সকল প্রায়ই গ্রীক প্রথার অনুকৃতিমাত্র। অতএব উহাদিগের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। যাহা বলা হইল, তাহাতে মনুষ্য জাতির মধ্যে হর্ম্ম্যশিল্প কি প্রকারে প্রথম প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমশঃ কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বোধ হইতে পারিবে। ফলতঃ সকল শিল্পই মনুষ্যের সৃষ্ট। মনুষ্যদিগের যখন যেমন জ্ঞান, যখন যেমন প্রকৃতি, তৎসৃষ্ট শিল্পেরও উৎকর্ষ যে তখন সেইরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি।

অন্যান্য শিল্প এবং বিদ্যা-প্রণালী।

সকল দেশেই সর্ব্বপ্রথমে কবিতার সৃষ্টি হয়। তখন কবিরাই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, দর্শনবেত্তা, ভূগোলবেত্তা, ইতিহাসবেত্তা—ফলতঃ তাঁহারাই তৎকালে জনসাধারণের একমাত্র শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্টা হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সমুদায় সামান্য কবিতা বলিয়া পঠিত হয় না। ইহা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি, লৌকিক ব্যবহারের যুক্তি, আচারগত বিশেষ বিশেষ নিয়ম, পুরাবৃত্ত সম্পৃক্ত বহুবিধ প্রমাণ, সকলই জানিতে পারা যায়। আর ঐ সকল কবিতা এক্ষণকার কবিতার ন্যায় কেবল ছন্দোবন্ধে পঠিত মাত্র হইত, এমত নহে। পূর্ব্বকালে উক্ত কবিগণ অথবা তাঁহাদিগের শিক্ষিত শিষ্যেরা তান-লয়-বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে ঐ সকল কবিতা গান করিতেন। এইরূপে কবিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যা দুইই একেবারে প্রবৃত্ত হয়। এমন অসভ্য কোন জাতিই নাই, যাহাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র সঙ্গীত এবং কাব্যের চর্চ্চা দেখা যায় না। ফলতঃ ইহা-

দিগের উভয়কে ভাষার সহজাত বলিলেই হয়। কাব্য এবং সঙ্গীতের কিছু উন্নতি হইলেই চিত্রবিদ্যার আবির্ভাব হয়, এবং চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্করীয় শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে।

যে পর্য্যন্ত জাতীয় ধর্ম্ম অত্যন্ত বিভীষিকা-জনক থাকে, তাবৎকাল চিত্রের বা ভাস্করীয় কার্য্যের গুণ সমুদায় বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ক্রমে যখন কবিগণ রূপকালঙ্কারদ্বারা তাঁহাদিগের মনোগত বিবিধ ভাবের রূপ কল্পনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন শিল্পিগণ সেই সকল কল্পিত রূপের প্রতিরূপ প্রকাশ করিবার যত্ন করিতে থাকে। তাহাতে শিল্প-কার্য্যের গৌরব বৃদ্ধি হয়। কারণ, দৃষ্ট পদার্থের অবিকল অনুকরণ করিতে পারিলেই যে শিল্পের প্রাধান্য হয় এমত নহে, চিত্রপটে অথবা পাষাণময় মূর্ত্তিতে মানবের মনোগত ভাবপ্রকাশ করিতে পারিলেই শিল্পের যথার্থ তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়।

প্রাচীন জাতির মধ্যে গ্রীকেরা এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাহারা হর্ম্ম্যশিল্পে যেমন সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিল, চিত্র এবং ভাস্করীয় কার্য্যেও সেইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করে। ঐ সকল বিষয়ে অদ্যাবধি কেহই তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

অধুনা সুসভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে শিল্প শাস্ত্র মাত্রেরই বিশিষ্ট সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের মধ্যে ঐ সকল শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি সুশিক্ষা সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হয়েন না। পরন্তু তাঁহারা ঐ সকল শিল্পের যে প্রকার ভূরি ভূরি ভেদ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বর্ণনীয় নহে। এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে কবিতার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া আসিলেই প্রায় মনোবিজ্ঞান কাণ্ডের চর্চ্চা অধিক হয়। সেই সময়ে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ প্রভৃতি শাব্দিকগণও বহুসংখ্যায় প্রাদুর্ভূত হন। তাহার পর প্রকৃত ইতিবৃত্ত লিখিবার কাল উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে প্রত্যক্ষ-মূলক পদার্থতত্ত্বেরও চর্চ্চা বিস্তৃত হইতে থাকে। পদার্থতত্ত্বানুশীলন বিস্তৃত হইলেই নানা প্রকার বৈষয়িক কার্য্যে সুবিধান হইতে থাকে, এবং জনসাধারণ বিদ্যোৎসাহী হয়।

যুদ্ধ-প্রণালী।

অতি পূর্ব্বকালাবধি মনুষ্যগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যতই প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করা যায়, ততই তাৎকালিক লোকদিগের বিগ্রহানুরাগ অধিক ছিল, এইরূপ বোধ হইতে থাকে। বন্যদশায় জীবিকোপার্জ্জন করাই কঠিন। সুতরাং আপনার প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য অন্যের নিকট থাকিলে বর্ব্বরব্যক্তি যে তদধিকারীকে বিনাশ করিয়া সেই দ্রব্য লইবার চেষ্টা করিবে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে। বন্যদশায় অনুক্ষণ সেইরূপ বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। আবার সে সময়ে শাসনের পারিপাট্য ছিল না; দেশও বিস্তীর্ণ ছিল না; সুতরাং জনে জনে, কুলে কুলে, সমাজে সমাজে, যদি একবার কোন কারণে দুই পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইত, তবে সেই বৈরিতা পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিক হইয়া চলিত। প্রায়ই এক পক্ষের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ না হইলে উহার ক্ষান্তি হইত না। যখন রাজ-শাসন উত্তম না থাকে, তখন বৈরনির্য্যাতন একটী পরম ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়।

বোধ হয়, জনগণ প্রথমে প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারাই পশুবধ এবং পরস্পর যুদ্ধ করিত, তখন অন্য অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার ছিল না। ক্রমে লগুড়, কাষ্ঠময় বা শিলাময় দাত্র ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তৎকালেই কঠিন পশুরচর্ম্মদ্বারা শরীর আবৃত করাও আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

ক্রমে মনুষ্যসমাজের যেমন উন্নতি হইতে থাকে, যুদ্ধের উপকরণ সকলও তেমনি দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করে। ভূম্যধিকার সম্পন্ন ধনশালী জনগণ বর্ম্মাদি শরীরত্রাণ প্রস্তুত করাইতে এবং যানবাহনাদি রাখিতে পারেন। সামান্য দুঃখী লোকেরা তাদৃশ অর্থ ব্যয়ে সমর্থ হয় না। যুদ্ধ সেই সময় হইতে একটী ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। ভূম্যধিকারিগণ আর কোন কর্ম্মই করেন না। কেবল যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মে, অশ্ব হস্তী রথাদি-চালনে পটুতা হয়, এই সকল শিক্ষাই তাঁহাদিগের বাল্যাবস্থার একমাত্র

অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ রণদক্ষ ব্যক্তিরা যে এক এক জনে নিরস্ত্রপ্রায়, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল, শত শত সৈনিকের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বোধ হয়, এই জন্যই সকলদেশেরই প্রাচীন মহাকাব্যে তাদৃশ যুদ্ধবিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। সেই সকল কাব্যে সহস্র অত্যুক্তি থাকা স্বীকার করিলেও ঐ বিবরণ যে একেবারে অমূলক, এমন বোধ হয় না। তখন এক একজন মহারথ যে বহুসঙ্খ্যক পদাতির নিপাত করিতে পারিত, ঐ কথা মিথ্যা নহে। যে সকল দেশ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের ন্যায়, সেই সকল দেশেই রথের এবং গজের সমধিক ব্যবহার হইয়াছিল। যে সকল দেশ অপেক্ষাকৃত বন্ধুর, তথায় ভূম্যধিকারিবর্গ অশ্বশিক্ষায় নিপুণ হইয়াছিলেন। আসিয়া খণ্ডের প্রাচীন দেশ মাত্রেই যুদ্ধের প্রথা এই পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। সেনাপতি যুদ্ধকালে রথী, অশ্বারূঢ় ও গজারূঢ় যোদ্ধৃবর্গের উপরই বিশেষ লক্ষ্য করিতেন—পদাতিগণের প্রতি অধিক আস্থা করিতেন না।

গ্রীক জাতীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালীও যে প্রথমতঃ এই রূপ ছিল, তাহা হোমর বিরচিত মহাকাব্য পাঠেই প্রতীত হয়। কিন্তু গ্রীকেরা অতি শীঘ্রই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। তাহা করাতে ভূম্যধিকারিবর্গের সম্মানের লাঘব হইল। প্রজামাত্রেই ভূম্যধিকারী হইতে লাগিল। সুতরাং তাহাদিগের দশা নিতান্ত দরিদ্র না থাকায় সকলেই যুদ্ধের সজ্জা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল। বিশেষতঃ গ্রীসদেশ অত্যন্ত পর্ব্বতময়; তাহা অশ্বারূঢ় সৈন্যের পক্ষে বিশেষ বিক্রমের স্থল নহে। অতএব তথায় অশ্বারোহিগণ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত এবং পদাতিকগণ অধিক সম্মানিত হইয়াছিল। যে স্থানে পদাতি সৈন্যের সমাদর, তথায় রাজ্যশাসনপ্রণালীও নিতান্ত যথেচ্ছাচার বিদূষিত হইতে পারে না।

রোমও স্বতন্ত্র-প্রজ দেশ ছিল। তথায় পদাতিক সৈন্যেরও সমধিক আদর ছিল। গ্রীক এবং রোমীয় পদাতি সৈন্যের সহিত সংগ্রামে তাৎকালিক কোন জাতীয় লোকেই জয়লাভ বা সমকক্ষতা করিতে পারে নাই। যাহারাই ঐ দুই জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই

পরাজিত এবং যেমন অনলে তূলারাশি দগ্ধ হয় তদ্রূপ, অত্যল্পকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যেও যুদ্ধ প্রণালী অবিকল এইরূপ হইয়া আসিতেছে, দেখা যায়। যাবৎ উহাদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারিবর্গের প্রাধান্য ছিল, তাবৎকাল পদাতি সৈন্যের যথোচিত আদর ছিল না। ক্রমে যেমন শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ হইতে লাগিল, অমনি পত্তিগণেরও মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইল।

পদাতির সমধিক গৌরব হইলে সমরপ্রণালীর আরও একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। সকল রাজ্যেরই প্রথমাবস্থায় প্রজাগণ শান্তিকালে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে শস্ত্রধারী হইয়া রণস্থলে যায়। তৎকালে ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব ভূম্যধিকার হইতে ঐ সকল সেনা লইয়া গিয়া রাজার সহায়তা করেন। কিন্তু রাজ্য বিস্তীর্ণ এবং ভূম্যধিকারিগণ খর্ব্বগৌরব হইলে আর এইরূপ থাকে না। তখন রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি ভৃতিভুক্ সেনা নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। তাহারা রাজকোষ হইতে ভৃতি প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র যুদ্ধ ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। এক্ষণে ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রকার হইয়াছে। অপরন্তু তথায় প্রজা সাধারণের মধ্যেও যুদ্ধ বিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে। ইউরোপের এক একটী রাজ্য যেন এক একটী প্রকাণ্ড সৈনিকাবাস হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধবিদ্যা একটী প্রধান বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত। পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়নাদি বিবিধ শাস্ত্র, শস্ত্রবিদ্যার সহকারী হইয়াছে। কোন অসভ্য জাতির এমত সামর্থ্য নাই যে, নব্য ইউরোপীয়দিগকে পরাভূত করিতে পারে। কিন্তু যেমন বিদ্যাবাহুল্যপ্রযুক্ত এক্ষণে যুদ্ধের কৌশল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি শান্তিগুণেরও প্রাদুর্ভাব হওয়াতে যুদ্ধের অনেকানেক ভয়ঙ্কর দোষের পরিহার হইয়াছে। এক্ষণে ইউরোপীয়-দিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধের সময়ে বালক, বৃদ্ধ, বনিতাগণের প্রতি প্রায় অকারণে অত্যাচার করা হয় না—শত্রু শরণাপন্ন হইলে প্রায় তাহার প্রাণনাশ করা হয় না। কোন পরাজিতরাজ্যের প্রজাগণকে দাসত্ব

শৃঙ্খলে বদ্ধ করা হয় না এবং কোন কোন সদাশয় ব্যক্তির মনে এমন ভাবোদয়ও হইয়াছে যে কোনরূপে যদি জাতীয় বিবাদ সমস্ত শালিসীর দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়া একেবারে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়।

ধর্ম্মপ্রণালী।

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ সংস্কারমূলক। কোন দেশে কোন কালে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহার মনে অতি শৈশবাবধিই এই জ্ঞানের অঙ্কুর দেখিতে না পাওয়া গিয়াছে। আর যদিই এমত কেহ থাকে, তবে তাহার তাদৃশ অবস্থা মানসিক পীড়ার মধ্যে গণ্য করা আবশ্যক। যাহা কিছু দেখি তাহারই মূলানুসন্ধানে সকলেই প্রবৃত্ত হই। বিনা কারণে কিছু হইয়াছে বলিলে কদাপি বিশ্বাস করি না।

যেমন কার্য্যকারণের অনুসন্ধান করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃতি-সিদ্ধ, তেমনি যাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারা যায়, তদবলোকনে বিস্মিত এবং চমৎকৃত হওয়াও মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্থলবিশেষে ঐ বিস্ময়, ভয় ও ভক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব করে। সেই ভাবের নাম "আরাধনা" এবং ঐ ভাব যাহাকে লক্ষ্য করিয়া উদিত হইয়া থাকে সেই "আরাধ্য বস্তু"। যদি আরাধ্য বস্তুর স্থানে কোন অভিপ্রেত যাচ্ঞা করা যায়, তাহা হইলে উহার পূজা করা হয়। এই ভাবপরিশূন্য মনুষ্য কোথাও কখন জন্মে নাই। ইহাই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। অতএব যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আমাদিগের শরীরধর্ম্ম, তেমনি ধর্ম্মানুষ্ঠানও আমাদিগের মানসিক-প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু যাহার যেমন বুদ্ধি, যেমন জ্ঞান, তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও তেমনি বিশুদ্ধ অথবা মলীমস হইয়া থাকে। এই নিয়মের কদাপি অন্যথাভাব ঘটিতে পারে না। পুরাবৃত্তানুসন্ধান দ্বারা বিভিন্নদশাপন্ন ব্যক্তিদিগের

মধ্যে যে যে প্রকার ধর্ম্মপ্রণালীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

প্রাকৃতিক ব্যাপার সমস্ত যত অধিক পর্য্যবেক্ষিত হয় ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটী কারণ হইতে বহুবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই এক একটী কারণকে পণ্ডিতেরা 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলিয়া অভিহিত করেন। নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিলেই বোধ হয়, যেন ঐ সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। উহাদিগের নিয়ম প্রকাশের পূর্ব্বেও ঐ সকল ব্যাপার যেমন বুদ্ধির অগম্য ছিল, নিয়ম প্রকাশ হইলেও উহারা সেইরূপ থাকে। নিয়ম জানাতে কেবল আপনাদিগের কার্য্যের কতক সুবিধা হয়, এই মাত্র লাভ। কিন্তু যখন প্রাকৃতিক ব্যাপারের সমধিক অনুসন্ধান না হইয়াছে, তখন প্রত্যেক প্রকৃতি-কার্য্যই অতি অদ্ভুত রসাস্পদ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা দহন হইতেছে, আলোক দ্বারা প্রকাশ হইতেছে, মেঘ হইতে বারি পড়িতেছে, ইত্যাদি যাবৎ ব্যাপারই নিতান্ত বিস্ময়জনক হয়। অদ্যাপি ঐ বিস্ময়ের যে সম্পূর্ণরূপ অপগম হইয়াছে তাহাও নহে; কিন্তু এক্ষণে জনগণ উহাদিগের এক একটী নিয়মরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। তখন ঐ সকল নিয়মের নামও জানা ছিল না। সুতরাং অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া উক্ত কার্য্যসমুদায়ে অবিচন্তনীয় বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা হইত। ঐ সকল শক্তির উপাসনাই মনুষ্যদিগের আদিম ধর্ম্ম। এই আদিম-ধর্ম্ম এক্ষণে 'জড়োপাসনা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যখন জড়োপাসনার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন উপাসকেরা স্ব স্ব দেবশরীরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এইরূপ বোধ করিয়া থাকে। যে জল বা অগ্নি তাহারা সম্মুখে দেখে, তাহাকেই মূর্ত্তিমদ্দেবতাবিশেষ ভাবে। কিন্তু অতি শীঘ্রই এই বুদ্ধির কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়। সকল জলই এক, সকল অগ্নিই এক, সকল মৃত্তিকাই এক—ইত্যাদি জ্ঞান উপস্থিত হইলে, ঐ সকল ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও একজন আছেন, এমত বোধ হইতে থাকে। তখনকার ধর্ম্মপ্রণালীকেও জড়োপাসনা

বলা যায়, কিন্তু ইহা প্রথমকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। ইহাতে পূজাকালীন দেবতার আবাহন এবং পূজাবসানে বিসর্জ্জন আবশ্যক হয়। সুতরাং ইহাকেই নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। ঐ কাল হইতে গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের উপাসনা প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। মর্ত্তের বায়ু, জল, মৃত্তিকা, বহ্নি অপেক্ষা ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যে অবশ্য উৎকৃষ্ট তাহার কোন্ সন্দেহ হয় না। বিশেষতঃ, আলোকের সহিত জীব মাত্রের এমত সম্বন্ধ যে, তদ্দর্শনেই সকলে পুলকপূর্ণ হইয়া উঠে। সূর্য্যের প্রকাশে যেন জগতে পুনর্জীবন্যাস হয়। অতএব প্রথমাবধিই আলোকের সহিত জীবনের বিশিষ্ট সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সূর্য্যাতপ সংযোগে পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয়, ফল সকল পরিণত হয়, শৈত্য নিবারিত হয়, অতএব সূর্য্য মনুষ্যের যেমন হিতকারী, এমন আর কেহই নাই। যাজকেরাও ঐ সময় হইতে জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করেন। সুতরাং জ্যোতিষ্ক উপাসনাই এই সময়ে পরম ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

এই ধর্ম্মপ্রণালী পূর্ব্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইহাতে সাকার উপাসনা হয় বটে, কিন্তু ইহার উপাস্য পদার্থ, দূরবর্ত্তী অবিনশ্বর ও হিতকারী বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব ইহাদের উপাসনাধীন চিত্ত বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। ইহাই জগৎপাতা ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় সোপান।

মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান এই পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিলেই ক্রমে ক্রমে আর একপ্রকার উপাসনার আরম্ভ হয়। মানবগণ জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির শক্তি সমুদায় স্ব স্ব বুদ্ধির অগম্য দেখিয়া তৎসমুদায়কে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন, কিন্তু জীবন পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চমৎকার-জনক। জীবন কি? কেহই এই প্রশ্নের সমগ্র উত্তর প্রদানে সমর্থ নহেন।

অতএব সর্ব্বস্থলেই জড়োপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণী-উপাসনারও আরম্ভ হইয়া থাকে। তখন যত প্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দৃষ্ট হয় সকলেতেই কোন গুহ্য দেব-শক্তি বর্ত্তমান আছে এমত প্রতীত হয়। বিশেষতঃ যে সকল জীব মনুষ্যের অধিক হিতকারী, অথবা বিশিষ্ট শক্তি-সম্পন্ন তাহাদিগের উপাসনায় সমধিক গৌরব হয়।

এইরূপ প্রাণিপূজা এবং পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্কপূজা, উভয়পূজা কিছু কাল একত্রিত হইলেই উপাসনার আর একটী নূতন প্রণালী জন্মে। যে সকল ব্যক্তি সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রু জয় করেন, অথবা প্রয়োজনোপযোগী শিল্প নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া দেবতা বলিয়া পূজ্য হন। এইরূপে মনুষ্যোপাসনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্ব প্রণালীর সংযোগ রাখা আবশ্যক। এই হেতু প্রথম প্রথম যে সকল মনুষ্য দেবতা বলিয়া পূজিত হন, তাঁহারা প্রায়ই জ্যোতিষ্কদিগের নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাও সাকার উপাসনা বটে কিন্তু ইহার বিষয়ীভূত যে সকল পদার্থ তাহারা চিজ্জড়াত্মক, কেবল জড়মাত্র নহে। অতএব ইহা চিন্ময় ব্রহ্মোপাসনার তৃতীয় সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মনুষ্যোপাসনার আরম্ভ হইয়া সভ্যাবস্থার উন্নতি হইলে যখন শত্রুজয় এবং শিল্পনির্ম্মাণ মাত্র মনুষ্যের প্রয়োজনীয় থাকে না, সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মোপদেশই সমধিক আবশ্যক বোধ হয়, তখন যে সকল মহাত্মা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশ করেন তাঁহাদিগকে এই সকলের অপেক্ষাই বড় বলিয়া বোধ হয়। জল, বায়ু, বহ্নি অতি আশ্চর্য্য পদার্থ, জ্যোতিষ্কগণ তদপেক্ষাও অধিক চমৎকারজনক, জীবন আরও রহস্য বস্তু, বৈষয়িক সুখ দুঃখের ব্যাপার সকলের চিত্তাকর্ষক, কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান যেমন অতীব গুহ্য এবং বিস্ময়জনক এমত আর কিছুই নাই। অতএব যাঁহারা মূর্ত্তিমৎ জ্ঞানস্বরূপ তাঁহারা যে নরগণের অবশ্য পূজ্য হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তাঁহারা চিন্ময় ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। এই অবস্থায় যে ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত হয় তাহার নাম অবতারোপাসনা। অবতার উপাসনা আরম্ভ হইলে মনুষ্যদিগের দিন দিন ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় হয়। কারণ উক্ত অবতারেরা নরজাতির সমীপে চিন্ময় ঈশ্বরের প্রতিরূপস্বরূপে পরিচিত হয়েন; এবং ঐ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জনগণ ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারে।

মনুষ্যের মন কার্য্য কারণ সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্মদর্শনক্ষম হইলে উহাতে ক্রমশঃ দ্বৈতভাবের হ্রাস হইয়া অদ্বৈতবাদ গ্রহণে উন্মুখতা জন্মিতে

জন্মিতে থাকে। অদ্বৈতবাদী ভক্তিপরিষিক্তহৃদয়ে জড়জগৎকেও সেই একমাত্র অদ্ভুতময় শক্তি হইতে অভিন্ন দেখিতে চেষ্টা করেন এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সেই চিন্ময় পরমেশ্বরকে আপনাতেই দেখিতে পান।

এই বিষয়োপলক্ষে আরও একটী কথা বক্তব্য আছে। ধর্ম্মপ্রণালীর পরিবর্ত্তন হইলে কোথাও পূর্ব্বপ্রথা একেবারে অপ্রচলিত হইয়া যায় না। পূর্ব্ব ধর্ম্মের সহিত পর ধর্ম্মটীর সংযোগ হইয়া কিছুকাল দুইই এক সময়ে চলিতে থাকে। ক্রমে দ্বিতীয়টীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ হয়, প্রথমটী তাদৃশ প্রবল থাকে না। যেমন বালকদিগকে প্রথমে বর্ণমালা পড়াইতে হয়, তাহার পর তাহারা বানান ফলা প্রভৃতি শিখে, কিন্তু সেইগুলি শিখিবার সময় যে বর্ণমালা ভুলিয়া যায় এমত নহে, বস্তুতঃ ঐ বর্ণমালা শিক্ষা হইয়াছে বলিয়াই তাহারা অপরগুলি শিখিতে পারে। ধর্ম্মশিক্ষাতেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। জড়োপাসনার পর জ্যোতিকমণ্ডলীর উপাসনা আরম্ভ হয়, পরন্তু তৎকালে জড়োপাসনাও একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। প্রত্যুত জড়োপাসনাধীনা উপাসনায় যেরূপ সমস্ত বিধির শিক্ষা হইয়াছে, জ্যোতিষ্ক উপাসনায় সেই সকল বিধিই প্রচলিত হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে।

মনুষ্যের পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ।

মনুষ্যজাতির ইতিবৃত্ত বিষয়ে প্রাচীন এবং নব্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে একটী বিশেষ মতভেদ আছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্য জাতির অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, ক্রমে কালসহকারে সেই অবস্থা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা এই মতের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন না। ইহাঁরা বলেন, মনুষ্য আদিমাবস্থায় কি ধর্ম্মজ্ঞানে, কি সমাজ বন্ধনে, কি উপভোগ্য-সাধনে সকল বিষয়েই অতি হীনদশাপন্ন থাকে, ক্রমে অতি সুদীর্ঘকালে নানা বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া অল্পে অল্পে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত সকল বিষয়েই উন্নতিলাভ করে। যেমন শিশুদিগের কোন জ্ঞান এবং কোন ক্ষমতাই থাকে না, সেইরূপ

আদিম অবস্থায় মনুষ্যজাতিরও জ্ঞান এবং ক্ষমতার অভাব থাকে। শিশু-মাত্রেই যেমন অল্পে অল্পে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করে, মনুষ্যজাতিও সেইরূপে সকল বিষয় শিখিয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান বর্ব্বর দশাপন্ন বন্য লোকদিগের মধ্যেই মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। যে সকল প্রাচীন পণ্ডিতেরা মনুষ্যের আদিম অবস্থার উৎকর্ষের বর্ণন করেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, অতি-মনুষ্য-শক্তি-সম্পন্ন দেবাদিই মনুষ্যগণের আদিম শিক্ষক। তাঁহাদিগের মতে, প্রথমে দেবতারাই মনুষ্যদিগকে ভাষা এবং লিপিকর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয় শিখাইয়াছিলেন। সেই সময়ে মনুষ্যের সহিত দেবগণের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠরূপই হইত, সুতরাং তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান এবং সুখের যৎপরোনাস্তি আতিশয্য ছিল।

পরস্পর অতিবিরুদ্ধ এই দুইটী মতবাদের মধ্যে নব্য পণ্ডিতদিগের মতটীই বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিতে হয়। অপর মতটী বুঝিবার নিমিত্ত তেমন কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। অমুক দেবতা অমুক জাতীয় জনগণকে অমুক বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন—একথা বলিলে কেমন করিয়া শিখাইয়াছিলেন, কেন শিখাইয়াছিলেন, কখন কাহাকে শিখাইয়াছিলেন, এ সকল প্রশ্নের স্থল প্রায়ই থাকে না। দেবতাদিগের প্রবর্ত্তিত প্রণালী, তাঁহাদের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ এবং সেই অনুগ্রহনিগ্রহাদির কালাকাল—এ সকল বিষয় মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ব্যাপার, সুতরাং এসকল কথা বিচারের বিষয় নহে। আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করা মনুষ্যের স্বভাব। সেই স্বভাবানুযায়ী হইয়াই ঐ সকল বিবরণে প্রতীতি স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, মনুষ্যেরা আপনা হইতেই অল্পে অল্পে সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছে—তাঁহাদিগের কথাগুলি বুঝিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা না করিলে, কোন ক্রমেই বুঝিতে পারা যায় না। যে দিকে দৃষ্টি করা যাউক, পশ্বাদির সহিত তুলনায় মনুষ্যের উন্নতি এত অধিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় যে, সেই উন্নতির আরম্ভ এবং চরমসীমা ত নির্দ্দিষ্ট হইতেই পারে না; তাহার ক্রম নিরূপণ করাও বিলক্ষণ দুরূহ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

কিন্তু উন্নতির ক্রম নিরূপণ করা যদিও দুরূহ ব্যাপার বটে, তথাপি পণ্ডিতদিগের ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি, মনুষ্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে অনেক প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রাকৃতিকশক্তির প্রভাবে বিভিন্ন মনুষ্য-সমাজে উন্নতি বা অবনতিসাধন হইতেছে, কস্মিন্ কালেও তদর্থ অপর কোন শক্তির প্রয়োজন হয় নাই। এখনও যে সকল কারণের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইতেছে, সকল সময়েই সেইরূপ কারণেরই কার্য্য হইয়া আসিয়াছে।

যুগভেদের পর্য্যায়ক্রম।

প্রাচীনদিগের মতে পৃথিবীতে চারিটী যুগ হইয়াছে এবং সেই সকল যুগভেদ সমস্ত পৃথিবীতে এক একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিয়াছে। তাঁহাদিগের মতে প্রথম যুগটী অতি উৎকৃষ্ট—উহা সুবর্ণকাল। ঐ সময়ে নরগণ স্বর্ণ-পাত্রে ভোজনাদি করিত। তাহার পরে রজতযুগ। ঐ সময়ে রৌপ্য পাত্রাদির ব্যবহার। তদনন্তর তাম্রযুগ—তাম্রপাত্রাদির বহুল প্রচার। সর্ব্বশেষে লৌহযুগ এবং লৌহবিনির্ম্মিত পাত্রাদির প্রচলন।

নব্য পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নরগণ বিভিন্নরূপ উপাদানের দ্বারা আপনাদিগের প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পৃথিবীর যে সকল অতি নিম্নবর্ত্তী স্তরে মনুষ্যের কঙ্কাল, আবাস-গর্ত্ত, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়াছে যে, ঐ সকল যন্ত্র এবং অস্ত্রাদির অধিকাংশই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই জন্য সেই আদিম সময়কে প্রস্তরযুগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা ইহাও দেখিয়াছেন যে, ঐ প্রস্তরযুগ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক সময়ে প্রবৃত্ত হয় নাই। কোন কোন স্থানে, (যথা ফিজি দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে এবং ভারতবর্ষেরও দুই একটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে) ঐ যুগ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ ঐ সকল স্থানের লোকেরা এখনও প্রস্তরবিনির্ম্মিত

অস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার করে—কোন প্রকার ধাতব দ্রব্য হইতে অস্ত্র বা শস্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিতে জানে না। প্রস্তরবিনির্ম্মিত অস্ত্রাদির মধ্যেও একটী বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচীন, তাহা প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বা চিরিয়া নির্ম্মিত। যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সেগুলি ঘর্ষণের দ্বারা সুপরিষ্কৃত। প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রাদিতে এই প্রভেদ নিরীক্ষণ করিয়া পণ্ডিতেরা প্রস্তরযুগটীকে দুইটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেন। তাহার একটীর নাম ঊর্দ্ধতন-প্রস্তরযুগ, অপরটীর নাম অধস্তন প্রস্তরযুগ। ঐ উভয় যুগেই কাষ্ঠ, শৃঙ্গ এবং অস্থি হইতেও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত। ঐ সময়ে, বিশেষতঃ অধস্তন প্রস্তরযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যেরও কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার আরব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ধাতব দ্রব্যের মধ্যে তাম্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। উহা প্রায়ই ভূগর্ভে অতি গভীরভাবে নিহিত থাকে না এবং অনেকানেক স্থলে উহা অবিমিশ্র অবস্থাতেও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কোন কোন দেশের ভাষায় উহা লোহিতপ্রস্তর নামেই খ্যাত। অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কঠিনতম প্রস্তরের অন্বেষণ করিতে করিতেই নরগণ তাম্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং তাম্রকে এক প্রকার প্রস্তর বলিয়াই মনে করিয়াছিল। পরে উহারা উহার বিশেষ গুণ জানিতে পারে। প্রথমে অবিমিশ্র বৃহৎ বৃহৎ তাম্রখণ্ডকে প্রস্তর দ্বারা পিটিয়াই প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রস্তুত হইয়াছিল, পরে তামা গলাইয়া লইবারও উপায় আবিষ্কৃত হইয়া উঠে। ফলতঃ প্রস্তরযুগের পরেই যে একটি তাম্রযুগ দেখা দিয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে। পরন্তু তাম্রযুগ সমধিককাল স্থায়ী হয় নাই। যখন তামা গলাইয়া ঢালিয়া লইবার উপায় উদ্ভাবিত হয়, তখন মনুষ্যের বিষয়জ্ঞতা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তখন অপর একটী ধাতু যথা রাঙ্গ বা টিন পাইলে তাহাকে তামার সহিত মিশাইয়া একটী মিশ্রধাতুর উৎপাদন করা আর তত কঠিন কার্য্য হয় নাই। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ তামা অধিক নমনীয়। তাহা হইতে যে অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, তাহা তেমন কঠিন বা তীক্ষ্ণধার হয় না। এই জন্য তামাকে সমধিক কঠিন করিয়া লইবার প্রয়োজন স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তামা এবং রাঙ্গের

মিশ্রণে যে ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহার ইংরাজী নাম 'ব্রন্‌জ'। বাঙ্গালায় উহাকে পিত্তল বলে—আর তামা এবং দস্তার মিশ্রণে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেও পিত্তল বলা যায়। যে সময়ে নরগণের মধ্যে পিত্তল বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদির বহুল ব্যবহার, সেই সময়টীকে পৈত্তলযুগ বলা গিয়া থাকে।

পৈত্তলযুগটী তাম্রযুগের ন্যায় স্বল্পকালস্থায়ী হয় নাই। পিত্তলযুগের উদাহরণস্থল অতি বিস্তৃত। প্রাচীন গ্রীকেরা মহাকবি হোমরের সময় পর্য্যন্ত পিত্তল বিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদির সমধিক ব্যবহার করিত। রোমীয়-দিগের মধ্যেও পিত্তলমণ্ডিত ঢাল সমধিক প্রচলিত ছিল।

কিন্তু ঐ দুই জাতীয় লোকেরা এবং মিসরীয়, ফিনিকীয়, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন জাতীয়েরা যে কেবল পিত্তলেরই ব্যবহার জানিত এমত নহে। উহারা সকলেই লৌহ ধাতুর গুণও জানিতে পারিয়াছিল। অতএব উহাদিগের সময় হইতেই পিত্তলযুগের পরবর্ত্তী যে লৌহযুগ, তাহার আবি-র্ভাব হইয়াছিল, এমন বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ঐ লৌহযুগ এখনও চলিতেছে। লৌহের অপেক্ষা মনুষ্যের অধিকতর প্রয়োজনোপযোগী অপর কোন ধাতু এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান ধাতু পিত্তলযুগের পূর্ব্ব হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল ধাতু শোভাসম্বর্দ্ধনের এবং ধন সঞ্চয়ের যেমন উপযোগী, মনুষ্যের অপর কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন সাধনে তাদৃশ উপযোগী নহে। ঐ প্রকার ধাতুর আবিষ্কার প্রাকৃতিক শক্তির উপর মনুষ্যের প্রভুতা সম্বর্দ্ধনের হেতু-ভূত হইয়া যুগভেদের প্রবর্ত্তন করিতে পারে না।

বিজ্ঞানবিৎ নব্য পণ্ডিতদিগের এই যুগ পর্য্যায়ের বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে,মনুষ্যের আদিম অবস্থা অতি অপকৃষ্ট—সেই অবস্থা হইতে মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে যেমন কাষ্ঠময় লগুড়াদি হইতে কঠিনতর প্রস্তর, প্রস্তর হইতে তাম্র, তাম্র হইতে পিত্তল এবং পিত্তল হইতে লৌহের ব্যবহার দ্বারা উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে,তেমনি সর্ব্ব বিষয়েই আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে।

নানা দেশে বিশেষতঃ ইউরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডে, নব্য পণ্ডিতেরা সুগভীর ভূগর্ভ নিহিত নর-কঙ্কাল সকল পরীক্ষা পূর্ব্বক বলেন যে,যত পূর্ব্ব

কালে যাওয়া যায়, মনুষ্য ততই খর্ব্বশরীর, ক্ষুদ্রশিরস্ক এবং স্বল্পবলশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের মতে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে দীর্ঘায়ত, দীর্ঘশিরস্ক এবং দীর্ঘায়ু মনুষ্যের সঞ্চার হইয়াছে।

অগ্নি-ব্যবহার, রন্ধন এবং পাত্রাদি-গঠনের পর্য্যায়ক্রম।

প্রস্তর যুগেরও বহু পূর্ব্বে অবশ্যই এমন একটী সময় ছিল যখন পশ্বাদির ন্যায় মনুষ্যেরাও অগ্নির কোন ব্যবহার জানিত না। কিন্তু সেই অনগ্নিক দশায় মনুষ্যের যে কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা মনে মনেই অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে হয়, তাহার কোন উদাহরণ স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পর্য্যটকেরা দ্বীপনিবাসী কোন কোন বর্ব্বর দশাপন্ন লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন বটে, যে তাহারা অগ্নির ব্যবহার জানে না। কিন্তু তাঁহাদের সে কথার যাথার্থ্য বিষয়ে তেমন প্রমাণ নাই। আর ভূগর্ভনিহিত প্রাচীনতম মনুষ্যবাসের মধ্যেও সর্ব্বত্রই কাষ্ঠদহনজাত অঙ্গারাদিরূপ অগ্নি ব্যবহারের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যেরা যে সময়ে অগ্নির ব্যবহার জানিত না, সে সময়ের কোন চিহ্নই এক্ষণে বিদ্যমান নাই। সে সময়ে নরগণ নিতান্ত পশুভাবাপন্নই ছিল।

কিন্তু অগ্নির প্রয়োজন এত অধিক, উহা প্রাপ্ত হইবার উপায়ও এত অধিক এবং উহার ব্যবহার করিতে পারিলে এত বিঘ্ন বিপত্তির নিবারণ এবং কার্য্যের সুবিধা হয় যে, মনুষ্যের বুদ্ধি শক্তির প্রথম উন্মেষ মাত্রেই যে অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথমে মনুষ্যেরা স্বইচ্ছাতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত করিতে পারে নাই। এই জন্য তাহারা অতি যত্নপূর্ব্বকই অগ্নির রক্ষা করিত, পরে কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনন্তর অরণিযন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ উহার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় অগ্নি উৎপাদনের পরিশ্রম লঘু হইয়া আইসে। তাহার পর লৌহ এবং প্রস্তরের পরস্পর সংঘাতে অগ্নি উৎপাদনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া গেলে অরণি-যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হয়। পরে লুসিফর

শলাকা উদ্ভাবিত হইয়া চক্‌মকির স্থান গ্রহণ করে এবং চক্‌মকির ব্যবহার প্রায় উঠিয়া যায়।

অগ্নির ব্যবহার অবগত হইলেই ইতর জন্তু হইতে মনুষ্যের পার্থক্য বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকে। ইতর হিংস্র জন্তু মাত্রেই অগ্নিকে ভয় করে এবং যেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিতে পায়, সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করে। সুতরাং অগ্নির ব্যবহারের আরম্ভ মাত্রেই মনুষ্যের আবাস গুলি অনেকটা ভয় এবং বিঘ্নশূন্য হইয়া উঠে। প্রস্তরযুগে মনুষ্যদিগের অস্ত্র শস্ত্রাদি ভাল থাকে না। অগ্নির ব্যবহার শিখিয়া মনুষ্যেরা অগ্নি দ্বারাই উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারে। বড় বড় কাঠ কাটিয়া তাহার অন্তর্ভাগ খুদিয়া ডোঙ্গা প্রস্তুত করা অগ্নির সাহায্যে অল্পায়াস এবং অল্পকাল সাধ্য হইয়া যায়। তাম্রাদি ধাতু হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যন্ত্র এবং পাত্রাদি নির্ম্মিত হয়, অগ্নির দ্বারা ঐ সকল ধাতুকে গলাইয়া তাহা সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। আর আম মাংস মৎস্যাদি ভক্ষণ করিবার যে রীতি প্রচলিত থাকায় মনুষ্যের বুদ্ধি এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পাইত না, অগ্নির ব্যবহার আরব্ধ হইলে সেই রীতি ক্রমশঃ রহিত হইয়া যায় এবং খাদ্য সামগ্রীর প্রকারভেদ, স্বাদুতা এবং উপকারিতা বর্দ্ধিত হইয়া নরগণকে সুখী, সুধী এবং শান্তশীল করিয়া তুলে।

পাক করিয়া খাওয়া এক্ষণে মনুষ্যের একটী বিশেষ ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। রন্ধনের প্রকারভেদ এবং তাহার কৌশল এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সুপকারিতা একটী বিশেষ বিদ্যা এবং ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অগ্নির ব্যবহার যখন প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন পাকের এত পারিপাট্য হয় নাই। তখন খাদ্য সামগ্রীকে অগ্নিতে পোড়াইয়া লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। তাহার পর, অগ্নির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ব্যতিরেকে শূল্যাদি প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। তদনন্তর খাদ্য দ্রব্য উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সে সময়ের সিদ্ধ করিবার রীতি এক্ষণকার রীতি হইতে স্বতন্ত্র। তখন হাঁড়ি কলসী মালসা প্রভৃতি মৃৎ পাত্রের এবং কড়া, বাঁটুলা, বহগুণা প্রভৃতি ধাতু পাত্রের কিছুরই সৃষ্টি হয়

নাই। তখন ভূমি মধ্যস্থ গর্ত্তে, অথবা মৃগয়ালব্ধ পশুর চর্ম্মে, কিম্বা গাছের ডাল কাটিয়া তাহার চেয়াড়ির দ্বারা নির্ম্মিত চুপড়িতে অথবা বৃহদাকার শম্বুকাদির কিম্বা বৃহৎ বৃহৎ ফলের খোলায়, তরল পদার্থ ধারণের উপযোগী পাত্র প্রস্তুত হইত। ঐ সকল পাত্রের কোনটীতেই অগ্নির জ্বাল দিবার যো নাই। এই জন্য তখনকার লোকেরা কোন দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইলে, ঐরূপ কোন্ পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে সেই দ্রব্যটী রাখিয়া অন্য স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিত এবং সেই অগ্নিতে উপলখণ্ডাদি উত্তপ্ত করিয়া ঐ পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে জল গরম হইয়া উঠিত এবং সেই জলে খাদ্য দ্রব্যটী এক প্রকার সিদ্ধ হইত। এরূপ করিয়া সিদ্ধ করিতে অনেক সময় যায় এবং অনেক পরিশ্রম হয়। সুতরাং ইহার প্রতি বিধানের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টাই হইতে থাকে। প্রথমে প্রস্তর দ্বারাই জ্বালসহ পাত্রের নির্ম্মাণ চেষ্টা হয়। পরে চেয়াড়ি অথবা পশুচর্ম্ম কিম্বা শম্বুক অথবা ফলের খোলায় যেসকল পাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহার তলায় খুব পুরু করিয়া মাটির লেপ দিয়া উহাদিগকে জ্বালসহ করা হয়। এইরূপ করিতে করিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, শুদ্ধ মাটি হইতেও তদ্রূপ পাত্রের গঠন হইতে পারে। মাটির পাত্রকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়াই প্রথম ব্যবস্থা, তাহার পর তাহাকে পোড়াইয়া লইবার রীতিও প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়। কুম্ভকারের ব্যবসায়ের এইরূপে অল্পে অল্পে উদ্ভব হইয়াছে। এদেশে উহা এই পর্য্যন্তই উন্নতি লাভ করিয়াছে। চীনের বাসন প্রস্তুত করা এবং সে সকল বাসন চিত্রিত ও অতি দিব্যগঠন করা কুম্ভকারব্যবসায়ের চরম উন্নতি।

অগ্নির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে নরগণের যে সকল সৌকর্য্য সাধিত হইয়া গিয়াছে, বারুদের এবং বাষ্পীয় কলের সৃষ্টি হইয়া অবধি তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এক্ষণে আগ্নেয় অস্ত্রের প্রভাবে মনুষ্য সর্ব্বজয়ী হইয়াছেন। মনুষ্য মনে করিলেই অন্য যে কোন জীব হউক তাহার ধ্বংসসাধন করিতে পারেন। শুদ্ধ অন্য জীব নহে, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার না জানে এমত কোন্ নরজাতিও আর আগ্নেয়াস্ত্রধারীর প্রতিদ্বন্দী হইতে পারে না। বাষ্পীয় কলের সহকারিতা

লব্ধ হওয়াতে মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক শক্তি সকলের সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, বারুদের এবং বাষ্পীয় ও তাড়িতযন্ত্রের আবিষ্কার পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

ভাষার পর্য্যায়ক্রম।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নরগণের প্রাকৃতিক বর্ণভেদের অনুসারে কোন্ কোন্ মূল ভাষা ছিল, ইহা যেমন স্পষ্টরূপে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ভাষার প্রথম সৃষ্টি বিষয়ে তেমন কোন বিশুদ্ধ নিয়ম এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনদিগের মধ্যে একটী দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী নরজাতিসমূহ একমাত্র আদিম মনুষ্যদম্পতী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তেমনি একমাত্র মূল ভাষা হইতে সর্ব্ব প্রকার ভাষারও উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বকালের কোন কোন রাজা সেই মূল ভাষা কি, তাহার নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রকার পরীক্ষাবিধান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মিসরের কোন রাজা সদ্যোজাত দুইটী শিশুকে একটী মূক ধাত্রীর হস্তে পালনার্থ সমর্পণ করিয়া রাখেন। পরে তাহারা সর্ব্বাগ্রে যে ভাষার শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা শুনিয়া স্থির করেন যে, ফ্রিজীয় ভাষাই সকল ভাষার মূল। শুনা যায়, স্কট্লণ্ডের কোন রাজা অবিকল ঐরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, হিব্রুভাষাই সকলের মূল ভাষা! মোগল সম্রাট্ আকবর সাহ আগরা নগরের সন্নিহিত কোন স্থানে চারিটী সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া কয়েক জন মূক ধাত্রীর দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, শিশুরা কি মৌলবী, কি পণ্ডিত, কি পাদ্রি কাহার পরিজ্ঞাত কোন ভাষার শব্দই উচ্চারণ করে না—কেবল হাত পা নাড়িয়া এবং নানাপ্রকার মুখ-ভঙ্গী করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে অপরিস্ফুট শব্দ করিয়া আপনাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পারে।

আকবর সাহের অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা বিধানের বিবরণ সত্য হউক বা না হউক, ইহার মধ্যে একটী প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে। মনুষ্যেরা প্রথমতঃ অঙ্গভঙ্গী দ্বারাই আপনাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করে। সেই সকল অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত,যেমন পশ্বাদিরও হইয়া থাকে, তেমনি মনুষ্যেরও মুখবিবর হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ শব্দ নির্গত হয়। যে প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী এবং শব্দ একই সময়ে উদ্‌ভূত হয়, তদুভয়ই একই ভাবব্যঞ্জক বলিয়া তাহা-দিগের পরস্পরে এক প্রকার দৃঢ় সাদৃশ্য থাকে। যে পরিমাণে সেই সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণে শব্দদ্বারা ভাবপ্রকাশ, অঙ্গভঙ্গী বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাবপ্রকাশের স্থান অধিকার করে।

কিন্তু নূতন শব্দসৃষ্টিরও বিশেষ বিশেষ ক্রম আছে। তাহার মধ্যে একটী ক্রম এই যে, যে দ্রব্য হইতে যে প্রকার শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, সেই শব্দের অনুকরণেই সেই দ্রব্যের নামকরণ হইয়া থাকে। * আর একটী ক্রম এই যে, যে দ্রব্য যেরূপ কার্য্য করিতেছে বা করিয়া থাকে বলিয়া অনুভূত হয়, সেই কার্য্যের প্রকৃতি এবং নাম হইতে ঐ দ্রব্যের নামকরণ হয়। † এই দুইটী নিয়ম বুঝিলেই ভাষাসৃষ্টির মূল কিরূপ, তাহা অনেকটা বুঝা যায়। কিন্তু কোন ভাষার সকল শব্দই যে, ঐ দুই প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। পৃথিবীতে যত ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণতম ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ থাকে, যাহাদিগের উৎপত্তির ক্রম উল্লিখিত উভয় নিয়মের কোনটীরই অন্তর্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বনাম শব্দ, অব্যয় শব্দ এবং অপরাপর অনেক শব্দ ঐরূপ। উহারা কোন স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণজাত অথবা স্বতঃই কোন ক্রিয়াবাচক মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে,ঐ সকল শব্দ উচ্চারণসৌকর্য্যের নিমিত্ত কালসহকারে এতদূর রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে, উহাদিগের উৎপত্তির প্রণালী সম্যক্ প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

---

* যথা—কা শব্দ হইতে "কাক"।

† যথা—কর্ কর্ করিয়া কাটার শব্দ হইতে "করাত"।

ভাষার ক্রমোন্নতি বিষয়ে আর কয়েকটী নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার একটী নিয়ম এই যে, ভাষার আদিমাবস্থায় দ্রব্যবাচক, গুণবাচক এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সেই অবস্থায় উপসর্গ এবং বিভক্তির ব্যবহার হয় না। উপসর্গ এবং বিভক্তিগুলি পূর্ণাবয়ব শব্দ সকলের অপভ্রংশ হইতে বহুকাল পরে জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের সৃষ্টি হইয়া গেলে ভাষার প্রগাঢ়তা এবং জটিলতা ক্রমে এতই বর্দ্ধিত হয় যে,উহার বৈয়াকরণবন্ধনগুলি নিতান্ত দৃঢ় হইয়া উঠে। কোন জাতীয় লোকের ভাষা এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইলে যদি সেই জাতি অপর কোন ভিন্নভাষী জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আইসে, তবে কথোপকথনে ঐ জটিল ভাষার ব্যবহার স্বতঃই রহিতপ্রায় হইয়া যায় এবং ঐ ভাষার অনেকানেক অংশ শিথিলবন্ধ নূতন ভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃসারতা সম্বর্দ্ধিত করে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের এবং ইউরোপখণ্ডে লাটিন ভাষার অপভ্রংশ সমস্ত এইরূপে আধুনিক ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে। উভয় স্থলেরই আধুনিক ভাষাগুলি বিলক্ষণ সতেজ এবং পরিপুষ্ট, কিন্তু কোনটাই প্রাচীন সংস্কৃত এবং লাটিনের ন্যায় দৃঢ়সম্বদ্ধ নহে।

লিপির পর্য্যায়ক্রম।

মনুষ্যের মনোগত ভাব প্রকাশের আদিম এবং সাধারণ উপায় অঙ্গ-ভঙ্গী বা ইঙ্গিত। যদিও সকল দেশে এবং সকল বিষয়ে ইঙ্গিত বা অঙ্গ-ভঙ্গী অবিকল একরূপ হয় না বটে,তথাপি দৃষ্ট হইয়াছে যে, অনেক স্থলেই এবং অনেক বিষয়েই ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি প্রায় একরূপই হইয়া থাকে। ইউরোপ খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বধির এবং মূকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইয়াছে, তাহাতে প্রায় একই প্রকার অঙ্গভঙ্গীর প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-আমেরিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, প্রভৃতি নানা স্থান হইতে যে

বর্ব্বর লোকদিগকে সময়ে সময়ে আনিয়া একত্র করা হইয়াছে, তাহারা যদিও কেহ কাহার ভাষা বুঝিতে পারে না, তথাপি অনায়াসেই পরস্পর-কৃত ইঙ্গিত বুঝিয়া এক প্রকার আলাপ করিতে পারে। উল্লিখিত মূক-বধিরদিগের বিদ্যালয়ে ঐ বর্ব্বর লোকদিগকে লইয়া দেখা গিয়াছে যে, মূক-বধির ছাত্রেরা উহাদিগের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে এবং উহারাও ছাত্র-দিগের ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহাদিগের সহিত আলাপে বিশেষ সন্তোষ অনুভব করে। এই সকল এবং অন্যান্য অনেক প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হয় যে, ইঙ্গিত দ্বারা ভাবের প্রকাশ করা মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে একবিধ কার্য্য এবং উহা প্রায়ই এক রীতিতে সম্পাদিত হয়।

বাস্তবিক ইঙ্গিতব্যঞ্জনা একরূপ হইবার একটী বিশেষ কারণই বিদ্যমান আছে। অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কোন বস্তুর বোধ জন্মাইতে হইলে হস্তাদির দ্বারা সেই বস্তুর অনুকৃতি বা ছবি প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করা নৈসর্গিক ব্যাপার। এক বস্তুর ছবি মোটামুটি একরূপই হইয়া থাকে। এই জন্যই সর্ব্ব দেশের সর্ব্বকালের ইঙ্গিতব্যঞ্জনা সুবহুস্থলেই একবিধ হয়।

ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার সারভূত যে চিত্রকরণ ব্যাপার, তাহা হইতেই লিপি-কার্য্যের আরম্ভ। দুইটী মনুষ্য পরস্পর সন্নিহিত থাকিলেই ইঙ্গিত দ্বারা অন্যোন্যকে আপনাদিগের অভিপ্রায় অবগত করিতে পারে। কিন্তু দূরবর্ত্তী স্বজনদিগকে মনোগত জানাইবার প্রয়োজন সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে যে ইঙ্গিত প্রদর্শিত হয়—দূরবর্ত্তী ব্যক্তিকেও তাহারই অনুকৃতি চিত্রিত করিয়া পাঠাইতে হয়। বাস্তবিক বর্ব্বরজাতীয় লোকদিগের মধ্যে এই প্রকার চিত্রলিপির প্রচলন সর্ব্বদেশ-সাধারণ। হঠাৎ বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্যদিগের তেমন নিকৃষ্টাবস্থায় চিত্রকার্য্যের তাদৃশ বাহুল্য কিরূপে হয়? কিন্তু শিশুদিগের মধ্যে কয়লা খড়ি প্রভৃতি দ্বারা মাটিতে আঁচড় কাটিয়া খেলা করিবার রীতি যেমন অতি অল্প বয়সেই দেখা দেয়, তেমনি দৃষ্ট বস্তুর অনুকৃতি প্রস্তুত করার প্রবৃত্তি মানবজাতির অতি আদিম অবস্থা হইতেই জন্মে। যেখানে ভূগর্ভনিহিত মনুষ্যকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানেই তৎকালেও মনুষ্যেরা যে খোদকতাকার্য্যে মনোনিবেশ

করিয়াছিল, এবং ঐ কার্য্যে কতকটা দক্ষতাও লাভ করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সশব্দ ইঙ্গিতব্যঞ্জনা এবং বৃক্ষের পত্রে, ত্বকে, কাষ্ঠে, প্রস্তরফলকে এবং স্বশরীরে সেই ইঙ্গিত সকলের চিত্রকরণ বা খোদকতা, একই সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যদিও এমন কথা বলা যাইতে পারে না বটে, তথাপি যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহাতে উহাদিগের অন্তরকাল যে অধিক ছিল এরূপ অনুমানও করিতে পারা যায় না। প্রায় প্রথম হইতেই সশব্দ ইঙ্গিত এবং চিত্রকরণ—এই উভয় কার্য্যই যেন একযোগ হইয়া চলিয়াছে বোধ হয়।

কিছুকাল এইরূপ চলিলে এবং শব্দের উচ্চারণ অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, দ্রব্যবোধক ইঙ্গিতে এবং সেই ইঙ্গিতের চিত্রে এবং তদ্বোধক শব্দে একটী অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। অর্থাৎ চিত্রগুলি যেমন দ্রব্যের তেমনি শব্দেরও পরিচায়ক হইয়া উঠে।

চিত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে যেমন দ্রব্যের পরিচায়ক, তেমনি সেই দ্রব্যবোধক শব্দেরও পরিচায়ক হইলে, ক্রমে ক্রমে চিত্রের অঙ্গভঙ্গ হইয়া তাহার সংক্ষেপসাধন হইতে থাকে। প্রথমে এক একটী চিত্রাংশ এক একটী পূর্ণাবয়ব পদকেই বুঝায়, পরে ঐ চিত্রাংশ খর্ব্ব হইয়া যায়, এবং পদাংশকে বুঝাইতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে চিত্রাংশগুলি আরও ভগ্ন এবং ক্ষুদ্র হইয়া এক একটী বর্ণমাত্রকে বুঝায়।

লিপিকার্য্যের সৃষ্টি এইরূপে অল্পে অল্পে হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা চিত্রলিপি পর্য্যন্তই করিতে পারিত—দক্ষিণ আমেরিকার পেরু এবং মেক্সিকো দেশনিবাসী লোকেরা চিত্রলিপি এবং শব্দলিপি দুই প্রকার লিপিকার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিত। উহারা কেহই বর্ণলিপি করিবার রীতি উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ঐ সামর্থ্য প্রাচীন মিসরীয়দিগের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। মিসরীয় যাজকেরা চিত্রলিপি, শব্দলিপি এবং বর্ণলিপি—এই তিনপ্রকার লিপিকার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত বর্ণমালা য়িহুদী এবং ফিনিকীয়েরা প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণলিপিজ্ঞান ক্রমশঃ ইউরোপের সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য খণ্ডেও প্রচারিত হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষ, তিব্বত এবং ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণলিপি-জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে, মিসরীয় বর্ণলিপি তাহার মূল বলিয়া বোধ হয় না। যদিও বর্ণলিপিজ্ঞানের উদ্ভাবন প্রণালী একই, তথাপি অনুমান হয় যে, তাহার কোন স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মূল থাকিবে। কিন্তু সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত তেমন কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

সংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম।

চিত্ররূপ লিপি, সকল বিষয়েই খাটে। কোন ঘটনাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তাহা চিত্রলিপি খানির পূর্ব্বাপর ভাগের অনুক্রমে চিত্রিত করিলেই হয়। কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া তাহার অপেক্ষাও সহজ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুটী চিত্রিত করিয়া তাহার উপরিভাগে তাহার সংখ্যাবোধক দাঁড়ি দিয়া দিলেই চলিতে পারে। কিন্তু নরগণ বস্তুর সংখ্যা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে ঐ প্রণালী অবলম্বন করে নাই। তাহারা প্রথমতঃ দড়িতে গাঁইট বাঁধিয়া সংখ্যা বুঝাইত। এই ব্যাপার কোন কোন দেশে (১) এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে,রাজকোষের খাজনা, তহবিলের হিসাব এবং আদমসুমারীর হিসাব পর্য্যন্ত দড়ির গাঁইটেই রাখা হইত! ঐ দড়ি কখন কখন চারি শত হাত লম্বা এবং অনেকানেক শাখা প্রশাখাযুক্ত হইত, এবং গাঁইটগুলিও বিভিন্ন রূপের এবং বিভিন্ন তাৎপর্য্যের হইত। ইহাও এক প্রকার লিপিকার্য্য এবং ইহার মূল সংখ্যাবিষয়ক জ্ঞান। কিন্তু সংখ্যাবিষয়ক জ্ঞান সুপরিস্ফুট হইতে অনেক কাল লাগিয়াছিল। অদ্যাপি এমন দুই চারিটি বর্ব্বর জাতি আছে, যাহারা পাঁচের অধিক গণনা করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা ছয় বা সাত বলিতে হইলে, পাঁচ আর এক, পাঁচ আর দুই, এইরূপ বলিয়া থাকে। কোন কোন পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, এমনও বর্ব্বরভাষা আছে

---

(১) পেরু ও মেক্সিকোয় দড়ির শাখা প্রশাখা প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ ও গ্রামাদি বুঝাইত।

যাহাতে এক আর দুই সংখ্যার নাম ভিন্ন আর কোন সংখ্যার নাম নাই। কিন্তু আবার কোন কোন অসভ্য জাতি এক হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা করিয়া তাহার পর এক কুড়ি আর এক, এইরূপে গণনা করিত। ফল কথা, সর্ব্বাদৌ নরগণ মনোগত ভাব প্রকাশের নিমিত্ত অপরাপর স্থলে যেমন করিয়াছিল, তেমনি সংখ্যা বুঝিবার এবং বুঝাইবার নিমিত্তও সর্ব্বপ্রথমে ইঙ্গিতব্যঞ্জনার আশ্রয় লইয়াছিল, অর্থাৎ আঙ্গুলপাঁজি করিয়াই আপনারা সংখ্যার অবধারণা করিত এবং আঙুল দেখাইয়াই সংখ্যার পরিমাণ অন্যকে বুঝাইত। এক হাতে পাঁচটী অঙ্গুলি—এই জন্য অনেক জাতি অনায়াসেই পাঁচ পর্য্যন্ত সংখ্যার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামকরণ করিয়া সংখ্যাগুলিকে অঙ্গুলি প্রদর্শনের অনুকরণপূর্ব্বক চিত্রিত করিত। এই ব্যাপারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ রোমান সংখ্যালিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—যথা,

এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ
I	II	III	IV	V

এস্থলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, এক, দুই, এবং তিন, এই তিনটী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হস্তের এক, দুই এবং তিন অঙ্গুলি প্রদর্শনের অনুরূপ। পাঁচ সংখ্যা দেখাইতে একটী কৌশল প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এক হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি এই দুইটী মাত্র অঙ্গুলিকে বিস্তৃত ভাবে রাখিয়া এবং মধ্যের তিনটীকে মুড়িয়া রাখিয়া পাঁচ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। চারি সংখ্যাটী যেরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অপর একটী কৌশল আছে। চারি সংখ্যা যে পাঁচ হইতে এক কম উহা সেই ভাবে প্রকাশিত।

পাঁচের পরবর্ত্তী সংখ্যালিপিতেও ঐ প্রকার ইঙ্গিতচিত্রের এবং কৌশলের লক্ষণ আছে। যথা—

ছয়	সাত	আট	নয়	দশ
VI	VII	VIII	IX	X

এস্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে, এক হাতে পাঁচ দেখাইয়া তাহার দক্ষিণে অপর হস্তের একটী, দুইটী এবং তিনটী অঙ্গুলির যোগে ক্রমান্বয়ে ছয় সাত আট সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইত। দুইটী হস্তের মণিবন্ধে মণিবন্ধে

তির্য্যগ্‌ভাবে সংযুক্ত করিয়া একবারে উভয়েই পাঁচ দেখাইলে যেরূপ হয়, তাহার চিত্র দশ সংখ্যার জ্ঞাপক এবং তাহা হইতে এক বাদ দিয়া নয় সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

রোমান সংখ্যালিপির পরীক্ষাদ্বারা, কিরূপে যে ইঙ্গিতচিত্র হইতেই সংখ্যার লিপি সাধিত হইয়াছে,তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সংখ্যার নামকরণ কিরূপে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। পণ্ডিতেরা অনেক বিচার করিয়া এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছেন যে, মানবগণ কোন দৃষ্ট পদার্থের নাম হইতেই এক একটি সংখ্যার নামকরণ করিয়াছিল। ক্রমে পুনঃ পুনঃ কথনাধীন সংখ্যাবাচক নামগুলির এত অপভ্রংশ ঘটিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের মূল আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

ভারতবাসীদিগের সংখ্যালিপির পর্য্যায়ক্রম নির্দ্দেশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। আর্য্যজাতীয় লোকেরা এত বহুপূর্ব্বকাল হইতে সংখ্যা সম্বন্ধে সুপরিস্ফুট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং গণনা কার্য্যে এত পটুতা লাভ করিয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের আদিম অবস্থার চিহ্ন সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কৌশলের উপর কৌশল পড়িয়া যে মূল হইতে যাহা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরাই দশোত্তর গণনার সৃষ্টি করেন, এবং তাঁহাদিগের স্থানেই পৃথিবীর অন্য সকল সুসভ্যজাতি ঐ গণনারীতির জ্ঞানলাভ করিয়াছে। কিন্তু দশোত্তর গণনা প্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক, উহা যে মানুষের দশটি অঙ্গুলি থাকাতেই জন্মিয়াছে; সুতরাং ইঙ্গিত-চিত্রের অনুকরণেই ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। যদি আর্য্যেরা বা অপর কেহ নিরপেক্ষ বিচারমাত্রকে মূল করিয়া গণনার রীতি অবধারিত করিতে পারিতেন, তবে উহা দশোত্তর না হইয়া তাহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর যে দ্বাদশোত্তর গণনার রীতি, সেই রীতিক্রমেই হইত। কোন অতিমানুষ শক্তিদ্বারা গণনার রীতি উদ্ভাবিত হইলেও সেইরূপ হইত, আর মনুষ্যের দুই হাতের আঙুল যদি দশটী না হইয়া বারটী হইত, তাহা হইলেও সেইরূপ হইত।

মুদ্রাদি প্রচলনের পর্য্যায়ক্রম।

ভাষা এবং লিপি-কার্য্যাদির আদ্যারম্ভ নির্দ্দেশ করা যেমন দুরূহ ব্যাপার, মুদ্রাদি ব্যবহারের প্রবর্ত্তন এবং তাহার ক্রমোন্নতি নিরূপণ করা তেমন কঠিন কার্য্য নহে। যখন দুই চারিটী মনুষ্য-পরিবার পরস্পর সন্নিহিত ভূগর্ভে অথবা বৃক্ষশাখায় বাস করিয়াছে, তখন হইতেই সমাজের সৃষ্টি এবং অন্যোন্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হইয়াছে। যে পরিবারের কোন বস্তুর অভাব বোধ হইয়াছে, সে পরিবার অপর পরিবারের স্থানে সেই বস্তুটী পাইবার নিমিত্ত আপনাদের অর্জ্জিত অপর কোন বস্তু প্রদান করিতে চাহিয়াছে, এবং যদি এই বস্তুটী ঐ দ্বিতীয় পরিবারের প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে আদান প্রদান সহজেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে ঠিক এরূপ ঘটিয়া উঠে না। অর্থাৎ যাহা একটী পরিবারের নাই, তাহাই অন্য পরিবারের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে, অথবা এরূপ পরিবার যাহা চায়, তাহাই অপরটীর স্থানে আছে, এরূপ সর্ব্বদা ঘটে না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে সকল পরিবারের লোকেই স্বোপার্জ্জিত অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। তাহা করিতে আরম্ভ করিলেই বিনিময়ের বিশেষ সৌকর্য্যসাধন হইতে থাকে। পাঁচ সাতটী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা বিনিময় সাধন করিতে করিতে দৃষ্ট হয় যে, যে দ্রব্যটী যে জাতীয়ের প্রধান উপজীব্য, বিনিময় কালে তাহাই সমধিক কার্য্যে আইসে। মৃগয়ালু জাতীয়েরা দেখিতে পায় যে, পশুচর্ম্মের দ্বারাই তাহাদিগের অধিক বিনিময় সম্পন্ন হয়; জালজীবী জাতীয়েরা দেখিতে পায় যে, মৎস্যই তাহাদিগের বিনিময় কার্য্যের বিশেষ সাধক; কৃষ্যুপজীবীরা দেখে যে, ধান্য, গোধূম বা অপর কোন শস্য হইতে তাহাদিগের বিনিময় সহজে সাধন হয়। এরূপ হইবার কারণ অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে জাতির যে দ্রব্যটী প্রধান উপজীব্য, সে জাতির মধ্যে সেই দ্রব্যটীই সমধিক প্রকার কার্য্যে লাগে। সুতরাং সেই দ্রব্যেরই প্রয়োজন অপর সকল দ্রব্যের

প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক হয়, এবং সেই জন্যই তাহার দ্বারা বিনিময় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। এই জন্যই মৃগয়ালু প্রাচীনরুসীয় এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে পশুচর্ম্মই বিনিময়-সাধক ছিল। পাশুপাল্যোপজীবী প্রাচীন গ্রীক রোমান এবং জর্ম্মণদিগের মধ্যে গো মেষাদি পশুর আদান প্রদান দ্বারা বিনিময় সাধন হইত। কৃষ্যুপজীবী সকল জাতীয়েরাই প্রথমাবস্থায় কৃষিজাত শস্য দ্বারা বিনিময় সাধন করিয়া থাকে। আবিসিনিয়া দেশে এবং আফ্রিকার অপরাপর স্থানে লবণ একটী বিনিময় সাধন দ্রব্য। আইসলণ্ড এবং নিউফৌণ্ডলণ্ড দ্বীপে শুষ্ক মৎস্য দ্বারাই সকল দ্রব্যাদির বিনিময় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কোথাও না কোথাও উল্লিখিত সকল প্রথাই অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উল্লিখিত প্রয়োজনসাধনযোগ্য দ্রব্যের সহিত আর এক প্রকার দ্রব্যেরও বিনিময় কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। সমাজের আদিমাবস্থায় যখন প্রতি পরিবারকেই বিনিময় সৌকর্য্যার্থে অনেকগুলি করিয়া দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে অলঙ্কারের উপযোগী কতক বস্তুও সংগৃহীত হইত। প্রবাল, কড়ি, রঞ্জিত প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্য অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত এবং মনুষ্যজাতির আদিমাবস্থাতেও অলঙ্কারপ্রিয়তা বিশেষ প্রবল থাকে বলিয়া সর্ব্বদাই ঐ প্রকার দ্রব্যের সমূহ প্রয়োজন বোধ হইত, এবং তাহাদিগেরই দ্বারা বিনিময় কার্য্য সুবহু স্থলেই সুসাধিত হইত। বস্তুতঃ সুবহু প্রাচীন যে প্রস্তরযুগ তাহাতেও স্বর্ণ রৌপ্যাদির ব্যবহার নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরে যখন সমাজের অধিকারবিস্তৃতি সম্পাদিত হইল এবং শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হইয়া অনেকানেক বহুমূল্য দ্রব্যের আবিষ্কৃতি এবং প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল—তখন অপর সকল বিমিময় সাধন সামগ্রী অপেক্ষা ধাতুদিগের দ্বারাই উহার বিশেষ সৌকর্য্য অনুভূত হইয়া উঠিল। ধাতু সকল বহুকাল অবিকৃত থাকে—উহাদিগকে অধিক পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করিতে হয়, অতএব উহাদিগের মূল্যও অধিক হয়—উহাদিগকে অনায়াসে বিভক্ত করা যায় এবং অগ্নিতে একত্র গলাইয়া আবার সংঘটিত করা যায়। ধাতু-

দিগের এই সকল অনন্যসাধারণ গুণ থাকায়, কালে উহারাই বিনিময় সাধনের বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠে।

পরন্তু, প্রথমে যখন ধাতুদিগের দ্বারা বিনিময় সাধন হইত, তখন উহাদিগের মূল্য ওজনদ্বারা এবং কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে সময়ের অপব্যয় হইত এবং মূল্য নির্দ্ধারণও সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ববাদিসম্মত হইত না। এই জন্য যখন সমাজ সম্বর্দ্ধিত হইয়া কোন কুলপতি বা রাজার আশ্রয় লাভ করে, তখন বিনিময় সাধক ধাতুখণ্ডগুলি তাঁহা কর্ত্তৃক তুল্যাকৃতি ও তুল্যপরিমাণে স্বনামে অথবা কোন দেবতার নামে মুদ্রিত হইতে থাকে। সেই সকল মুদ্রিত ধাতুখণ্ডের মূল্য রাজকর্ত্তৃক এবম্প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ওজন করিয়া আর তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয় না। সেগুলির দ্বারা বিনিময়কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে থাকে। সেগুলিকে মুদ্রা বলে।

যতগুলি ধাতু প্রচলিত আছে তাহার সকলগুলি হইতেই কোন দেশে বা কোন কালে মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছে। লৌহের মুদ্রা প্রাচীন স্পার্টা নগরে এবং অত্যল্পকাল গত হইল জাপান দ্বীপে চলিয়াছিল। সীসক মুদ্রার প্রচলনের কথা গ্রীক এবং লাটিন কবিগণের গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। রাঙ্গ বা টিনের মুদ্রা কোন সময়ে ইংলণ্ডে এবং জাবাদ্বীপে এবং মেক্সিকো দেশে চলিয়াছিল। তাম্র মুদ্রা বহুকালাবধি অনেক দেশেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। রোম সাম্রাজ্যে, রুসিয়াতে এবং সুইডেন দেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাম্র মুদ্রারই সমধিক প্রচলন ছিল। রৌপ্য এবং স্বর্ণের মুদ্রা যে এক্ষণে সকল সুসভ্য দেশেই প্রচলিত, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্লাটিনম এবং নিকেল নামক দুইটী ধাতু হইতেও মুদ্রা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সুসভ্যদেশ মাত্রে প্রচলিত মুদ্রা তামার, রূপার এবং সোণারই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যেমন দিন দিন নূতন খনির আবিষ্কার হইয়া ধাতুগুলির অধিকতর পরিমাণে উদ্ধরণ হইতেছে, তেমনি অল্পমূল্যের ধাতু অধিকতর অল্পমূল্য হইয়া বহিতেছে, এবং এই প্রকার ধাতুর মুদ্রার প্রচলন ন্যূন হইয়া পড়িতেছে। ইউরোপের অনেক দেশে তাম্র এবং

রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন সংক্ষিপ্ত হইয়া স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনই বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মনুষ্যসমাজ সুসম্বর্দ্ধিত এবং রাজ্যগুলি অধিক সুবিস্তৃত হইলে স্বর্ণ রৌপ্যাদির মুদ্রা ব্যবহারেও বাণিজ্য কার্য্যের সম্যক্ সুবিধা হয় না—দূর প্রদেশে বা দূরবর্ত্তী ভিন্ন দেশে স্বর্ণ রৌপ্যাদির মুদ্রা প্রেরণ করা অনেক অসুবিধাজনক হয়। কিন্তু সমাজের তাদৃশ অবস্থায় প্রায়ই লিপিকার্য্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব দূরবর্ত্তী স্থানে ধাতু বিনির্ম্মিত মুদ্রাদি প্রেরণের পরিবর্ত্তে বরাত চিঠি এবং হুণ্ডির প্রচলন হইয়া উঠে। কিছুকাল হুণ্ডির প্রচলন হইতে হইতেই নোটের চলনও আরম্ভ হইয়া যায় এবং তাহা হইলে বাণিজ্য কার্য্যের যৎপরোনাস্তি সৌকর্য্য-সাধন হয়। এক্ষণে সকল সুসভ্য দেশেই নোটের চলন প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তবে কোন কোন দেশে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং নিজ নামে নোট প্রচলিত করেন। ভারতবর্ষে এইরূপ হইয়াছে। চীন সাম্রাজ্যে সম্রাটের নিজ নামাঙ্কিত তাম্র ফলকের নোট চলে। গবর্ণমেণ্টের নোটকে করেন্সি নোট বলে। কোন কোন দেশে যথা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক হইতেই বিশেষ বিশেষ রাজনিয়মের অনুসারে নোট প্রচলিত হয় এবং সেই জন্য ঐ সকল নোটকে ব্যাঙ্কনোট বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—**:**—

বঙ্গ সমাজে অন্তঃশাসন।

হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্রই অন্তঃশাসনের উপায় আছে। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে ঐ সকল উপায় ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এখনও এখানে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা নিতান্ত কম নয়। ইংরাজ এদেশের রাজা হইয়া এবং সর্ব্বত্র আপনার দত্ত ক্ষমতার বিস্তার করিয়া এদেশের সমাজ-শাসনপ্রণালী বন্ধপ্রায় করিয়াছেন। তথাপি কোথাও কোথাও তাহার কিছু কিছু অবশেষ আছে। সেই অবশিষ্ট ভাগ আমি কিরূপ দেখিয়াছি, তাহা বলিব।

কোন সময়ে বর্দ্ধমান জেলার একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—উহাতে প্রায় পাঁচ শত ঘর জানা আগুরি জাতীয় লোকের বাস এবং গ্রামের মণ্ডল সংখ্যা পাঁচ জন। ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে একটী শিবালয় এবং শিবালয়ের চতুঃপার্শ্বে অতি সুপরিষ্কৃত ভূমি। ঐ দিন অপরাহ্ণে গ্রামের পাঁচ জন মণ্ডল এবং গ্রামের অপরাপর অনেক লোক শিবালয়ের চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইয়া একটী অপরাধীর বিচার করিলেন। অপরাধ ধান-চুরি। চুরির মাল ধরা হইল, চুরির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, চোরকে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ অবসর দেওয়া হইল। চোর অধোবদনে দোষ স্বীকার করিল এবং বলিল যে নিতান্ত দারিদ্র্য নিবন্ধনই সে ঐ কাজ করিয়াছিল। চোর যে পাড়ায় বাস করে সেই পাড়ার মোড়ল তাহার দারিদ্র্যের প্রমাণ দিলেন। তখন পাঁচ জন মোড়লে বিচার করিতে লাগিলেন চোরের প্রতি কিরূপ দণ্ড হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার চৌর্য্যবৃত্তি না বাড়ে তাহার কি উপায় করা যাইবে। শিবালয়ের পুরোহিত ঠাকুর এবং উপস্থিত আরও চারি পাঁচ জন ঐ বিচারে যোগ দিলেন। পরিশেষে অবধারিত হইল যে, দুই জন লোক চোরের কানে ধরিয়া পাঁচ

বার শিবালয় প্রদক্ষিণ করাইবে, আর চোর আপনার পাড়ার মোড়লকে জানাইলে তিনি তাহার মজুরি জুটাইয়া দিবেন অথবা তাহাকে চাউল ধার দিবেন—ধার লইলে তাহাকে খাটিয়া শোধ দিতে হইবে। যাহার ধান চুরি গিয়াছিল সে ধান লইয়া যাইবার সময় চোরকেই বলিয়া গেল, "যদি কালিকার কাজ আর কোথাও না জুটিয়া থাকে, তবে আমারই ক্ষেতে যাইস।"

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমার বোধ হইল যে রাজার শাসন অপেক্ষা গ্রামের শাসন শত সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট। আমি ঐ গ্রাম্য মণ্ডল-দিগের মধ্যে এক জনকে নিভৃতে বলিলাম 'তোমরা চোরের দণ্ড যেরূপ করিলে তাহা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। কিন্তু চোর যদি থানায় গিয়া নালিস করে যে তাহার শারীর দণ্ড করা হইয়াছে, তাহা হইলে কি হইবে? * * *, "সে থানায় যাইবে না। আর মনে করুন যদিই যায় তাহা হইলে সে ত গ্রামে আর কাহার স্থানে মজুরি পাইবে না। তাহাকে এ গ্রামের বাস উঠাইতে হইবে।" * * * ভাল, ঐ ব্যক্তি যদি গ্রামান্তরের লোক হইত, তাহা হইলে কি করিতে? * * * যদি গ্রামের ভিতরেই ধরিতে পারিতাম, ভাল করিয়াই উত্তম মধ্যম দিতাম, দিয়া ছাড়িয়া দিতাম।" * * * "সে নালিস করিলে কি হইত?" * * * "কিছুই প্রমাণ হইত না।" কথায় কথায় জানিতে পারিলাম যে ঐ গ্রামের কোন লোক গ্রামান্তরবাসী কাহার স্থানে টাকা কর্জ্জ করে না। কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হইলে মণ্ডলদিগকে জানায় এবং মণ্ডলেরা গ্রাম হইতেই টাকা কর্জ্জ দেওয়ায়। ঐ গ্রামের জমিদার যখন আইসেন, তাঁহার যথেষ্ট সম্মান সমাদর করে, তাঁহাকে চাঁদা তুলিয়া দর্শনী দেয়; কিন্তু গ্রামের ভিতরে ঢুকিতে নিষেধ করে। যে জমীদারের অধিকারে ঐ গ্রাম তিনি প্রজাদিগের মন রাখিয়াই চলিতেন দেখিয়াছি। এবং শুনিয়াছি তিনি স্বচ্ছন্দে আপনার ঘরে বসিয়াই যথাকালে খাজনা এবং যাহা আবোয়াব ধার্য্য ছিল তাহা নির্ব্বিঘ্নে পাইতেন।

কিন্তু ওরূপ স্বাধীন-তন্ত্র গ্রাম আর অধিক নাই। অধিক স্থলেই গ্রামের শাসন জমীদারের হস্তগত হইয়া গিয়াছে। আমি যশোহর জেলার

একটি জমিদারী কাছারিতে ফৌজদারী বিচার যেরূপ দেখিয়াছি, এক্ষণে তাহা বর্ণন করিব; উহাও সমাজের আত্মশাসন শক্তির একটী উদাহরণ।

জমীদারের নায়েব বিচারপতি, গোমস্তা এবং মুখ্য মণ্ডলেরা সভাস্থ এবং নায়েব মহাশয়ের সহকারী। অভিযোক্তা একটী ব্রাহ্মণ। অভিযোগের বিষয় এই—সেকরাকে একযোড়া রূপার বালা গড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেকরা বালা গড়িয়া যথাকালে দেয় নাই আর অনেক পরে একযোড়া সীসকপূর্ণ বালা দিয়া রূপা চুরি করিয়াছিল। বিচারপতি বালা যোড়াটী দেখাইয়া সেকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই বালা তুই গড়িয়া দিয়াছিলি? সেকরা বলিল আমি দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমি নিজ হাতে গড়ি নাই, আমার এক বেটা কারিগর ওটা গড়িয়াছিল এবং সেই উহাতে সীসা পুরিয়া দিয়াছিল! একজন মণ্ডল জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর কোন কারিগর রে।" সেকরা একটু ঢোক গিলিয়া একজনের নাম করিল। অমনি আর একজন বলিয়া উঠিল "সে ত আজি দুই বৎসর তোর দোকান ছাড়া হইয়াছে। তোরা দুই বাপ বেটা ভিন্ন আর কেহ তোদের দোকানে কারিগর নাই।" সেকরা আমতা আমতা করিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় অভিযোক্তা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয় ভরি রূপা দিয়াছিলেন ঠাকুর?" * * * "আট ভরি"—সেকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন রে আট ভরি বটে?" * * আজ্ঞা আট ভরি" * * "আট ভরির দাম আট টাকাই ধরা যাউক" এই বলিয়া সেকরাকে বলিলেন, "এই আট টাকা, আর জুয়াচুরির জরিমানা দুই টাকা, আর মিথ্যা ওজর করিয়াছিস তাহার জরিমানা আর দুই টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ বারটী টাকা এইক্ষণে হাজির কর।" সেকরা বলিল "এত রাত্রে অত টাকা কোথায় পাব?" * * "ফের যদি কোন কথা কবে জরিমানা বাড়িবে।" সেকরা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, দুইজন পাইক তাহার সঙ্গে গেল, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বারটি টাকা আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণ আটটী টাকা হাতে হাতে পাইয়া চলিয়া গেলেন। সেকরা সেই সীসক পূর্ণ বালা ফেরত চাহিল, নায়েব একটু মুচকি হাসিলেন, গোমস্তা চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া বলিলেন, ঐ বালা লইয়া বুঝি আবার কাহাকেও

ঠকাইতে চাহিস্ এই বলিয়া সেকরাকে গালি গালাজ করিলেন। জমীদারী অন্তঃশাসনে রাজশাসনের ছায়া দেখিলাম, তথাপি সাক্ষাৎ রাজশাসনের অপেক্ষা ইহার মলিনতা অনেক কম বোধ হইল। উহা নিতান্ত বিচার বিক্রয়ের দোকানও নয়, মিথ্যা প্রবঞ্চনার নিজস্ব ক্ষেত্রও নয়, আর অভিযোজ্য এবং অভিযোক্তা উভয়ের সর্ব্বনাশেরও পথ নয়।

এ সকল অনেক দিনের কথা। ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগে একটু মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটরীর সহিত দেখা হইলে তিনি একটি স্থানের নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি ঐ স্থানে কখন গিয়াছিলাম কি না। তিনি যে স্থানটীর নাম করিলেন সেটী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। আমি একাধিকবার সেখানে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম ঐ স্থানে একটী মুন্সেফী আদালত বসিয়াছিল। কিন্তু আদালতে একটীও নালিস রুজু হয় নাই। সুতরাং আদালতটী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুলিসের একটি থানা আছে বটে, কিন্তু পুলিসকেও বড় কিছু করিতে হয় না। আমি ঐ কথা বলিয়া আরও বলিলাম "দেশের সর্ব্বত্র যদি ঐরূপ হয়, তবে বড়ই ভাল হয়।" সেক্রেটারী সাহেব ঐ কথায় রাগ করিলেন না। বলিলেন, "ওরূপ হওয়া প্রার্থনীয় বই কি—কিন্তু জমিদারেরা কি সুবিচার করেন বলিয়া তোমার বোধ হয়—উহাঁরা কি পক্ষপাত করেন না—উহাঁরা কি ব্রাহ্মণ অপরাধীর প্রতি অকাতরে দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন?" আমি বলিলাম, আমার বোধ হয় পারেন, আর যদি নাই পারেন তাহাতে দোষ কি? দণ্ডদানের মূল যাহাই হউক, সমাজ যাহার পক্ষে যে দণ্ড উচিত মনে করে, তাহাই কি প্রকৃত দণ্ড নয়? অন্যরূপ হইলে সাধারণতঃ বিচারের উপরে অভক্তি ও দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতিই কি সমাজের সহানুভূতি জন্মে না? গবর্ণমেণ্টের আদালতে ব্রাহ্মণ চণ্ডালনির্ব্বিশেষে শারীর দণ্ড প্রয়োগ হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড অতি অযুক্ত বলিয়াই ভাবে। এমন স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি শারীর দণ্ড প্রয়োগে কি কোন শুভ ফলোৎপত্তি হইতে পারে? সেক্রেটরী সাহেব ওসকল কথা আর গায়ে মাখিলেন না। বলিলেন, "যাহাদিগের

হস্তে ধর্ম্মাধিকরণ শক্তি স্বতঃই পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট করাই ভাল। আমি বলিলাম, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সৃষ্টিতে ঐ সকল লোকের হাত হইতে প্রকৃত ধর্ম্মাধিকরণ শক্তি বাহির হইয়া যাইবে; আপনাদের নিয়মানুযায়ী বিচারে এবং আপনাদের পর্য্যবেক্ষিত কার্য্যে আর কোন স্বাধীনতাই থাকিবে না। বিচার কার্য্যটা কেবল "কাগুজে বিচার" হইয়া উঠিবে। চুরির মালও আদায় হইবে না, যাহার মাল সেও তাহা পাইবে না, জরিমানার হার বর্দ্ধিত হইবে এবং লোকের দুঃখ বাড়িবে।" সেক্রেটরী সাহেব একটু হাসিলেন মাত্র। দুই মাসের মধ্যেই গেজেটে দেখিলাম ঐ জমীদারের দেওয়ান অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। ঘোলে দুগ্ধের স্বাদ থাকে না। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বিচার প্রণালীতে সামাজিক অন্তঃশাসনের সমস্ত শুভ ফল ফলিতে পারে না।

হিন্দু সমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। স্থূলতঃ এই শাসনের বিষয় এমন সকল পাপাচরণ যাহা রাজদণ্ডের অন্তর্ভূক্ত নহে।

ইউরোপের ইতিহাসে দুইবার মাত্র এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যখন সমাজের মধ্যে পবিত্রভাবের উত্তেজন হেতু রাজদণ্ড্য অপরাধে এবং সমাজদণ্ড্য পাপাচারে কোন ইতর বিশেষ করা হয় নাই। একবার রোমীয়দিগের অভ্যুদয়ের এবং অতি প্রাবল্যের সময়ে,তাহাদিগের সেন্সর নামক কর্ম্মচারীরা প্রজাব্যূহ আপনাপন গৃহে বসিয়া কিরূপ ব্যবহার করে তাহারও সংবাদ লইতেন এবং পাপাচারীর দণ্ড করিতেন। ঐ সময়ে রোমীয়েরা যেমন সতেজ হইয়াছিল তেমন আর কখন হয় নাই। ইংলণ্ডও যখন প্রথমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যখন ইংরাজ যোদ্ধৃগণের সাহস, বীর্য্যবত্তা এবং ধর্ম্মশীলতা ইউরোপীয় অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ ক্রমওয়েলের অধিকারকালে, পাপাচরণে এবং অপরাধে বড় ইতর বিশেষ করা হইত না। তখন যেমন অপরাধের তেমনি পাপাচারেরও বিচার এবং দণ্ড হইত। তখন ইংরাজেরা বাহ্য এবং গার্হ্য বা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এইরূপ দুইটী-জীবন ধারণ করিতেন না

অর্থাৎ এখন যেমন কথা উঠিয়াছে আমি সরকারি কাজ কর্ম্ম কিরূপ নির্ব্বাহ করি তাহাই দেখ, আমি ঘরে বসিয়া কি করি না করি অন্যের তাহা দেখিবার কোন অধিকার নাই—তখন সেরূপ কথা উঠে নাই। ইংরাজ তখন তেজোবীর্য্যে জাজ্বল্যমান হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষেও কোন কালে পাপাচরণের প্রতি রাজদণ্ড যুক্ত হইত। কিন্তু সে কাল অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। আমার অনুমান এই যে বৌদ্ধ রাজাদিগের সময়েই রাজদণ্ড্য অপরাধে এবং অন্তবিধ পাপাচরণে প্রথমে প্রভেদ জন্মে এবং মুসলমানদিগের সময়ে সেই প্রভেদ সম্পূর্ণ বদ্ধমূল হইয়া যায়। আর্য্যেতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলে, তাঁহারা সমাজপতি হইতে পারিলেন না। সুতরাং পবিত্র হিন্দু সমাজকে আপনার পবিত্রভাব রক্ষার নিমিত্ত অন্তঃশাসনের উপায় করিতে হইল। অতএব সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট প্রধান প্রধান লোকদিগকেই সমাজ পতির স্থানীয় করিয়া লওয়া হইল এবং তাহাদিগের শাসন শিরোধার্য্য করা হইল। পুরাণ সংহিতাদিতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে যে, সমাজ-রক্ষার্থ "মহাত্মগণ" বা "মনীষিগণ" এই এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। ঋষিগণ অথবা "সংহিতাকারগণ" বলিয়া ঐ সকল লোকের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজে আত্মশাসন কেমন সুবিস্তৃত এবং কেমন দৃঢ়মূল। শাস্ত্রের কথা না লইলে হিন্দুরা কোন কথা শুনে না বলিয়া যে প্রবাদ আছে সেটি প্রকৃত কথা নহে। মহাত্মারা" যাহা বলেন "বুদ্ধিমানেরা" যে উপদেশ দেন হিন্দুরা ভক্তিপূর্ব্বক সে সকল কথাও শুনে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করে। শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকিলেও "দেশাচার" এবং "দেশব্যবহার" ইহাদিগের নিকট অতি মান্য।

ইউরোপীয়েরা এই সকল শাসনের তেমন বশীভূত নহেন। এই জন্য উহাঁদিগের সকল কাজই আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, আর যেখানে আইন কিছু স্পষ্ট নির্দ্দেশ না করিয়াছে সেই খানেই ইউরোপীয় জনগণ একেবারে নিরঙ্কুশ। রাজব্যবস্থা পাপের অতি স্থূলাংশই ধরিয়া চলিতে পারে, পাপের সূক্ষ্মাংশ গুলি রাজ ব্যবস্থার হাতে ঠেকে না। কিন্তু রাজ-ব্যবস্থা ভিন্ন ইউরোপীয়দিগের পাপাচরণ দমনেরও আর কোন

প্রকৃতরূপে কার্য্যকারী বিধান নাই, সুতরাং উহারা অধিক পাপাচার।

ইউরোপীয় সমাজের এই দোষ লক্ষ্য করিয়া এবং উহাদিগের পরিগৃহীত ধর্ম্মপ্রণালী হইতে ঐ দোষের কোন অপনয়ন হয় না, দেখিয়া অগষ্ট কোমটি আপনার শিষ্যদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তোমরা প্রকাশ্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে অর্থাৎ তোমাদিগের আচার ব্যবহারের প্রতি আত্মসমাজের চক্ষু পড়িতে দিবে। সমাজের চক্ষু পড়িলেই আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ হইবে।

হিন্দুদিগের সামাজিক শাসন ঐ কাজটী করিয়া আসিতেছে। সকল হিন্দুকেই প্রকাশ্যভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পথে স্থিরতর রাখিতেছে। আজি কালি অনেকে সমাজের শাসন অমান্য করিতেই শিখিতেছেন। তাঁহারা ভাবেন না যে তাঁহাদিগের আত্ম সমাজই তাঁহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান এবং নীতিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্ব, তাঁহারা মনে করেন না যে আত্মসমাজের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার অতি নীচ প্রকৃতির লক্ষণ, তাঁহারা জানেন না যে ভারতবর্ষে যতদিন সমাজ শাসন সম্মানিত হইতেছে ততদিন এই দেশ পরাধীন হইয়াও কতক পরিমাণে স্বাধীন, তাঁহারা ভাবেন না যে যদি সমাজ-শাসন একেবারেই তিরোহিত হইয়া যায়, তবে ভারতবাসী আর কখন জাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইবে না। সমাজশাসন বিলুপ্ত হইলেই পশুভাব প্রবল হইবে, পাপাচরণ বাড়িবে এবং হিন্দু জাতীয়দিগের যে উন্নত ধর্ম্মনীতির জন্য ইহাঁরা এখনও পৃথিবীর সর্ব্বোপরি অবস্থিত সেই ধর্ম্মনীতির অধঃপাত হইবে। এই বিষয়ে একটা বড়ই স্থূল কথা কখন কখন শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে অপরাধের দণ্ড রাজ ব্যবস্থানুসারে হইবে, আর পাপ কার্য্যের দণ্ড ঈশ্বর করিবেন, এই দুই শাসনের মধ্যে আবার একটা সমাজ-শাসন রাখিবার প্রয়োজন নাই। কোম্‌টির মতাবলম্বীরা এরূপ কথা বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা সমাজের শাসনকেই সকল শাসনের অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া মানেন। অপরাপর খৃষ্টান ইউরোপীয়রাই ঐ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন যে রাজব্যবস্থা এবং ধর্ম্মব্যবস্থা সত্বেও তাঁহাদিগের ভদ্র সমাজে

একটা ইজ্জতের বা সম্ভ্রমের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ ব্যবস্থা ইউরোপীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে আছে বলিয়াই উহাঁরা "ভদ্রলোক" আর ইউরোপীয় ছোট লোকদিগের মধ্যে ঐ ব্যবস্থা সূত্রের নাম গন্ধও নাই বলিয়াই তাহারা নিতান্ত পশু। ফলকথা লোকে কাহার আচার ব্যবহারকে ভাল বলে কি না বলে, তাহা জানিতে না পারিলে অনেকানেক স্থলে এবং অধিকাংশ লোকেরই ধর্ম্মচ্যুতি হয়। এই জন্য রাজশাসন এবং ধর্ম্মশাসন সত্ত্বেও সমাজশাসনের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে। সমাজের শাসন অসম্মানিত হওয়া অতি দুর্লক্ষণ। উহা হওয়া লোকের প্রকৃতিতে পাশব স্বৈরভাবের উত্তেজনা বুঝায় এবং পাপাচরণের বৃদ্ধি সূচনা করে।

বঙ্গদেশে, সমাজের শাসন নিতান্ত অল্প প্রবল নহে। রাজধানীতে এবং বড় বড় সহরে কিছু কম বটে, কিন্তু সমস্ত পল্লীগ্রামে সমাজের শাসন বিলক্ষণ সজীব এবং সতেজ। সহরের অপেক্ষা পল্লীগ্রামের লোকেরা সরল এবং ধর্ম্মভীরু। কোন সমাজেরই শাসন সাক্ষাৎ শারীর দণ্ড বা সাক্ষাৎ ধনদণ্ড প্রয়োগ দ্বারা সাধিত হয় না। সমাজের দণ্ড ত্যাগরূপকই হইয়া থাকে। সমাজ পিতৃতুল্য; দুষ্ট সন্তানের প্রতি বলেন, "রে দুষ্ট! তোকে আমি ত্যাগ করিলাম।" বঙ্গসমাজ ঐ ত্যাগের কয়েকটী চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছেন যথা—(১) পংক্তি বারণ—(২) নিমন্ত্রণ বারণ—(৩) হুঁকা বারণ—(৪) আসন বারণ—(৫) নাপিত ধোবা বারণ।

কিছুকাল পূর্ব্বের কথা বলিতে পারি, আমি স্বচক্ষে তিন চারিটী গ্রামে ঐ সকল দণ্ডের কোন কোনটীর প্রয়োগ এবং তাহাতে অতি সুফল ফলিয়াছে দেখিয়াছি। এক জনের প্রতি হুঁকা বারণ হইয়াছিল; তিনি সত্য সত্যই একটী অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন—একজন ব্রাহ্মণকে পাদুকা প্রহার করিয়াছিলেন। হুঁকা বারণ হইলে ঐ ব্যক্তি গলবস্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং সমাজের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

আর একস্থলে একজনের নিমন্ত্রণ বারণ দেখিয়াছিলাম। তিনিও একটা উৎকট দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া নীচজাতীয়া কন্যাকে লইয়াছিলেন। তিনি উহাকে পরিত্যাগ করিলেন,

আনিলেন এবং সজাতীয় অনেকগুলি লোককে ভোজন
নর্ব্বার নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য হইলেন। অপর একস্থলে
রণে কোন ফল না হওয়াতে ধোবা নাপিত বারণের উপক্রম
। কিন্তু তাহার উল্লেখ হইবামাত্র লোকটা সমাজের বশে
যে দোষে লিপ্ত হইয়াছিল তাহা ত্যাগ করিল এবং অনেক
জন করাইয়া সমাজে সমন্বয়ীকৃত হইল।

তি একটী স্থানে দেখিলাম, অতি দুষ্কর্ম্মা কোন এক ব্যক্তিকে
নিমন্ত্রণে বাদ দেওয়া হইল। অমনি সে ব্যক্তি কোন পদশালী
বাবুজীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনিও ঐ নিমন্ত্রণে গেলেন না,
নূতন দল বাঁধিয়া ঐ দুষ্ট ব্যক্তিকে সমাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিলেন
আর এক ঘরে হইল না। গ্রামে দলাদলি বাধিয়া রহিল।

এই রূপে যে দলাদলি হয় তাহাতে সমাজকৃত দণ্ড কার্য্যকারী হইতে
পারে না। কিন্তু ঐরূপ কাণ্ড বহুস্থলে ঘটে না। আর যিনি ওরূপে
দলাদলি বাধান তাঁহাকেও অনেক ব্যয় ব্যসন করিতে হয়, সুতরাং সমাজ-
কৃত দণ্ডের যে একেবারেই কোন ফল ভোগ করেন না তাহাও নহে।

একজন চাকুরে প্রবাস হইতে স্বগ্রামে আসিয়া আপনি যে অনেক
টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছেন তাহার জাঁক করিতেন। কিন্তু কখন
কাহাকেও কিছু দান করিতেন না, মুষ্টিভিক্ষাও না। গ্রামবাসীরা তাঁহার
বাটীতে প্রতিমা ফেলিয়া ছিল। তিনি প্রতিমার পূজা করিলেন না;
কাটিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। গ্রামস্থেরা বাবুকে একঘরে করিয়া রাখিল।
তাঁহার নিষ্কৃতি হইল না। তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া
বাস করিলেন।

একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কোন অযাজ্যজাতীয় লোকের দান গ্রহণ
করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণপণ্ডিতটীর অনেকগুলি ব্রাহ্মণ যজমান ছিল।
সেই যজমানদিগের মধ্যে একজন অপর একজনের সহিত পরামর্শ করিতে
আসিয়া বলিলেন——"শিরোমণি ত আপনারও পুরোহিত আমারও
পুরোহিত। উনি অমুকের স্থানে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে দানগ্রহণ করিয়াছেন
জন্য আমাদের উহাঁকে ত্যাগ করা উচিত"। অপর ব্যক্তি বলিলেন—

"শিরোমণিকে আমরা বার্ষিক কত দিয়া থাকি, দেখা যাউক সপরিবার ভরণ পোষণের উপযোগী দিয়া থাকি এমত হয়, লোভপরবশ হইয়াই অমুকের স্থানে দানগ্রহণ করিয়াছেন, হইবে, এবং আমরা উহাঁকে অবশ্যই ত্যাগ করিব। কিন্তু য উহাঁকে সপরিবার ভরণ পোষণোপযোগী টাকা না দি, তবে তেমন দোষ ধরিতে পারি না। কারণ উহারও উদরান্নের উ আবশ্যক।" এই কথা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইল। শিরোমণি যজমানেরা মিলিয়া তাঁহার আয় বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া এবং লোকের স্থানে দানগ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শি লোভসম্বরণ না করিতে পারিয়া পুনর্ব্বার অযথা লোকের দান গ্রহণ লেন, ব্রাহ্মণ যজমানেরাও তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। তিনি ঠেকো া। রহিলেন।

অনেকে মনে করেন যে সমাজের শাসনে আর কোন বলই নাই। সেটী প্রকৃত কথা নহে। যদি বঙ্গীয় সমাজে কোন বল না থাকিত, তাহা হইলে এত দিনে দেশের সকল লোকেই মদ্যপ হইয়া উঠিত। মদ্যপান পূর্ব্বাপেক্ষায় বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কেহ পল্লীগ্রামে প্রকাশ্যভাবে মদ্যপান করিতে পায় না। এখনও মদ্যপায়ীর প্রতি একটা ঘৃণা সকল লোকেরই মনে মনে আছে। তবে ভারতবর্ষের অপরাপর ভাগ অপেক্ষা বাঙ্গালায় পানদোষের বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এবং ঐ দোষ যতটুকু বাড়িয়াছে, সমাজ শাসনের বল অবশ্যই ততটুকু কমিয়াছে।

জাতিভেদ।

অগষ্ট কোম্‌টিকে ইউরোপীয়েরা "সমাজ বিজ্ঞান" শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণন করেন। তিনি মনে মনে মনুষ্য সমাজের একটী আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, উহাতে (১) যাজক বা উপদেষ্টা সম্প্রদায় (২) শাসন কর্ত্তৃ বা রাজপুরুষ সম্প্রদায় এবং (৩) কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি নির্ব্বাহকারী সাধারণ প্রজা সম্প্রদায়, এই তিনটী সম্প্রদায় থাকা আবশ্যক। তিনি উল্লিখিত তিনটী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমটীকে অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা-প্রণয়নের ও শাসন কার্য্যোপদেশের এবং কৃষি প্রভৃতি সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিবার ভার দিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বকুশ প্রভুত্ব প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে যাজকবর্গ কখনই ধনসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে না, প্রত্যুত সমাজান্তর্গত অপর সম্প্রদায়ের প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তৃতীয় সম্প্রদায়সম্ভুক্ত লোকেরা স্ব স্ব পিতৃ ব্যবসায়ই শিখিবে। যিনি এইরূপ আদর্শ সম্প্রদায়ের কল্পনা করিয়া ইউরোপীয় জাতিদিগকে উহার অনুরূপ করিয়া আপনাপন সমাজ সংঘটনে অনুরোধ এবং উত্তেজনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি বহু প্রাচীন কালের লোক নহেন, তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য সম্বন্ধীয় অনেক লোক এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন এবং তিনি স্বয়ং একত্রিংশ বর্ষ * হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি যে তাদৃশ আদর্শের অনুযায়ী সমাজ গঠন করিতে উপদেশ দেন তাহার কারণ স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয়েরা বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে; উহারা একান্ত বিব্রত উত্যক্ত এবং স্বাস্থ্যহীন হইয়াছে—উহাদিগের সমাজ বন্ধন সুঘটিত না হইলে, উহাদিগের কোন সুখশান্তি হইবে না এবং উহারা দিন দিন বিপথে যাইয়া ক্রমেই অধর্ম্মাচারী হইয়া বিনষ্ট হইবে।

এখন মনে কর, কোম্‌টির আদর্শে গঠিত একটী অত্যুৎকৃষ্ট মনুষ্য সমাজ কোন কারণে স্বদেশ বিচ্যুত হইয়া অপর একটী দেশে তথায় আপনাদের অপেক্ষা রূপে গুণে অনেক অপকৃষ্ট এমন বিপক্ষজাতীয়

---

* অগষ্ট কোম্‌টি = ১৭৯৮—১৮৫৭।

লোকের মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইল। বিপক্ষেরা যুদ্ধ করিয়া বিজিত হইল। সমাজের শীর্ষ স্থানীয় যাজকেরা কি করিবেন? নিজ সমাজের এবং ঐ বিজিত দুর্বৃত্ত লোকদিগের হিতকামনায় তাহাদিগকে এক প্রকার কোমল দাসত্বে নিযুক্ত করিবেন; বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ না রাখিয়া বিজিত লোকদিগের কন্যাগণের পাণি গ্রহণে সম্মতি দিবেন এবং অনুলোমবিবাহ দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জন্মাইয়া সেই সঙ্কর জাতীয়দিগকে বিবিধ শিল্পকার্য্য শিখাইবেন। যে অনুলোম সঙ্কর যত উৎকৃষ্ট সে তদনুযায়ী উৎকৃষ্ট শিল্প ব্যবসায়াদি শিক্ষা করিতে থাকিবে এবং পৈত্রিক ব্যবসায় শিক্ষা করায় লোকের সুবিধা অধিক হয় বলিয়া এবং আপনাদের সমাজে ঐরূপ আদর্শ আছে বলিয়া, সঙ্কর বর্ণ সম্ভুক্ত জনগণ পৃথক পৃথক ব্যবসায়ী এবং পৃথক পৃথক সম্প্রদায় সম্ভুক্ত হইয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষে অবিকল এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কোম্‌টীর আদর্শভুক্ত যাজক প্রধান ত্রিধাবিভক্ত সমাজ আর্য্যদিগের। ভারতবর্ষে আসিয়া আদিম অধিবাসীদিগের সংস্রবে দাস্যনিয়োগ এবং বর্ণসঙ্কর উৎপাদনপূর্ব্বক চতুর্থ সম্প্রদায়, শূদ্র জাতি এবং তদন্তর্নিবিষ্ট বহুশাখা প্রশাখা জন্মাইয়াছে। অবশ্য কোন বিশিষ্ট প্রবল কারণ বশতঃই শূদ্র একেবারে আর্য্য-সমাজের তৃতীয় সম্প্রদায় বৈশ্যদিগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায় নাই এবং যতদিন সে কারণ বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন বৈশ্যদিগের মধ্যে শূদ্রের অন্তর্নিবেশ হইতে পারিবে না।

কিন্তু তাদৃশ অন্তর্নিবেশ যে কালক্রমে অবশ্যম্ভাবি এবং উহাদিগের পার্থক্য রক্ষা করিবার কারণ যে বহুদিন হইতে হীনবল হইতেছে তাহা বুদ্ধদেবের এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকানেক মহাপুরুষের উদ্যম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব, মহাত্মা নানক, কবীর, চৈতন্য মহাপ্রভু, ইহাঁরা সকলই হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন—সাম্যধর্ম্মী মুসলমানেরাও পুনঃ পুনঃ ঐ চেষ্টা করিয়াছে —কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই। কেন হয় নাই—কোন প্রবলতর শক্তি ঐ সকল চেষ্টাকে বিফল করিয়াছে সন্দেহ নাই। স্বল্পদর্শীরা বলিবেন সেই শক্তি ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর বিপক্ষতা। কিন্তু ঐতিহাসিক বৃহদ্ব্যাপার সকল

প্রাকৃতিক শক্তিরই কার্য্য—ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বিপক্ষতা বা স্বপক্ষতা ওরূপ কার্য্যের সাধক হয় না। বিশেষতঃ বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কালে ব্রাহ্মণেরাও একবারে মাটি হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধরাজধানী পাটলিপুত্র নগরের সন্নিহিত বিহার প্রদেশেরত জাতি বিচার রহিতই হইয়া গিয়াছিল। যদি জাতি-ভেদের কোন নৈসর্গিক কারণ না থাকিত তবে কি উহা কেবল ব্রাহ্মণদিগের চেষ্টায় আর পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিত? তাহার পর দেখ পঞ্জাব প্রদেশ। ওখানে মুসলমানের বল্ল যার পর নাই বাড়িয়াছিল—এতদূর বাড়িয়াছিল যে ওখানে হিন্দুমতবাদ এবং মুসলমান মতবাদ উভয়ে সংশ্লিষ্ট হইয়া যে শিখ মতবাদ উঠিল তাহাতেও জাতিভেদ প্রণালী স্থান পাইল না। কিন্তু ক্রমে পঞ্জাবীদিগের মধ্যে "নমাজী সিং' 'রংরেটী সিং'এইরূপ অনেক শিখ জাতি উঠিয়াছে—এবং মুসলমানদিগেরও মধ্যে একটু জাতিভেদ প্রথা প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটী বিবরণ শুন। আমি কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে একটী স্ত্রীনর্ম্যাল বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম।—ছাত্রীদিগের মধ্যে একটী বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্না স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহার জাতি কি জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম সে "রাজপুত মুসলমান'! 'রাজপুত মুসলমান কি'? "ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা রাজপুত ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু আপনাদের সদৃশ অপর রাজপুত মুসলমানের সহিত উহাদের বিবাহাদি নির্ব্বাহিত হয়, অপর মুসলমানের সহিত হয় না।" "এরূপ কতদিন চলিতেছে"?—"মুসলমান হইয়া অবধি ছয় সাত পুরুষ।" "অন্যান্য মুসলমানের মধ্যে কি এইরূপ নিয়ম আছে?" "প্রায় সকল ভাল ভাল ঘরেই আছে। লালা মুসলমানেরা এবং ক্ষত্রিয় মুসলমানেরা প্রায়ই স্ব স্ব ঘর বাছিয়া বিবাহ করে—জাঠ টাঠেরা তাহা বড় একটা করে না"।

বাঙ্গালায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে কতকটা ঐরূপে জাতি বিচার করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা চলে তাহা যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন। আর কৃত খৃষ্টানদিগের মধ্যেও যে ওরূপ বিচার একেবারে নাই তাহাও নয়। এই সকল স্থলে জাতি-ভেদ দেখা দেয় কেন? উহার প্রকৃত কারণ এই যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে রূপ-

গুণের প্রভেদ অনন্তজাতি-সাধারণ। জাতিভেদের প্রকৃত অর্থ বৈবাহিক সম্বন্ধের পার্থক্য মাত্র, ভোজনাদিতে যে ভেদ করা হইয়াছে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বৈবাহিক পার্থক্য বজায় রাখা। যদি ভারতবাসীদিগের মধ্যে রূপ গুণের যত পার্থক্য এখনও লক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যূন হইয়া যায়, তবে অবশ্যই জাতিভেদ প্রথা তিরোহিত হইবে। এখনও লোকের মুখে শুনা যায়—"কায়েত বামুনের চেহারা!" অর্থাৎ অপরাপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা ঐ দুই জাতীয়ের সৌন্দর্য্য এবং শ্রী অধিক। যখন বিভিন্ন জাতীয়দিগের মধ্যে এত অন্তরতা না থাকিবে তখন জাতিভেদও থাকিবে না। তবে বুদ্ধ নানকাদি মহাত্মগণ ঐ জাতিভেদ উঠাইতে গিয়াছিলেন কেন? তাহার উত্তর এই—ধর্ম্মজ্ঞেরাও দূরদর্শী, নীতিজ্ঞেরাও দূরদর্শী, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞদিগের দূরদর্শন ভাবাত্মকতা-মূলক, নীতিজ্ঞদিগের যুক্তিমূলক--ভাবাত্মকতা কালাকাল বিচার করে না। এই সকল কথা শুনিয়া যদি কোন অর্ব্বাচীন বিচারসহ বলেন যে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া বিভিন্ন জাতীয়ের মধ্যে কন্যার আদান প্রদান করিলেত আকারগত ভেদ সত্বরেই মিটিয়া আইসে, তাঁহার কথার অনেক উত্তর আছে—কিন্তু এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ওরূপ কাণ্ড নর নারীদিগের এবং জন্তু মাত্রেরই অস্বাভাবিক।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ইহার অভ্যন্তর ভাগে কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ এবং গুণ আছে।

(১) বিজিত জাতীয় লোকের মধ্যে সহজেই আত্মগৌরব নষ্ট হইয়া যায়।

(২) সকল বর্ণের লোকেই একমাত্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহার অপেক্ষা আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না।

(৩) জাতিভেদ থাকায় ধনের গৌরব নিতান্ত বৃদ্ধি হইতে পায় না।

(৪) জাতিভেদ থাকায় জনগণ আপনাপন অভিলাষানুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পায় না বলিয়া একটা শেখা কথা কাহার কাহার মুখে শুনা যায়, সেটা কিছুই নয়। বৌদ্ধবাদ প্রবল হইবার পর অবধি এক যাজকতা ভিন্ন অপর সকল ব্যবসায়ই সকলের পক্ষে

খোলা হইয়া গিয়াছে। শিক্ষকতা পর্য্যন্ত শূদ্রের অধিকারে আসিয়াছে।

(৫) জাতিভেদ থাকায় ভারতবর্ষের সমুদায় শিল্পকার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঢাকার সূত্রবস্ত্র, কটকের গহনা, দাক্ষিণাত্যের ভূতপূর্ব্ব ভাস্করীয় কার্য্য সমস্ত পৃথিবীতে তুলনারহিত। এরূপ কারুকার্য্য হিন্দু সমাজ বন্ধনের গুণেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তবে ইউরোপীয় পথ ভিন্ন উন্নতির অন্য পথ নাই যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা এ দেশের কিছুই যথার্থ মনে করেন না। একজন মান্দ্রাজী সিবিলিয়ান আমাকে বলিয়া ছিলেন, "শ্রমবিভাগের নিয়ম ভারতবর্ষে খুব পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সত্য কিন্তু লোকের অকর্ম্মণ্যতা দোষে তাহাতেও কোন ফল দর্শে নাই।"—"কেন?" "তোমাদের কুম্ভকারেরা ত পুরুষানুক্রমে হাঁড়ি, কলসী গড়িতেছে। ছিছি। উহাদিগের "সিবস বাস" (Sevres vase) গড়া উচিত ছিল।" "সিবস বাস কি প্রত্যহ গড়িবার এবং ফেলিয়া দিবার জন্য হইতে পারে?"

(৬) জাতিভেদ প্রচলিত থাকায়, হিন্দু সমাজ ভারতবর্ষের অপরাপর সমাজকে আপনার অন্তর্নিবিষ্ট করিবার বিশেষ সুবিধাই পাইয়াছে, সুতরাং পরেও পাইবে। একেবারে ভিন্ন সমাজের লোককে লইয়া তাহাদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদির প্রচলন করা কঠিন। উহাদিগকে সমাজান্তর্গত একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করা তত কঠিন নয়। আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি হিন্দুসমাজের সজীববৎ ব্যবহার দেখ। সাঁওতালেরা হিন্দু হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে সংখ্যায় অধিক হইতেছে তথায় 'খারবার' নামে অভিহিত হইয়া জল আচরণীয় হইতেছে। মেকেরা'ও অনেকে এরূপে জল আচরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, শিখেরা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগী, কিন্তু উহারাও ক্রমে আপনাদিগকে নানকপন্থী হিন্দু বলিতেছে। কবীরপন্থীরা এবং দাদুপন্থীরা আপনাদিগকে হিন্দু সমাজান্তর্গত মনে করে। বাঙ্গালায় জাতিভেদ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও একটী বৈষ্ণব জাতি জন্মিয়া গিয়াছে।

মালদহ জিলায় কোন মুসলমানের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল।

কথোপকথনে জানিলাম, তিনি নিরামিষভোজী। দেখিলাম, তিনি আবুবকর প্রভৃতি খলিফাদিগের মধ্যে একজনেরও নাম জানেন না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের নাম জানেন। তিনি বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে যেমন নানা জাতি আছে না, আমরা মুসলমানেরাও সেইরূপ একটী জাতি। মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর রঙ্গপুর প্রভৃতি জিলার সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের বাটীতে অনেকানেক মুসলমান চাকর থাকে. এবং যদিও তাহাদিগের জল আচরণ না হউক, দুগ্ধ আচরণ হয়। তথাকার মুসলমান গোমাংস খাও কি, জিজ্ঞাসা করিলে দন্তদ্বারা জিহ্বা কাটিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। ওয়াহাবি মতবাদের অভ্যুত্থানের পর ঐ ভাব যেন কিছু কমিয়া গিয়াছে। আর কোন কোন ইংরাজ হাকিমেরাও যেন হিন্দুর প্রতি মুসলমানের বিরোধ একটু রক্ষা করিয়া চলিতেছেন বলিয়াই কোথাও কোথাও সন্দেহ হয়। কিন্তু ও সব চেষ্টা বিফল হইবে।

বাঙ্গালী সমাজ।

শান্তিপ্রবণ হিন্দু সমাজ সুখাভিলাষী ইংরাজকে আপনার শিরোদেশে ধারণ করিয়াছে। নিবৃত্তিমার্গে দীক্ষিত জনগণ প্রবৃত্তি-মার্গানুসারী লোককে আপনার আদর্শ স্থলে প্রাপ্ত হইয়াছে। উচ্চাধিকারী নিকৃষ্টাধিকারীর বশে আসিয়াছে। অন্তর্দর্শী বাহ্যদর্শীর স্থানে মন্ত্র গ্রহণ করিতেছে। এই অতি বিপুল সমাজ সংঘর্ষের ফল কি হইতেছে, তাহা বাঙ্গালী সমাজটীর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি সুস্পষ্টরূপেই বোধগম্য হইবে—এবং পরেও কিরূপ হওয়া সম্ভব তাহারও অনেক দূর অনুমান করা যাইতে পারিবে। কারণ, ভারতবর্ষের অপর-সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালাতেই ইংরাজ প্রাধান্য অধিককাল বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত হইয়াছে; বাঙ্গালীদিগের অভ্যন্তরেই ইংরাজী রীতিনীতি দূরতর প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং বাঙ্গালীদিগের মধ্যেই ইংরাজী বিদ্যার বহুল প্রচার হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের মধ্যেই আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য উভয় ভাগের প্রকৃতি এমন সুন্দররূপে সম্মিলিত যে, এখানে যেরূপ যেরূপ

ঘটিয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষেই সেইরূপ ব্যাপার ঘটিবে, এরূপ মনে করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। আর্য্যাবর্ত্তে উচ্চজাতীয় এবং নিকৃষ্টজাতীয় লোকদিগের মধ্যে আকার বৈসাদৃশ্য কম, দাক্ষিণাত্যে বেশী; বাঙ্গালায় কমও বটে, বেশীও বটে, অর্থাৎ এখানে উচ্চজাতীয় এবং অন্ত্যজ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এমন কতকগুলি জাতি জন্মিয়া আছে, যাহাদের সহিত ব্রাহ্মণাদির বৈসাদৃশ্য অনধিক অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায়; কিন্তু নিতান্ত অন্ত্যজদিগের সহিত বৈসাদৃশ্য অধিক অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের ন্যায়। এই সকল কারণে এবং আমি নিজে এই সমাজের লোক এবং যদি কেহ আমার লেখা পড়েন, তবে এই সমাজের লোকেই পড়িবেন ইহা মনে করিয়া বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক বোধ হয়, তাহাই বলিব।

বাঙ্গালী জাতি অপরাপর আর্য্যাবর্ত্তবাসীর ন্যায় আর্য্যপ্রধান। সেই প্রধানতম উপাদানের সহিত অনেকটা কোলেরীয় কতকটা দ্রাবিড়ী এবং কিছু পরিমাণ তাতারীয় মিশ্রিত হইয়া আছে। বাঙ্গালার মুসলমানেরা কোন নূতন উপাদান নহে। কোলেরীয়রা কোন অতি পূর্ব্বকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসাম প্রদেশ ভেদ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে ছোট নাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছিল। দ্রাবিড়ীয়রা দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে, কাহার কাহার মতে সমুদ্র পথে বঙ্গোপসাগর দিয়া, উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে উঠিয়া ছিল। তাতারীয়রা ব্রহ্মদেশ হইতে কতক আসামের ভিতর দিয়া কতক মণিপুর প্রদেশের পাহাড় উপচিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। আর্য্যেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে গঙ্গা প্রবাহের অনুক্রমে আসিয়া উল্লিখিত তিনটী বিভিন্ন স্তরের উপর বিস্তৃত হইয়াছিলেন। এই বহু পূর্ব্বগত ব্যাপার এখনও সম্পূর্ণরূপে বিরত হয় নাই। কোলেরীয়দিগের আর কোন চিহ্ন বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব কি মধ্য ভাগে দৃষ্ট হয় না, এবং পশ্চিম ভাগেও অতি অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু দ্রাবিড়ীয় সাঁওতালেরা এখনও হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, রাজমহল প্রদেশ দিয়া উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে চলিতেছে দেখা যায়, আর আসামের ভিতরে এবং খসিয়া পর্ব্বতাদিতে পূর্ব্বদিক হইতে নূতন নূতন পার্ব্বতীয় লোকের সঞ্চার এখনও হইয়া

থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্য্য সঞ্চারেরও এখন সম্যক্ নিবৃত্তি হয় নাই। ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী জেলাগুলিতে এখনও বিহার এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে নূতন লোক আসিতেছে এবং বাস করিতেছে। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল জেলার কোন মেলা স্থানে গিয়া খাস তদ্দেশীয় লোক যত দেখিতে পাওয়া যাইত এখন আর তত পাওয়া যায় না—এখন হিন্দুস্থানী আকারের লোক বাড়িয়াছে। এখন সাঁওতাল নাচে আর খাস-সাঁওতাল তেমন অধিক থাকে না। কি সাঁওতাল পরগণার ভিতরে কি মৌরভঞ্জে অর্থাৎ সমস্ত সাঁওতাল ভূমির পার্শ্বদেশে যে স্ত্রীপুরুষ সাঁওতাল বলিয়া নাচে উপস্থিত হয়, তাহার পনর আনা লোক মিশ্র জাতীয়। অবিমিশ্র সাঁওতাল নয়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, কোন দেশের উপরিভাগ যেরূপ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া থাকে, তাহার হেতুনির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বগত কোন অদ্ভুত শক্তির কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে সেইগুলিই অধিক কাল ব্যাপিয়া কার্য্যকারী হইয়াছে মনে করিলেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থির হয়। ভূমিভাগের স্তর সম্বন্ধেও যে কথা, আর ভূমিনিবাসী মনুষ্যদিগের সম্বন্ধেও সেই কথা। যে ব্যাপার আজি হইতেছে দেখিতেছ, তাহাই পূর্ব্বাবধি হইয়া আসিয়াছে মনে করিলেই বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপে জন্মিল তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। আজি দক্ষিণ ভগলপুরে, সাঁওতাল পরগণায়, মৌরভঞ্জে যাহা হইতেছে দেখিতেছি, পূর্ব্বেও তাহাই হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্য্যসম্ভূত জনগণ আসিয়া এই সকল অঞ্চলের লোকের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণেরাই অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে মিশিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষাটী কেমন করিয়া জন্মিল, সেই কথা লইয়া আমাদিগের কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি কিছু মতামত প্রকাশ এবং বাদানুবাদ করিয়াছেন। আমি যে সকল স্থানের নাম করিলাম সেই সকল স্থানের কথা শুনিলেই একেবারে বাঙ্গালা ভাষার সুতিকাগারটী দেখা যায়। ঐ সকল স্থানে হিন্দি ভাঙ্গিয়া যায়, দেশীয় কথাও ঠিক থাকে না—একটু দূরে হইতে শুনিলে যেন বাঙ্গালা ভাষার স্বরই শুনিতেছি বলিয়া বোধ

হয়। ক্রিয়াপদ গুলিই প্রথমে বাঙ্গালার ধরণে ভাঙ্গে। ভাষা সৃষ্টিও ক্রিয়াপদ লইয়াই হয়।

আর একটি ব্যাপারও বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ মাত্রেই লক্ষিত হয়। কি কাছাড়ী কি খসিয়াদিগের মধ্যে, কি আসামে, কি ছোটনাগপুর প্রদেশে, কি ভাগলপুরে সর্ব্বত্রই পশু পক্ষ্যাদি বলি প্রদান দ্বারা কোন না কোন দেবীর পূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেবীর নাম এবং রূপ ভিন্ন হয় বটে, কিন্তু পূজার পদার্থটী পুংদেবতা নয়, স্ত্রীদেবতা এবং পূজার অতি প্রধান অঙ্গ জীব হনন, এ দুইটী বিষয়ে সকলেরই মিল আছে। এমন কি ভূটীয় সিকিমী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিরা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াও বিবিধ বর্ণের এবং বহু পরিমাণ হস্ত সমন্বিত বুদ্ধ-শক্তি সকল স্বীকার করিয়া থাকে। বাস্তবিক আর্য্যাবর্ত্তের অপর সকল ভাগের অপেক্ষা, বাঙ্গালা দেশেই শক্তির পূজা বিশেষ প্রবল। বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা এবং মধ্বাচারী কৃষ্ণভক্তেরা কেহই সীতা অথবা কোন কৃষ্ণ-শক্তিকে রাম বা কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করেন না, কিন্তু বাঙ্গালার নিমায়ৎ বৈষ্ণবেরা শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণের উপরেও প্রাধান্য দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইৎ বৈষ্ণবদিগের মতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীরাধিকা স্বয়ং এবং সেই জন্যই একান্ত কৃষ্ণপ্রেমময় শরীর। চৈতন্য চরিতামৃতেরও অভ্যন্তরীণ ভাব ঐরূপ। বেদের উপাস্য ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। কিন্তু বৈদিক দেবতা ইন্দ্র বিষ্ণু রুদ্রাদি সকলেই পুরুষ। বেদে উপাস্য স্ত্রীদেবতা নাই বলিলেই হয়। "শোভমানা হৈমবতীর" কথা আছে, "শ্রমইব রূপ ধারিণী ঊষার" কথা আছে, "হিরণ্যবর্ণা হরিণী লক্ষ্মীর" নাম আছে, কিন্তু উহাঁরা দেবতা বলিয়া বিশিষ্টরূপে উল্লিখিত নহেন। কিন্তু বঙ্গদেশে, কি আর্য্য-দিগের মধ্যে কি প্রত্যন্তবাসী বৌদ্ধদিগের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব দিগের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে শক্তি সেবারই বিশেষ সমাদর এবং গৌরব। এই কারণে এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি শক্তি-সাধন-প্রধান তন্ত্রশাস্ত্রের আকার ধারণ করিয়া আছে এবং এখানে সাংখ্যদর্শনের মত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়াতে অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত চিন্ময় পুরুষ তন্ত্রশাস্ত্রে জড়ময় এবং সাংখ্যোক্ত জড়প্রকৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে চিন্ময়ী হওয়াতে, বঙ্গদেশে সাংখ্যদর্শনের সমাদর ন্যূন

হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সাংখ্যদর্শনের সমাদর অল্প হওয়াতেই বোধ হয় যে, ন্যায়দর্শন এপ্রদেশে অধিক সমাদৃত হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে পরমাণুবাদই প্রবল, পুরুষ প্রকৃতি লইয়া কোন বিচার নাই। কিন্তু আর্য্যজাতীয় লোকের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বরূপ যে অদ্বৈতবাদ তাহাও বঙ্গদেশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তন্ত্রেরও চরম কথা বেদান্ত দর্শনের চরম কথা হইতে অভিন্ন। বঙ্গদেশের বেদ আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সেই দীক্ষা গ্রহণে সকল জাতীয় লোকের সমান অধিকার উক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, তন্ত্রশাস্ত্রে ভৈরবী চক্র প্রভৃতি এরূপ সকল সাধন-সমিতির উল্লেখ আছে যাহাতে বর্ণভেদের বিচার নিষিদ্ধ। এই সকল লক্ষণে বোধ হয় যে, বৌদ্ধপ্রবর্ত্তিত সমীকরণ ব্যাপার কিয়ৎপরিমাণে তন্ত্রশাস্ত্র কর্তৃক আর্য্যপ্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের এবং সাধনপ্রণালীর বৃদ্ধি হওয়াতে বৈদিক যজ্ঞবিধির বিধান সকল বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল।

সাময়িক পরিবর্ত্ত।

সেই অতি পূর্ব্বে বৈদিক কালে হিন্দু সমাজ যেরূপ ছিল আজিও সেই ভাবাপন্নই আছে, এ কথা পূর্ব্বে পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিতেন, বটে, এখন আর কেহ বলেন না। প্রথমে বেদ ত্রয়ী ছিল, চারিটী বেদই ছিল না। পরে অঙ্গিরা ঋষি (অবশ্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার স্থানে শিক্ষা করিয়া) নিজ পুত্র অথর্ব্বনকে চতুর্থ বেদটীর শিক্ষা দান করেন। অথর্ব্ব বেদের সময়ে চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের বিশিষ্টরূপেই উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে এবং আদিম অধিবাসীদিগের অনেকানেক দেবতা আর তাহাদিগের কর্ম্ম কাণ্ড ঐ বেদের মধ্যে অভিচারাদি ক্রিয়া রূপে পরিণত হইয়াছে এবং ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের বিশেষ বাহুল্য হইয়াছে। এই প্রথম পরিবর্ত্ত।

সমাজ শাস্তা এবং যুদ্ধকর্ত্তা দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে যে অতি ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় এই সময়ে। অঙ্গিরা বংশীয় পরশুরাম ক্ষত্রিয় কুলের দমনকারী। ঐ বংশীয় গাধিরাজ পুত্র বিশ্বামিত্র

বশিষ্ঠ ঋষির বিদ্বেষ্টা—এইরূপ পৌরাণিক উপাখ্যান সকল দ্বিজাতীয়দিগের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করে এবং সেই বিচ্ছেদ জন্য যাজন এবং যুদ্ধ ব্যবসায় সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। এই দ্বিতীয় পরিবর্ত্ত।

ইহার পর মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণাদির আচার ব্যবহারের সুদৃঢ়বন্ধ এবং আশ্রম বিভাগ; দ্বিজাতীয়দিগের অসবর্ণা বিবাহজাত বহুল সঙ্কর জাতীয় লোকের অলিকা; তন্মধ্যে অনুলোম সঙ্করের উৎকর্ষ, এবং বিলোম সঙ্করের অপকর্ষ ব্যাখ্যাত। ঐ সংহিতার সময়ে সমাজের গঠন প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এবং ব্রাহ্মণজাতীয়দিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া অপরাপর জাতীয় জনগণ বিবিধ বিদ্যা ও শিল্পাদির চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সঙ্কর জাতীয়েরাও ক্রমশঃ রূপে গুণে আর্য্যসাদৃশ্য লাভ করিতেছে। এই তৃতীয় পরিবর্ত্ত।

অধিবাসীদিগের মধ্যে রূপগুণের পরস্পর সাদৃশ্য ভারতবর্ষের যে ভাগে অধিক হইল সেই ভাগে জাতিভেদ উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই জন্মিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ অযোধ্যা প্রদেশে, বেন প্রভৃতি রাজগণ মধ্যে মধ্যে ঐরূপ চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন তাহা পুরাণে উল্লিখিত আছে। অনন্তর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইল। তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্মকার্য্যের দোষ, এবং জ্ঞান ও উপাসনা কার্য্যের গুণকীর্ত্তন করিলেন এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদিতে বর্ণভেদনির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার স্থাপন করিলেন। এই চতুর্থ পরিবর্ত্ত।

এই পরিবর্ত্ত ক্রিয়ার অপর সকল বিষয় রহিয়া গেল কেবল জাতিভেদ প্রথাটী যে একেবারে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল সেইটী বিফল হইল। বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব সময়ে যে আর্য্যাবর্ত্তভাগের ব্রাহ্মণেরা সুখাভিলাষী এবং সমাজশাসনে অমনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহার অনেকানেক নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যভাগে তখনও ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মণ্যতেজঃ অক্ষুণ্ণ ছিল, শাস্ত্রে অধিকার ছিল, আচার পবিত্র ছিল এবং তর্কশক্তি সুমার্জ্জিত ছিল। সেই দাক্ষিণাত্যের প্রান্তবর্ত্তী কানারা দেশে শঙ্করস্বামী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য

এবং বিচার দক্ষতায় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা পরাজিত হইল, বেদার্থ প্রকাশিত হইল এবং হিন্দু ধর্ম্মমত বৌদ্ধাধিকাররূপ অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া পুনর্ব্বার জ্যোতির্ম্ময়রূপে দৃষ্ট হইল। জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গেল না; কিন্তু বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবের ফলস্বরূপ আরও কতকগুলি সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া রহিল। এই পঞ্চম পরিবর্ত্ত।

ঐ পঞ্চম পরিবর্ত্তের পরবর্ত্তী কোন সময়ে আর কয়েকটী বিশেষ নিয়ম হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। সেগুলি কয়েকখানি অপ্রধান পুরাণ এবং উপপুরাণে নিবদ্ধ হইয়া আছে। সেই নিয়মগুলির প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহাদিগের সংস্থাপনই বা কিরূপে হইয়াছে তাহা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। ঐ নিয়মগুলি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে নিবদ্ধ। বোধ হয় ছন্দানুরোধেই উহারা পরস্পর সঙ্গতিক্রমে ব্যবস্থাপিত হয় নাই। কিন্তু নিয়মগুলির প্রকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উহারা পৃথক পৃথক চারিটী শ্রেণীগত। তাহার দুই শ্রেণী আচারবিষয়ক, আর দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর নিয়মগুলি কতকটা বৌদ্ধবাদের অনুকূল, অপর শ্রেণী উহার প্রতিকূল।

বৌদ্ধবাদের প্রাবল্যে শূদ্রাদি সকল জাতীয় লোকেই যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেড়াইত। কোন সমাজের অধিক লোক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষোপজীবী হইলে সমাজের ক্ষতি হয়। অতএব সমাজের হিতার্থ নিয়মিত হইল যে (১) দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য করিবে না; (২) কমণ্ডলু ধারণ করিবে না; (৩) অতি দুরস্থিত তীর্থদর্শনে গমন করিবে না; (৪) সমুদ্রযাত্রা করিবে না; (৫) বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন কবিবে না। পূর্ব্বে আর্য্যদিগের মধ্যে একটী বিধান ছিল যে, অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা অথবা ভৃগুপতন দ্বারা স্বেচ্ছাতঃ আপনাপন জীবন ত্যাগ করিতে পারিতেন। অনুমান করা যায় যে, আর্য্যদিগের মধ্যে ঐরূপ আত্মহত্যা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহার বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছিল, অতএব (৬) ভৃগুপতন এবং অগ্নিপ্রবেশও নিষিদ্ধ হইল। উল্লিখিত নিয়মগুলি বৌদ্ধবাদের প্রতিকূল।

কিন্তু অপর কতকগুলি আচারবিধি যাহা বৌদ্ধবাদের সময় বিশেষ

বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, সেগুলির উচ্ছেদ চেষ্টা হয় নাই; ওগুলি সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হইল। (১) অতিথি সৎকারে পশু হনন নিষেধ। (২) শ্রাদ্ধাদিতে মাংসের ব্যবহার নিষেধ এবং (৩) অশ্বমেধ (৪) গো-মেধ এবং (৫) নরমেধ যজ্ঞ নিষেধ।* এইগুলি পূর্ব্ব হইতেই ন্যূন হইয়া আসিতেছিল, বৌদ্ধ প্রাবল্যের সময় স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ নিরসনের পরেও স্থগিত হইয়া রহিল।

যেমন আচার-কাণ্ডগত নিয়মগুলি দ্বিবিধরূপে—কতকগুলি বৌদ্ধবাদের প্রতিকূলে আর কতকগুলি তাহার অনুকূলে ব্যবস্থাপিত হইল, তেমনি ব্যবহার কাণ্ডের নিয়মগুলিও কতক বৌদ্ধবাদের প্রতিকূলে ও কতক অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট হইল।

বৌদ্ধাচারে বিবাহ-বিচারটা প্রায় নাই বলিলেই হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং বিশিষ্টরূপেই বিজিতেন্দ্রিয় ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইবার পর, কি ভারতবর্ষে, কি তাহার বহির্ভাগে কোথাও বৌদ্ধ মতাবলম্বীদিগকে বিশেষ সংযমী বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে জাতিভেদ প্রথা শিথিল করিয়া দিয়া বৌদ্ধেরা নিতান্ত ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল। সেই দুষ্টাচারের মূলোচ্ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে নিয়মিত হইল যে, (১) দত্তক এবং ঔরস ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পুত্র হইবে না। (২) অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ হইবে না, (৩) দেবরের দ্বারা সন্তানোৎপত্তির বিধি চলিবে না। (৪) বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান হইবে না। (৫) বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবে না। এই সকল বৈবাহিক নিয়মের পোষকস্বরূপ ভোজনের নিয়ম হইল, (৬) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ নিজ দাস, গোপাল প্রভৃতির অন্ন ভোজন করিবে না (৭) শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পাক ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে না।

উল্লিখিত আচার ব্যবহারের নিয়মগুলি কোন রাজব্যবস্থা বলিয়া প্রচারিত হয় নাই—কিন্তু তখন হিন্দু রাজার অভাব ছিল না। ওগুলি কোন ঋষির বাক্য, অতএব অবশ্যকরণীয় শাস্ত্রশাসন একথাও বলা হয় নাই। কিন্তু তখনও ঋষি সকল ছিলেন। ওগুলি মহাত্মাদিগের কর্ত্তৃক এবং পণ্ডিতদিগের কর্ত্তৃক এবং বুদ্ধিমানদিগের কর্ত্তৃক সমাজের রক্ষার্থ

নিরূপিত এবং ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল—এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। আর একটি অপূর্ব্ব ভাবে ঐ সংস্কার কার্য্যটী নির্ব্বাহিত হইয়াছিল দেখা যায়। ইহাতে কোন ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের উল্লেখ মাত্র নাই। ভারতবর্ষে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের কোন কথা না উঠাই উচিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে এখান হইতে বেশী কথা বা উচ্চকথা আর কোথাও হয় নাই—হইতে পারিবেও না। রাজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় মতবাদ, খৃষ্টীয় মতবাদ এবং বৌদ্ধ মতবাদ সকলগুলিই অতি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। তিনি সকল দেখিয়া শুনিয়া বৈদিক উপনিষদেই ধর্ম্মের সার তত্ত্ব আছে জানিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিছু কোরাণ, কিছু বাইবেল, কিছু ধর্ম্মপদ হইতে লইয়া পাঁচ ফুলে ধর্ম্মসাজি পুরাইতে হয় নাই। আপেক্ষিকত্ব পরিহার দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা সোপেনহারও বলিয়া গিয়াছেন—"বৈদিক উপনিষদ শাস্ত্র পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয়, ঐগুলি আমার জীবনের সুখ এবং মৃত্যুকালের একমাত্র সম্বল।"

জাতীয় ইতিবৃত্ত।

নব্য ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে তাতারীয়দিগের ন্যায় সন তারিখ দেন, ইহাঁরা ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় কার্য্যকারণসূত্র ঘটাইবার জন্য চেষ্টা করেন, ইহাঁরা গ্রীক্ এবং রোমীয়দিগের ন্যায় স্বজাতি পক্ষপাত এবং স্বদেশ গৌরব খ্যাপন করেন, আর য়িহুদীদিগের ন্যায় ঐতিহাসিক ব্যাপারে বিশ্বপাতা ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দেখিতে পান।

ঐতিহাসিক ব্যাপারে কারণ পরম্পরা কিরূপ কার্য্যকারী তাহা বুঝিবার দুইটী পরস্পর পৃথক্ ভাব আছে। এক ভাব এই যে, যাবতীয় ঘটনা পরম্পরায় সমালোচন করিয়া যখন ঐগুলির চরম ফল কি হইবে তাহা কতকদূর স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, তখন এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, ঐ চরম ফল উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে। ইহার নাম সেশ্বর ভাব। আবার যদি ঐ ঘটনা

পরম্পরার চরমফল বুঝিয়া তৎপ্রতি কোন উদ্দেশ্যবিশেষের আরোপ না করা যায়, অর্থাৎ ঘটনা সকল ঐ ঐ রূপ হওয়াতে এইরূপ চরম ফল হইবে এই মাত্র বুঝিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায়, তাহার নাম নিরীশ্বর-ভাব। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ফলাফল বিচার সম্বন্ধে সেশ্বর ভাবের পথ যাহা, নিরীশ্বর ভাবের পথও তাহাই। সে পক্ষে ঐ দুইটী ভাবের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

এই জন্য ভারত ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান কয়েকটী ঘটনার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি উল্লিখিত সেশ্বর এবং নিরীশ্বর উভয় ভাবের উপযোগী শব্দ সকল প্রয়োগ করিব—তাহাতে প্রকৃত বিচারের কোন দোষ নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তের প্রাথমিক ব্যাপার সমস্ত বৈদিক গ্রন্থসমূহে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, আর্য্যঋষিগণ এই মহাদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া কৃষ্ণকায়, বিকৃতাকার, বিরুদ্ধাচার, শিল্পজ্ঞান এবং ধর্ম্মজ্ঞানপরিশূন্য, পরস্পর অসম্বদ্ধ, বহুরূপ ভাষাবিশিষ্ট, বিভিন্নগোষ্ঠীয় বন্যদশাপন্ন নরগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং, তাহাদিগকে দস্যু, দৈত্য দানব, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। উহারা আর্য্যবংশীয়দিগের সহিত নিরন্তর বিবাদ করিয়া পরিশেষে দমিত হইয়া যায় এবং তাহাদিগের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া কৃষি এবং শিল্পাদি শিক্ষা করে।

বৈদিক মন্ত্রাদির আধুনিক ব্যাখ্যাতৃগণ কেহ কেহ যে সর্ব্বস্থলেই সৌরভাবের বা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যঞ্জনা বাহির করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী কালের সম্বন্ধে সত্য হইলেও মূলতঃ সত্য নহে। বজ্রধর ইন্দ্র, চক্রধর বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যে সকল দৈত্য দানবাদির বিনাশসাধন করিয়াছিলেন তাহারা সম্ভবতঃ মানবশরীরী আর্য্যকুলবিদ্বেষ্টা অতি দুর্দ্দান্ত লোক ছিল। বৃত্র, অহি এবং পাণি প্রভৃতি বৈদিকদেবদ্বেষ্টৃবর্গ প্রথম হইতেই সজল-মেঘ, অন্ধকার এবং কুজ্ঝটিকার স্থানীয় ছিল না, কালে তাহাদিগের স্বরূপের স্মৃতি বিলোপ হইয়া গেলে উহারা কবিগণের হস্তে ঐ সকল আকার ধারণ করিয়া উঠে।

ফলকথা, প্রাকৃতিক বস্তু এবং শক্তি সকলে যে বিশিষ্ট সজীবতা এবং

মানবভাবের আরোপ হয়, তাহারও মূল ঐতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখ, পুরাণোক্ত যে সকল দেববিদ্বেষীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ অতি প্রাচীন বলিয়া উল্লিখিত—উহারা সত্যযুগের লোক। কিন্তু উহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্ন, ব্রহ্মর্ষিদেশ বা পঞ্জাবের প্রত্যন্তভাগেই পাওয়া যায়। মুলতানে হিরণ্যকশিপুপুত্র-স্তম্ভ বলিয়া একটা উচ্চভূমি প্রদর্শিত হয় এবং সেখানকার অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অদ্যাপি হিরণ্যকশিপুঘাতী নরসিংহদেবের উপাসক। অতএব হিরণ্যকশিপু কখনই বিশুদ্ধ কবিকল্পনা নহে। বৃত্রাদির স্থলেও ঐরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

আদিম অধিবাসিগণ দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের সংস্রবে উৎকর্ষ লাভ করিতে এবং তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকালের দাসত্ব এখনকার ইউরোপীয়দিগের প্রবর্ত্তিত দাসত্ব প্রণালীর ন্যায় অতি কঠোর ব্যাপার ছিল না। আমি সেই পূর্ব্বকালের দাসত্ব দশার অতি ঈষন্মাত্র চিহ্ন উড়িষ্যা ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিয়াছি। খাণ্ডাইত জাতীয় অতি সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তির গৃহে দিন কয়েক অতিথি হইয়াছিলাম। সেই গৃহে কয়েকটী সুন্দর যুবা পুরুষকে ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা কোন জাতীয়। শুনিলাম, উহারা "পাউলিপুয়া" অর্থাৎ উহারা গৃহ-পালিতা দাসীদিগের গর্ভজাত পুত্র। পূর্ব্বেও এই প্রণালীতে আর্য্যদিগের গৃহে গৃহে উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই কারণেই প্রথমে ব্রহ্মর্ষিদেশ তদনন্তর ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ এবং পরিশেষে সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি কিয়ৎপরিমাণে আর্য্যলক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যের বাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে।

মনুসংহিতায় স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে অনুলোম বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি তেমন দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। উচ্চপুরুষ নীচকুলের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন—কিন্তু নীচকুলের পুরুষ উচ্চ কুলের কন্যা গ্রহণ করিলে বড়ই দোষ হইত। এই অনুলোম বিবাহের ব্যবস্থা এবং বিলোম বিবাহের নিষেধ যে জীবমাত্রের স্বভাবসিদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

ইহারই প্রভাবে ভারতবর্ষের সমুদায় উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যভাগও অনেক দূর পর্য্যন্ত আর্য্যলক্ষণাক্রান্ত হইয়া গেল। শুদ্ধ শারীর লক্ষণেই যে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর সাদৃশ্য হইল তাহা নহে, যেমন আর্য্য পুরুষদিগের ঔরসে আদিমনিবাসী স্ত্রীদিগের গর্ভে সুন্দরশ্রী সন্তান সকল জন্মিয়া পরস্পর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল, তেমনি আদিম জাতীয়দিগের বিবিধ ভাষার প্রতি আর্য্যভাষা সংস্কৃতের বলপ্রয়োগ হওয়াতে প্রাকৃতাদি ব্যাপকতর ভাষাও জন্মিল, আর অনার্য্যজাতীয়দিগের উপাসিত এবং পূজিত বিভিন্ন দেবদেবীগুলিও আর্য্যঋষিদিগের শাস্ত্রমধ্যে পরিগৃহীত হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ করিয়া উঠিল।

কিন্তু উল্লিখিতরূপে যেমন শারীরসাদৃশ্য, ভাষা সাদৃশ্য এবং ধর্ম্ম সাদৃশ্য জন্মিয়া উঠিল, অমনি তাহার অবশ্যম্ভাবি ফলও ফলিল। বিলোমসঙ্কর উৎপন্ন হইতে লাগিল, প্রাকৃতাদি ভাষার প্রচলন সংস্কৃতের অপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং ধর্ম্মভাবে আধ্যাত্মিকতা ন্যূন হইয়া অনুষ্ঠানমাত্রের আড়ম্বর প্রবল হইল। ব্রাহ্মণদিগের আর পূর্ব্বের মত শ্রীও রহিল না, বিদ্যাও রহিল না, আর তপঃপ্রবৃত্তিও রহিল না।

যখন আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যতেজঃ অতি বিস্তৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্তিমিত ভাব প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখনও দাক্ষিণাত্যে উহা সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল—সাগরসঙ্গম স্থলে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইলেও নদীর উচ্চভাগে জোয়ারের জল অনেকক্ষণ চলিতে থাকে। সরযূ, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, সরস্বতী তীরে, অযোধ্যা, কাশী, প্রয়াগ, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা প্রভৃতি স্থানে আর্য্যের তেজ কম, কিন্তু রেবাতটবর্ত্তী বিশালায়, শিপ্রাসন্নিহিত উজ্জয়িনীতে, গোদাবরী সমীপস্থ নাসিকে আর কাবেরীতীরে ও কাঞ্চীপুরে ঐ তেজঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইয়া চলিল এবং অনার্য্য গোষ্ঠীয়রা কিয়ৎপরিমাণে আর্য্যভাববিশিষ্ট হইতে লাগিল। ও প্রদেশে আর্য্যতেজস্বিতার হ্রাস হয় নাই।

আর্য্যভাব যে প্রদেশে অতি প্রবল হইয়া প্রথমেই বিশিষ্টতা পরিহার করিয়াছিল সেই অযোধ্যা প্রদেশেই ক্ষত্রিয় রাজকুলে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইলেন এবং নীতির প্রাধান্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপ্রাধান্য, তপোবলের

উৎকর্ষ এবং জাতিভেদের অপকর্ষ অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের সাম্যবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শুষ্ক ইন্ধন অগ্নি পাইবামাত্র জ্বলিয়া উঠে, তেমনি সাম্যভাবপ্রাপ্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বৌদ্ধধর্ম্মে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অশোক, বিম্বসার প্রভৃতি অধিরাজবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। শূদ্রজাতীয়েরা যতি ধর্ম্মে অধিকার প্রাপ্ত হইল। প্রাকৃত হইতে অনধিক ভিন্ন পালি বা পারীভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ সকল বিরচিত হইতে লাগিল এবং বৈদিক ধর্ম্মের স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত বৌদ্ধ যতিগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেন—দাক্ষিণাত্য ছাড়াইয়া লঙ্কাদ্বীপে, যব দ্বীপে, মালাকা, ব্রহ্ম এবং চীনে স্বধর্ম্ম বিস্তার করিতে গেলেন। দূরবর্ত্তী দেশ সকল উহাঁদিগের সাম্যবাদের স্থল হইল। উহাঁরা চীন, ব্রহ্ম, জাপান. তাতার প্রভৃতি ভূভাগকে স্বতঃ পরতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন—ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা রূপে গুণে অনেকটা সমপ্রকৃতিক। কিন্তু ভারতবর্ষে তখনও জনগণের মধ্যে সম্যক্ সমভাব জন্মে নাই। দাক্ষিণাত্যের লোক সকল যে আর্য্যাবর্ত্তের জনগণ হইতে কত বিভিন্ন তাহা যিনি একবার ঐ প্রদেশে গিয়াছেন তিনিই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। আবার কি দাক্ষিণাত্য, কি আর্য্যাবর্ত্ত উভয় প্রদেশের লোক সকল হইতে বন এবং পর্ব্বতনিবাসী ভিল, গোন্দ, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতির বৈলক্ষণ্যের সীমা নাই—ইহারাই বোধ হয় আদিম অধিবাসীদিগের বংশধর। তদ্ভিন্ন কি আর্য্যাবর্ত্তে, কি দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই সম্প্রদায় এবং বর্ণভেদে জনগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্যই আছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর্য্যজাতীয়দিগের রূপ গুণ অপর জাতীয়দিগের অধিকাংশ ব্যক্তি অবিকল প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ অন্তর্বাহ্য ভেদ বিদ্যমানে সাম্যবাদ কখনই গৃহীত হইতে পায় না। (এই জন্য বৌদ্ধধর্ম্মটী আপন জন্মভূমি ভারতবর্ষের মধ্যে স্থান পাইল না।)

ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত সীমায় যে কানারা নামে একটী প্রদেশ আছে তাহা সর্ব্ব দক্ষিণে, এই জন্য তথায় ব্রাহ্মণদিগের প্রদেশ সর্ব্বশেষেই হয়। সেখানে গিয়া অনার্য্যরীতির উৎসাদনার্থ তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপেই চেষ্টান্বিত থাকিতে হয়। ঐ ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজঃ ন্যূন হইয়া যাইতে

পায় নাই। তাঁহাদিগকে আচারপূত এবং বেদবিদ্যার অনুশীলনে রত থাকিতে হইত। সেই কানারা প্রদেশীয় নাম্বুরি ব্রাহ্মণবংশে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন। যেমন ব্রাহ্মণ তেজঃ উপশান্ত অযোধ্যায় বুদ্ধদেবের জন্ম তেমনি ব্রহ্মতেজে উদ্দীপিত কানারা প্রদেশে শঙ্করের জন্ম। শঙ্করাচার্য্য দিগ্‌জয় করিলেন—বৌদ্ধেরা তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইল। বৈদিকধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনা হইল। কিন্তু সেই পুনঃসংস্থাপিত হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধবাদ মিশিয়া গেল। শূদ্রাদির দীক্ষা গ্রহণ এবং ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার রহিল, আর ক্রিয়াকাণ্ড যে জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা হীনমার্গ তাহাও স্বীকৃত হইল। (বৌদ্ধ নিরসনের পর হইতে হীনবর্ণে বিবাহ, বিধবার দ্বিতীয় পরিণয়, কমণ্ডলু ধারণরূপ যতিলক্ষণ গ্রহণ—এইরূপ কতকগুলি কার্য্য রহিত হইয়া যায়।)

হিন্দু সমাজে খাওয়া দাওয়া।

হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদের মূল কথা যে, উদ্বাহ ব্যাপারের পার্থক্য, তাহা দুই দশটী বুদ্ধিমান ইংরাজ ভিন্ন আর কাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। জাতিভেদকে অধিক লোকেই একত্রে পানভোজনের প্রতিষেধক মনে করেন এবং মুসলমানদিগকে এক সানকে এবং ইংরাজদিগকে এক টেবিলে খাইতে দেখিয়া হিন্দুদিগের ভিন্নরূপ ব্যবহারকে কুসংস্কারজাত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশীয় কোন আদমসুমারী বিজ্ঞাপনের এক স্থানে একজন সিবিলিয়ান প্রকৃতই লিখিয়াছেন—"বিবাহ-পার্থক্যই জাতিভেদের প্রকৃত দুর্গ, অসবর্ণদিগের মধ্যে একত্রে পান ভোজনাদির নিষেধ সেই দুর্গের বহিঃস্থ প্রাচীর মাত্র।"

কোন কোন ইংরাজ বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে, ভারতবাসীরা তাসের কাগজের ন্যায় বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন বর্ণ। বাস্তবিক কোন এক দেশীয় এবং এক জাতীয় লোকের মধ্যে এত বর্ণ এবং এত রূপ-বৈচিত্র্য নাই। ফলতঃ সেই কারণেই এখানে অসবর্ণে বিবাহ প্রতিষিদ্ধ এবং তাহারই সহিত একত্রে ভোজনও প্রতিষিদ্ধ।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে প্রদেশে রূপবৈচিত্র্য কম সেই সেই প্রদেশে খাওয়ার আঁটাআঁটিও কম। পঞ্জাবে কাহার বা ঝিমর বা জাঠ বা অপর জাতীয় লোকদিগের দাউল, রুটি প্রভৃতি পক্ব ভোজ্য সামগ্রীর খোলা দোকান আছে—ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া খায়। সমুদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যা প্রদেশে পক্ব মাংস এবং ব্যঞ্জনাদি কাহার কুর্ম্মি প্রভৃতি জাতীয়েরা মাথায় করিয়া বহে এবং ক্ষত্রিয়, রাজপুত, লাল্লা প্রভৃতিরা তাহা গ্রহণ করে। উহাতে কিছু মাত্র স্পর্শদোষ হইয়াছে মনে করে না। বিহার অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশেরও অনেকানেক স্থানে ভৃত্যেরা মাংস ও ব্যঞ্জনাদি রান্ধিয়া দিলে—ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই খায়। পঞ্জাবে জনগণের মধ্যে রূপভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প, সেখানে সকল খাওয়াই একত্রে চলে। উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, এবং মধ্য প্রদেশাদিতে রূপভেদ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক, সেখানে ভাত, দাউল, রুটি- -এই তিনের "আয়েব" আছে আর কিছুরই নাই। বাঙ্গালায় এবং উড়িষ্যায় রূপভেদ আরও অধিক; ঐ সকল প্রদেশে আচমনীয় মাত্রেই নিষিদ্ধ; তবে লুচি, কচুরি, মণ্ডা, মিঠাইয়ের চলন আছে। ও সকলে বড় একটা স্পর্শ দোষ ধরা হয় না। কিন্তু, দাক্ষিণাত্যে রূপভেদ সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক এবং ওখানে উচ্চ শ্রেণীর লোকে নিকৃষ্ট জাতীয়দিগের হস্ত হইতে ফল জল লওয়াতেও অনেকটা দোষানুভব করে। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতীয়ের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করেন না।

খাওয়ার আঁটাআঁটিও যে প্রদেশে যত কম বিবাহের বৈবাহিক সম্বন্ধে জাতি বিচারের আঁটাআঁটিও তথায় সেই পরিমাণে কম। (১) আমার একটী পঞ্জাবী আত্মীয় তাঁহার পত্নী সমভিব্যাহারে আমার বাটীতে দিন কয়েকের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ক্ষত্রিয়কন্যা, তিনি স্বয়ং জাঠ। সমাজে তাঁহার তত দোষ ধরে না। (২) কোন সময়ে কনোজ নগরে একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আবাসে ছিলাম। তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন এবং আমার প্রতি ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন। এক দিন উভয়ে একত্রে বসিয়া আছি এমন

সময়ে কোন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের যজ্ঞোপবীত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। উভয়ের যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে বুঝিলাম যে যাঁহার উপনয়ন সংস্কার হইবে তিনি ঝিমর জাতীয় দাসী গর্ভজাত। এতদিন তাঁহার মাতার মাতা জীবিতা ছিলেন বলিয়াই উপনয়ন দেওয়া হয় নাই, এখন হইবে; এবং সমাজে ঐ বালক ব্রাহ্মণ বলিয়াই একরূপ চলিয়া যাইবে। (৩) বিহার অঞ্চলের 'দেও' নামক গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয়ে কতকগুলি বিশেষ শ্রীমতী কাহার জাতীয়া বালিকাকে দেখিয়া জানিয়াছিলাম যে, উহারা ক্ষত্রিয়ের ঔরস সম্ভূত। কাহারদিগের মধ্যে উহাঁদের জাতি সম্বন্ধে কোন দোষই ধরে না। (৪) উড়িষ্যা প্রদেশে একজন সম্ভ্রান্ত মাইতির বাটীতে কতকগুলি সুন্দর-মূর্ত্তি ভৃত্য দেখিয়া তাহাদিগের জাতি জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম উহারা "পাতলিপুয়" বা দাসীগর্ভজাত সন্তান। উহারা পরিচয় দেয় "শ্রীকরণ", সমাজেও চলে। (৫) দাক্ষিণাত্যের অনেকানেক স্থানে স্মার্ত্তাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কুমারদিগের বিবাহে অতিরিক্ত পণ লাগে। আর্য্যাবর্ত্তে কন্যার পণ গ্রহণ যত দোষ বলিয়া গণ্য ঐ সকল প্রদেশে তত দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় না। ঐ সকল প্রদেশে অপ্রকাশ্যেও অসবর্ণা গ্রহণ কম হয়। (৬) দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দ্রাবিড় প্রদেশগুলিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবল, মহারাষ্ট্রে শৈবধর্ম্ম বলবান। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবেরা রামানুজ সম্প্রদায় সম্ভুক্ত। রামানুজ সম্প্রদায়ীরা যদিও বাঙ্গালার চৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বীদের ন্যায় জাতিভেদ বিরোধী নহে তথাপি শৈব এবং স্মার্ত্ত বৈষ্ণবদিগের অপেক্ষা জাতিভেদের অল্প বিদ্বেষ করে। ফলেও দেখা যায় যে, দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণেরা আর্য্যাবর্ত্তের এবং মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কুরূপ।

ফলতঃ যেখানে খাওয়া দাওয়ার আঁটাআঁটি কম সেখানেই বৈবাহিক সম্বন্ধ ও উৎপত্তির কথা (অর্থাৎ জাতির খুঁত) কম বাছা হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, (ইংরাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে যাহাদের খাওয়া দাওয়ার কোন বিচারই নাই তাহাদের মধ্যেই অসবর্ণবিবাহাদির ইচ্ছা জন্মিতে পারে।)

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত তথ্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে ঐ

বিষয়ে যে সকল কথা সর্ব্বদাই শুনা গিয়া থাকে, তদ্বিষয়েও কিছু বক্তব্য আছে। কেহ কেহ বলেন, একত্রে পান ভোজন না হইলে সামাজিকতার বৃদ্ধি হয় না, পরস্পর দৃঢ় সম্মিলন হয় না এবং জাতীয় ভাব জন্মিতে পারে না। একথাগুলি প্রকৃত কথা নয়। এক মুসলমান ছাড়া, পৃথিবীতে অপর কোন জাতি নাই যাহাদিগের মধ্যে সকল লোকের একত্রে পান ভোজন প্রচলিত আছে। ইংরাজেরাও সকলে একত্রে খায় না। "স্যর" উপাধিধারী কোন সম্ভ্রান্ত সিবিলিয়ান কোন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলে, তত্রত্য অপরাপর ইংরাজেরা তাঁহার স্থানে একটী ভোজ যাচ্ঞা করিয়াছিল। তিনি খুব সমারোহপূর্ব্বক ভোজ দিলেন। জিলার জজ সাহেবকে ছাড়িয়া অপর সকলের নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু স্বয়ং ভোজে বসিলেন না; এমন কি ঐ সময়ে বাটীতেও রহিলেন না, অপর এক জনের প্রতি অভ্যর্থনাদির ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং আণ্টা খেলিবার ঘরে গিয়া আণ্টা খেলিতে লাগিলেন!

আমার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দসম্পন্ন কোন ইউরোপীয় আমাকে তাঁহার সহিত একত্রে ভোজন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, আমি তাহা অস্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি অস্বীকার করিলে, আমি আর জিদ করিব না, কিন্তু কেন অস্বীকার করিলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে।" আমি বলিলাম, "তোমার সহিত একত্রে ভোজন করা আমাদিগের সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহা অপেক্ষা গুরুতর কারণ আর কি হইতে পারে? তদ্ভিন্ন, ভাবিয়া দেখ, আমাদের আর কি আছে? আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা গিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মের প্রতি তোমাদের আক্রমণ হইতেছে, আমাদের সাহিত্য শাস্ত্রও এপর্য্যন্ত এমন ভাব ধারণ করে নাই যে, তজ্জন্য বিশেষ আত্মগৌরব জন্মে। আমাদের আত্মগৌরবের এবং স্বাতন্ত্রিকতার বস্তু আর কি আছে? থাকিবার মধ্যে কুসংস্কারই বল আর সমাজনিয়মই বল, এই জাতিভেদ এবং আচার ভেদ আছে, আমি তাহারও বিসর্জ্জন দিতে পারি না।" তিনি বলিলেন, "আর কখন তোমাকে ওরূপ অনুরোধ করিব না—আমি ঐরূপ কুসংস্কারগুলিকে বিশিষ্ট সম্মান করিয়াই

চলিয়া থাকি ; প্রত্যুত সকল প্রকার কুসংস্কারবিচ্যুত ব্যক্তি যদি কেহ থাকেন, তিনি হয় পরম জ্ঞানী অথবা "সবল্লোঠ" হইবেন—আমরা কেহই পরম জ্ঞানী নহি, "সবলোঠ" হওয়া অনাবশ্যক।"

অপর কোন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে একত্র ভোজনের জন্য অনুরোধ করেন। আমি অস্বীকার করি। তিনি ইহার উহার তাহার নাম করিয়া বলিলেন—ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার সহিত খাইয়াছে। কিন্তু যখন তিনি আমার স্বীকৃতি না পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"বড় ক্ষোভের বিষয়! যাহাদিগের সহিত আমরা একত্র খাইতে চাই তাহারা স্বীকার করে না, আর মনে মনে যাহাদের সহিত চাহি না, তাহারাই খাইতে আইসে"। তখন বলিলাম "যদি মহাশয়ের সহিত ভোজন স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে যাহাদের সহিত চাহেন না আমিও সেই দলভুক্ত হইয়া যাইতাম না কি?" তিনি অপ্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

আমার স্থির নিশ্চয় এই যে, শুদ্ধ বিজাতীয় ভোগসামগ্রীর লালসায় সমাজপ্রচলিত ব্যবহারের বিপরীতাচরণে সামাজিকতার বৃদ্ধি, কি জাতীয় ভাবের প্রকৃত অনুশীলন কিছুই হয় না।

আর একটি কথা শুনা যায়—খাওয়া দাওয়ার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? ধর্ম্ম মনোগত কাজ, এটা খাইলাম বা ওটা খাইলাম না বলিয়া ধর্ম্মের হানি বা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। এটীও পাকা কথা নয়। আহার্য্যের সহিত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে। তদ্ভিন্ন এই সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির সর্ব্বাঙ্গব্যাপক হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্র আহারের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে ব্যবহারও অবিকল একরূপ নহে। হিন্দুরা এক গোমাংস ভিন্ন অপর সকল ভক্ষ্যই কোথাও না কোথাও ভোজন করে। মহারাষ্ট্র এবং দ্রাবিড়ের শূদ্র জাতীয়েরা মুর্গী খায়—বনভূমিনিবাসী যাবতীয় লোক, ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে শূকরমাংস ভোজন করে। আর মদ্যপান ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির পক্ষে শাস্ত্রেও তত নিষিদ্ধ নহে। অতএব আহারের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যে ততটা ঘনিষ্ট সংস্রব নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাচ্ছিল্যপূর্ব্বক দেশাচারের বিরুদ্ধ হইয়া চলা অতি অপকর্ম্ম। উহা কি জন্য অপকর্ম্ম, তাহা এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত

হইবে যে, স্বজনের সহিত সহানুভূতিই ধর্ম্মের বীজ; যেখানে সেই সহানুভূতি না থাকে, তথায় ধর্ম্মজ্ঞানের মূলেই কীট লাগিয়াছে বুঝিতে হয়।

পরধর্ম্ম গ্রহণ।

পৈত্রিক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণটা অতি গুরুতর ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু আমরা ও কাজটাকে যত গুরুতর মনে করি, ইউরোপীয়েরা ততটা করেন বলিয়া বোধ হয় না। ফরাসিদিগের ত কথাই নাই—উহারা যখন বোনাপার্টির সহিত মিশরে আসিয়াছিল, তখন উহাদিগের দলকে দল মুসলমান হইবে, এরূপ কথা উত্থাপন হইয়াছিল। কিন্তু জর্ম্মণ, ইংরাজ, আমেরিকান প্রভৃতি যে সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তুরক্ক সম্রাটের অধীনে সৈনিক বা অপরাপর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহারাও প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করে। আজি কালি চীন সাম্রাজ্যেশ্বরীও অনেকানেক ইউরোপীয় এবং আমেরিকান লোককে আপনার সৈনিক দলে প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা যদিও অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করে, কিন্তু মুসলমানদিগের ন্যায় উহাদের তত প্রৌঢ়ি নাই, এই জন্য যে সকল খৃষ্টানজাতীয় চীনদেশে চাকুরি পায় তাহাদিগকে বৌদ্ধ হইতে হয় না, কিন্তু নাম এবং পরিচ্ছদ চীনীয়দিগের অনুরূপ করিতে হয়। ঐ সকল লোকের মতে অন্নদাতা মনিবের যেমন অন্ন গ্রহণ করা যায় তেমনি তৎপ্রদত্ত বস্ত্র নাম এবং ধর্ম্মও লওয়া যাইতে পারে।

(হিন্দুরা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে আর যত অপকর্ম্ম করিতে পারুন, আপনাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না।) কেহ তলোয়ার উচ্চাইয়া বলিল, আমার ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নচেৎ কাটিয়া ফেলিব; হিন্দু ঐরূপ প্রাণভয়ে কখন কখন পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; কেহ দুর্ভিক্ষের সময়ে ভাত খাওয়াইয়া জাতি মারিয়া ফেলিল, হিন্দু অগত্যা ঐ জাতি মারাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল; অথবা হিন্দুর শিশুকে পাখি পড়াইবার মত করিয়া কোন ধর্ম্ম মন্ত্র পড়াইল, সে না বুঝিয়া তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিল। হিন্দুর স্বধর্ম্ম ত্যাগ এইরূপেই অধিক হয়।

হিন্দুদিগের তুল্য না হউক, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে ইহুদীয়েরা এবং

মুসলমানেরাও আপনাপন ধর্ম্মে দৃঢ় হইয়া থাকে। উহাদিগের ধর্ম্মে যাহা আছে তাহা অপেক্ষা খৃষ্টান ধর্ম্মে কোন উচ্চতর ধর্ম্ম ভাব নাই—আর হিন্দুধর্ম্মে, অধিকারী ভেদে, যে সকল ক্রমোন্নত ধর্ম্মভাব আছে তাহা অপর কোন জাতীয় লোকে অতিক্রম করা দূরে থাকুক, সম্যক্‌রূপে হৃদ্বুদ্ধ করিতেও পারে নাই, অপর জাতীয় বিশেষ তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরাই তাহা এপর্য্যন্ত কিছু কিছু বুঝিতেছেন মাত্র।

যাঁহারা উল্লিখিত প্রকৃত তথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন না, আর অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদিগের হইতে ভজাইয়া লয়, সুতরাং কালে হিন্দুধর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যাইবে। কথাটী বলিতে সহজ বটে, জমাখরচের হিসাবের উপর একটী কৈফিয়ৎ কাটার মত। কিন্তু কথাটী প্রকৃত নয়। বন পর্ব্বতাদি কুষ্টল নিবাসী কোল, ভিল, সাঁওতাল, মেক, গারো প্রভৃতি লোকেরা নিরন্তরই হিন্দু সম্প্রদায় সম্ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। তাহারা অন্ত্যজ জাতীয়দিগের দলপুষ্ট করিতেছে বটে, কিন্তু যে সকল হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছে তাহাদিগের পনর আনা তিন পাই কি অন্ত্যজ হিন্দু ভিন্ন অপর কিছু? দশ পাঁচটী ভদ্রবংশীয় হিন্দুও খৃষ্টান হইয়াছে দেখা যায়—কিন্তু হিন্দু দর্শন শাস্ত্র কি অপর ধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রবংশীয় সুশিক্ষিত এবং বিদ্যাবান্‌দিগকেও আপনার মতবাদ গ্রহণ করায় নাই? মুসলমানদিগের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'সুফি' সম্প্রদায় সেটী কি বেদান্ত-মত-বাদগ্রাহী মুসলমান নয়? জর্ম্মণ জাতির যে ট্রান্সেনডেণ্টাল দর্শন, তাহাও কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে এবং কতকটা পরম্পরাসম্বন্ধে বেদান্ত দর্শন-জ্ঞান সম্ভূত নয়? চৈতন্য মহাপ্রভু কত বড় বড় মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। পাদ্রি সাহেবেরা যদি তাঁহার সময়ে এদেশে থাকিতেন, তাঁহাদিগের অনেককেই তুলসী মালার কণ্ঠী ধারণ করিতে হইত। রামমোহন রায় শুদ্ধ মৌলবী-আবদুর রহিমকেই নিজ ব্রাহ্মমতবাদে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এমত নহে; পাদ্রি আদমকেও ঐ মন্ত্র গ্রহণ করাইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র উহার অধিকারী ভেদ ব্যবস্থা নিবন্ধন—কি হীনবুদ্ধি কি উন্নতবুদ্ধি সকলকেই আপনার আয়ত্ত করিতে সমর্থ।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক থিওসোফি মতাবলম্বী ইউরোপীয়দিগের উল্লেখ করা অনাবশ্যক। মান্দ্রাজ্ নগরের সমীপবর্ত্তী আডেয়ারের আশ্রমে শ্বেতাঙ্গদিগকে পদ্মবীজাদির মালা গলায় ও শুভ্র ওভরকোট এবং শুভ্র ইজার পরিধান, অনাবৃত পদ দেখিয়া উহাঁদিগের প্রচারিত মাসিক পুস্তিকা পাঠ করিয়া এবং সংস্কৃতের আলোচনায় প্রবৃত্তি দান দেখিয়া যতই সন্তুষ্ট হওয়া যাউক, উহাঁদিগের নিকট হিন্দুয়ানী যে খাঁটি ও সত্বগুণবিশিষ্ট থাকা সম্ভব নহে একথা সর্ব্বদাই মনে করা উচিত।

হিন্দুধর্ম্মের অতি ব্যাপকতা বশতঃ এ ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার প্রমাণ। তদ্ভিন্ন সকলের পক্ষেই আপন আপন পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কেবল পাগলামি। যে ব্যক্তির জ্ঞানোদয় যে পরিমাণ তাহার ধর্ম্মও ঠিক সেই পরিমাণে উন্নত বা অবনত হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রকৃত উন্নতি কোন একটী দুইটী সূত্র জানা থাকা বা না জানা থাকা নয়। ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল বস্তুর কথা বলে, যথা 'ঈশ্বর' 'পরকাল' 'প্রাক্তন' ইত্যাদির "অপ্রকৃত" হইতে "প্রকৃতভাব" পাওয়া আর কিছুই নয় সুধু "অপরিস্ফুট" হইতে "পরিস্ফুট" বোধ লাভ। এই জন্য একটী ধর্ম্ম গিয়া আর একটী হয় না। যেটী প্রথমাবধি থাকে সেইটীই বাড়ে বা কমে। একটী সুবোধ স্বদেশীয় যুবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়! দেশে ত এতগুলি ধর্ম্মপ্রণালী রহিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে কোন্ ধর্ম্মটী সত্য।" আমি বলিলাম "তোমার পক্ষে তোমার পিতার যে ধর্ম্ম তাহাই সত্য।" আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃ পিতামহাদি হইতে প্রাপ্ত যে সংস্কার সেই সংস্কারই ধর্ম্মমূল। অতি আত্মীয় কোন ইউরোপীয় আমাকে বলিয়াছিলেন—যে ব্যক্তি পৈত্রিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহার মস্তিষ্কের কোথাও না কোথাও একটু ফুটো আছেই আছে।" আমারও তাই বোধ হয়।

মস্তিষ্ক-সংস্থান শাস্ত্রে বলে যে মস্তিষ্কের সর্ব্বনিম্ন ভাগে পূর্ব্বপুরুষ এবং অধিক অভ্যাসজনিত সংস্কারসকল নিবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং মস্তিষ্কের অপরাপর চারিভাগ যাহাতে পাশবপ্রবৃত্তি, ভাবুকতা এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মে, সেগুলির স্থান ঐ সংস্কার নিবদ্ধ ভাগের উপরে। অতএব

পূর্ব্বগত সংস্কার মূলের সহিত যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিশ্লিষ্ট দেখায়, তাহার বিশ্লেষ যেন কোন অস্বাভাবিক আঘাত বলেই হইয়াছে বোধ হয় এবং তাদৃশ মস্তিষ্ক কোথাও ফুটো হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

হিন্দু সমাজ ধর্ম্মনীতি।

শাব্দ প্রমাণ অন্যান্য প্রমাণ অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার বল নিতান্ত অল্প নয়। 'ভগবান' নামক কোন ব্যক্তি অপর দশ জনের কথায় আপনাকে 'ভূত' বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ গল্পটীতে শাব্দ প্রমাণের বল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষাও উচ্চ বলিয়া দেখা যাইতেছে। অন্ততঃ পাঁচ জনে জড়িয়া একটা কোন কথা বলিলে, আর সেই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলে, উহা অনেকস্থলে সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া যায়। ইংরাজেরা কোন বিষয়েই আপনাদের ব্যাখ্যা বাহির করিতে ত্রুটি করেন না। উঁহারা অনুক্ষণ আপনাদের ধর্ম্মনীতিরও প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং ইংরাজী শিক্ষিত নব্যদলও শুক পক্ষীর ন্যায় ঐ বাক্যটী পুনঃ পুনঃ শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া লয়েন। কি করিবেন, ইংরাজীতে কথা কহিতে এবং ইংরাজীতে লিখিতে গেলেই ইংরাজের মত না বলিলে এবং না লিখিলে যেন যতিভঙ্গ দোষের ন্যায় একটা "এবারতে" দোষ পড়িয়া যায়। আজি কালি যে সে ইংরাজ বলিতেছেন, আমরা [illegible]ারতবাসীদিগের ধর্ম্মনী[illegible] উন্নত করিয়া দিতেছি—আর কৃতবিদ্যেরা সেই [illegible]থা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছেন। ভগবান আপনাকে ভূত বলিয়াই [illegible]নয়াছে।

[illegible]ন্তু [illegible] [illegible]র্ম্মনীতিকে উন্নত করিবার কোন ক্ষমতা কি ইংরাজ ধর্ম্ম-[illegible]? একটু ভাবিয়া দেখ। ইংরাজের এবং সকল ইউরোপীয় [illegible]ত গ্রীক্, রোমীয়, প্রাচীন জর্ম্মণ, ইহুদী এবং খৃষ্টীয় নীতি [illegible]। গ্রীকেরা স্বাধীনতা, স্বদেশহিতৈষা এবং সাহসিকতায় [illegible]। সৌন্দর্য্যবোধও তাহাদিগের অতি সুপরিস্ফুট হইয়াছিল—[illegible]রা শারীর সৌন্দর্য্যও বুঝিত আর মানস সৌন্দর্য্যও বুঝিত।

রোমীয়দিগের প্রকৃতি অতি ভীষণ এবং কঠোর ছিল। তাহাদের উগ্র পাশব ভাবের দময়িতা কেবল বিধিনিষ্ঠতা। রোমীয়রা স্বদেশীয় বিধি ব্যবস্থার লঙ্ঘন করিত না। প্রাচীন জর্ম্মণেরা রোমীয়দিগের অপেক্ষাও কঠোর এবং দুর্দ্দান্ত কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি গৌরবযুক্ত এবং একপত্নীক ছিল। তাহারা দস্যুবৃত্তি এবং দলবন্ধনে পটু ছিল। ইহুদী অপর সকল লোকের বিদ্বেষ্টা এবং স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে ইহকালপরায়ণ। খৃষ্টান পরকালটী মানে মাত্র। খৃষ্টানধর্ম্মে শান্তিশীলতা, নম্রতা, দানশীলতার উপদেশ আছে। আর পাপ কার্য্যের প্রতিও যথেষ্ট ভয় প্রদর্শন আছে। কিন্তু খৃষ্টান উপদেশের মূলে দুইটা বড় বড় গলৎ আছে। প্রথম গলৎ উহার দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ নিবন্ধন পৃথিবীর কতকটা ভাগ এবং পৃথিবীস্থ মনুষ্যের কতকগুলি, মূলতঃ দোষময়। সুতরাং খৃষ্টানেরা যেটাকে বা যাহাকে ঐ দোষময় ভাগের মধ্যে ধরিয়া লইতে পারে, তাহাই নষ্ট করিতে এবং নিপীড়িত করিতে উদ্যত হয়। কাথলিক খৃষ্টানদিগের এই দোষটা অধিক। স্পেনীয়রা এবং পোর্ত্তুগিসেরা সেই জন্যই ইউরোপীয়েতর জাতীয়দিগের প্রতি সয়তানের দলভুক্তবোধে যেখানে যতদূর পারিয়াছে অত্যাচার করিয়াছে। দ্বিতীয় গলৎ অনুগ্রহ-বাদ। অনুগ্রহ-বাদের তাৎপর্য্য এই যে মানুষ অবশ্যই আপনার কর্ম্মফল ভোগ করে না। ঈশ্বরে ইচ্ছাতঃ পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের তিরস্কার হয়। ঈশ্বরের প্রতি এ প্রকার স্বৈরাচারিতার আরোপ করিয়া ঐ মতাবলম্বীরাও নিজ স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। প্রটেষ্টাণ্ট ষ্টানদিগের মধ্যে এই বিশিষ্টরূপেই দেখা দিয়াছে*।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ইংরাজের ধর্ম্মনীতিতে যদি উহার দানগুলির মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরোধী সেগুলি বাদ তবে পাই—(১) স্বাধীনতা (২) স্বদেশহিতৈষা (৩) সৌন্দর্য্যবোধ (৫) বিধিনিষ্ঠতা (৬) এক পত্নীকতা (৭) (৮) স্বেচ্ছাচারিতা। উল্লিখিত আটটী থাকিল সাধারণ ইহুদী স্থানে প্রাপ্ত যে (১) পরজাতিবিদ্বেষ এবং (২) ঐহিক সহিত বিপরীত সম্বন্ধ খৃষ্টীয় উপদেশ সম্ভূত—(১) শান্তিশীল

(৩) দানশীলতা (৪) পাপভীতি। সুতরাং জাতিস্বভাবে ঐ দোষ এবং গুণ উভয়ের তেজঃ কিছু কিছু স্তিমিত হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ প্রাচীন জর্ম্মণ জাতির ঔদ্ধত্য খৃষ্টীয় নম্রতাদিকে ন্যূন করিয়া দিবে। অথবা শিক্ষাদি ভেদে কতক লোকের মধ্যে ঐ সকল দোষ, আর কতক লোকের মধ্যে ঐ সকল গুণ অধিকতর প্রবল হইবে। যাঁহারা ইংরাজের শুদ্ধ কথা শুনেন নাই বা বহি মাত্র পড়েন নাই—অথবা যাঁহারা উহাদিগের কথার এবং ব্যবহারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, ইংরাজ-ধর্ম্মনীতির উল্লিখিত ব্যষ্টীকরণ প্রকৃত হইল কি না।

হিন্দু ধর্ম্মনীতিকে উহার উপাদান ধরিয়া বিভাজিত করা অসাধ্য। আর তাহার প্রয়োজনও নাই। যে সকল সদ্‌গুণের কথা হইল, তাহার মধ্যে কোন্ উৎকৃষ্ট গুণটি হিন্দুর ধর্ম্মনীতির মধ্যে এবং এই জাতির স্বভাবে নাই? খৃষ্টীয় উপদেশে যাহা যাহা পাইবার তৎসমুদায়ই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। ঐ উপদেশে পরকালের কথা আছে, হিন্দুশাস্ত্র পর-কালে বিশ্বাস হিন্দুর অস্থিতে অস্থিতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছে। গল্প আছে যে, গ্রীক্ পণ্ডিত প্লেটো প্রণীত একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরকালের অস্তিত্বে এমন দৃঢ় বিশ্বাস জ[illegible]য়াছিল যে একটি গ্রীক যুবা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র দ্বারা পরকালে বিশ্বাস এতদূর হইয়া আছে যে, সেই অতিপূর্ব্বকাল হইতে আর এই সেদিন পর্য্যন্ত মুনি, ঋষি, বীর, যোদ্ধা, যুবা, বৃদ্ধ, বনিতা, অনেকেই অনায়াসে আপনাদের জীবন ত্যাগ করিয়া-ছেন। আর হিন্দুর শান্তিশীলতা নম্রতা এবং দয়ালুতা পৃথিবীতে আদর্শ-স্থলীয় হইয়া [illegible] তদ্ভিন্ন (১) আত্মনিবেদন ও (২) বাহ্য ভাব—ভক্তি পথে এই দুইটি, আর (১) সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন (২) সর্ব্বত্র আত্মদর্শন এবং (৩) একত্বমাত্র দর্শন, জ্ঞানপথে এই তিনটী, হিন্দুর ধর্ম্মেই আছে, আর যে হিন্দুর স্থানে শিখিয়াছে, তাহার ধর্ম্মেও আছে, অপর কোথাও নাই তদ্ভিন্ন, (১) পবিত্রতা (২) নিষ্কামতা, (৩) পরার্থ জীবন—এ সকলের কিছু [illegible]য়দিগের নাই। গ্রীক এবং রোমীয় উভয়েই অতি অপ[illegible] [illegible] জাতি ছিল। তাহাদিগের মধ্যে অতি প্রধান প্রধান লো[illegible] [illegible]ষ ছিল যে সে দোষের নাম করিতে নাই। খৃষ্টমতাবলম্বী

মধ্যেও একটি অপূর্ব্ব অপবিত্র বিচার প্রণালী আছে। উহাঁরা কেহ কেহ বলেন যে শরীর এবং আত্মা দুইটি পৃথক্ বস্তু। শরীর কৃত পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না এবং আত্মা যে পাপ করে, তাহা শরীরে লব্ধ হয় না! কি আশ্চর্য্য! আবার এই জাতির লোকেরা স্পর্দ্ধা করিয়া হিন্দুসন্তানকে ধর্ম্মনীতি শিখাইতে চায়!

যাউক, উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মভাবে যে ইউরোপীয়ের হিন্দুকে শিখাইবার কিছুই নাই, শিখিবার জিনিসই অনেক আছে, সে কথা নিশ্চয় হইল। এখন দেখা আবশ্যক যে নীচের দিকে হিন্দুর কিছু শিখিবার আছে কি না। আমার বোধ হয় একটি বিষয় বিশেষ শিক্ষণীয়ই আছে—সেটি দল বাঁধিবার ক্ষমতা। যদি হিন্দুরা ইংরাজের স্থানে ঐ ধর্ম্মটি শিখিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে আর কোন দুঃখই থাকে না। একটি ইংরাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি "উই" (we আমরা) বলিয়াছিলাম। তিনি একবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "দেখ, তোমার যদি আমরা বলিবার যো থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে থাকিতাম না!" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে দুইজনেও একমত হইতে অক্ষম!

কেহ কেহ মনে করিবেন, ইংরাজের একটি সৌন্দর্য্যবোধটাও শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি তাঁহাদিগকে বলি, একবার দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া আইস। কুম্ভকোণম, চিদাম্বরম, মদুরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ভাস্করীয় মূর্ত্তি এবং নির্ম্মাণ এখনও বিদ্যমান আছে, সেগুলি স্ব স্ব চক্ষে দেখ। বুঝিতে পারিবে, কি জন্য ভারতবর্ষ-বিদ্বেষী ইউরোপীয়রা ঐ সকল কীর্ত্তিকে গ্রীক কারুবর্গের কীর্ত্তি বলিয়া থাকেন।

আবার যদি কেহ বলেন ইংরাজের স্থানে একপত্নীকতা শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি বলিব একপত্নীকতা আমাদিগের শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসিত আছে। আর এক্ষণে একপত্নীকতা প্রায়ই সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

—**:**—

পারিবারিক নীতি।

ইংরাজ সমাগমে আমাদিগের অত্যুচ্চ ধর্ম্মনীতির উপর আঘাত হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট অধিকারী কখন অপকৃষ্ট অধিকারীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে পারে না।

কিন্তু আমাদিগের পারিবারিক রীতি নীতির দশা কি হইবে? ঐ রীতি নীতি যদি ইংরাজ রীতি নীতি হইতে তত উৎকৃষ্ট হয় অথবা এতদ্দেশের অধিকতর উপযুক্ত হয় তবে উহাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে নচেৎ উহা অবশ্যই কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থার মূল নিয়ম, পরিবারস্থ সকলের একত্রে মিলিয়া থাকা। উহারই অবশ্যম্ভাবি ফল—অল্প বয়সে বিবাহ।

আমাদিগের দেশ কৃষি-প্রধান, শিল্প প্রধান এবং বাণিজ্য-প্রধান নয়। কৃষি-প্রধান দেশ ভাল কি বাণিজ্য-প্রধান দেশ ভাল যদিও তাহার বিচারের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তথাপি ও বিষয়েও কয়েকটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংলণ্ড, হলণ্ড এবং বেলজিয়ম ভিন্ন পৃথিবীর অপর সকল দেশই কৃষি-প্রধান। এক্ষণে, ইংলণ্ড বাণিজ্য প্রধান হইয়াও অপরাপর কৃষি-প্রধান দেশ অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া আছে। কোন সময়ে হলণ্ডও খুব প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর হলণ্ডের পূর্ব্ব প্রাধান্যের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? জর্ম্মণেরা মনে করিতেছেন উহাকে এক দিন গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। বেলজিয়ম অতি ক্ষুদ্র বস্তু, কেবল অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের পরস্পর ঈর্ষা বশতঃ একটি স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে রহিয়াছে, ফ্রান্সের কবলীকৃত হয় নাই। ফলকথা, বাণিজ্যপ্রধান দেশগুলির বল কৃষিপ্রধান দেশের অপেক্ষা কখনই অধিক বলিয়া প্রতীত হয় নাই। প্রাচীন কাল হইতেও দেখ, ফিনিকীয়রা বাণিজ্য-প্রধান, কৃষিপ্রধান পারসিকদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল; বাণিজ্য-প্রধান কার্থেজ কৃষিপ্রধান রোম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল; এথেন্স কৃষিপ্রধান স্পার্টা কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল; বাণিজ্যপ্রধান বেনিস কৃষিপ্রধান অষ্ট্রীয়ার শরণাপন্ন এবং বাণিজ্যপ্রধান জেনোয়া কৃষি-প্রধান ফ্রান্সের দাস ছিল। অতএব বাণিজ্যপ্রধান হইলেই

যে কোনদেশ প্রবলতর এ কথা সত্য নহে। প্রত্যুত নেপোলিয়ান বোনাপার্টি স্পষ্টাভিধানে বলিতেন যে, কৃষি-প্রধান দেশের বল অনেক পরিমাণেই অধিক এবং উহা বিশিষ্টরূপেই স্থায়ী বল। তিনি ফরাসিদিগকে কৃষিপ্রধান থাকিবার নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোন দেশ কৃষিপ্রধান হইবে কি বাণিজ্যপ্রধান হইবে, ইহা কাহার উপদেশ বা পরামর্শের স্থল নহে। যে দেশের যেরূপ অবস্থান এবং যেরূপ প্রকৃতি, সে দেশ তদনুযায়ী হইয়া কৃষিপ্রধান বা বাণিজ্য প্রধান হইয়া উঠে। ফ্রান্স দেশ স্বতঃই কৃষিপ্রধান। উহাতে দ্রাক্ষার চাষ এত অধিক এবং উত্তম হয় যে ওদেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং অধিক মদ্য আর কোথাও জন্মে না। ঐ দ্রাক্ষাকৃষির বলেই ফ্রান্স এত বলবান এবং বলশালী। একজন ইটালীয় রসায়নবিৎ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের মৌয়া ফুল হইতে অবিকল ফরাসিদেশ-প্রস্তুত ব্রাণ্ডির ন্যায় ব্রাণ্ডি প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা এত অধিক এবং এত স্বল্প মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে যে ফ্রান্সকেও এখানকার ব্রাণ্ডি কিনিয়া খাইতে হয়। তাঁহার স্থানে ঐ কথা শুনিবার কিছুকাল পর হইতে দেখিতেছি যে ইটালী এবং ফ্রান্সে আমাদের মৌয়া ফুলের রপ্তানী হইতেছে। মৌয়া ফুল হইতে যে মদ্য এখানে জন্মে উল্লিখিত রসায়নবিৎ তাহার দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার উপায় বাহির করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার কাজই আমাদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রসায়না বিদ্যা প্রকৃতরূপে শিখিয়া এ দেশীয় কৃষি শিল্পাদির উৎকর্ষ সাধন চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। ঠিক ইংরাজদিগের অনুরূপ শিল্প বাণিজ্যাদি বিস্তারের চেষ্টা সফলও হইবে না, আর প্রয়োজনীয়ও নহে।

ফলকথা ভারতবর্ষ দেশ কৃষিপ্রধানই আছে, আর কৃষিপ্রধানই থাকিবে। যদি কৃষিপ্রধান থাকে, তবে সম্মিলিত পরিবার বা একান্নবর্তিতাও অবশ্য থাকিয়া যাইবে। কৃষিপ্রধান দেশমাত্রেই একান্নবর্তিতার অগৌরব নাই। যদি কোন কারণে কৃষিপ্রধান দেশে সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা ভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে সেই দেশে একটি বড়ই অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে। ভূমি-শূন্য এবং একান্ত নিরন্ন শুদ্ধ

মজুরদার লোকের সংখ্যা অতিবৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে মজুরদার লোক সকল বহুকাল ভূমিসম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকে না, পরিশ্রমশীল এবং মিতব্যয়ী হইলে অল্প দিনের মধ্যেই ভাগে বা অন্য প্রকারে প্রায়ই অল্প স্বল্প জমা জমি ভোগ করিতে পায়। কৃষিপ্রধান রুসিয়া দেশ আরও ভাল। সেখানে গ্রাম শুদ্ধ লোকের ভূমিতে মিলিত-স্বত্ব, সুতরাং গ্রামস্থ সকল লোকেই অল্প স্বল্প ভূমিতে চাষবাস করে। কেবল মজুরদারি করিয়া খায় এমন লোক নাই বলিলেই হয়। মূলে এই সম্মিলিত স্বত্বের ভাব আছে বলিয়াই রুসিয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার সম্মিলিত স্বত্ব জন্মাইবার এত চেষ্টা হইতেছে। রুসিয়ার মধ্যে যে সামাজিক (Socialist) এবং বিনাশক (Nihilist) দলের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার হেতু রুসিয়া সম্রাটের একাধিপত্য অথবা স্বেচ্ছাচারিতা নহে। ভৌমিক সম্মিলিত স্বত্বের অস্তিত্বই তাহার প্রকৃত কারণ। ফরাসিদিগের দেশেও ঐ সামাজিক (Socialist) এবং সম্মিলিতিক (Communist) দল আছে। কিন্তু তাহাদের অভ্যুত্থান স্বতন্ত্র কারণে হইয়াছে। পৈত্রিক ধন সম-বিভক্ত হইবার নিয়ম থাকায় এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী না থাকায় ভূমি সম্পত্তি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া যায় যে তাহার এক এক খণ্ড এক একটী পরিবার পোষণের যোগ্য থাকে না, সুতরাং বিক্রীত হয়। সেই গুলি বিক্রীত হইয়া গেলেই তাহার পূর্ব্ব অধিকারীরা একেবারে ভূমি-সম্পর্ক শূন্য হয় এবং তাহাদিগকে উপজীবিকার নিমিত্ত মজুরদারের পেশা গ্রহণ করিতে হয়। ঐ মজুরদার লোক সকলকে কাজ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই তাহারা উৎপাত করিতে আরম্ভ করে এবং কখন কখন রাষ্ট্রবিপ্লবাদি অতি তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে। ফ্রান্সের এই দল সর্ব্বদা অতুষ্টচিত্ত এবং রাজ্য শাসনের নিয়ম যখন যাহা থাকুক তাহা পরিবর্ত্ত করিয়া সুখী হইবার জন্য যত্নশীল হয়। ইংলণ্ডেও ভূমি সম্পর্ক রহিত শ্রমজীবী লোকের দারিদ্র্য অতি কঠোর। কিন্তু ইংলণ্ড শিল্পবাণিজ্যপ্রধান দেশ। ওখানকার শ্রমজীবীরা হয় স্বদেশীয় কলকারখানায় কাজ পায়, না হয় দেশ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষীয়েরা ওপথে যাইতে পারিবে না। গ্রেটব্রিটেনে সাড়ে তিন কোটি

মাত্র লোক। উহাদিগেরই সন্তান সন্ততি এত হয় যে শিল্পবাণিজ্য এবং উপনিবেশাদি দ্বারা তাহাদিগের খোরাক যোগাইতে সমস্ত পৃথিবীই যেন কুলায় না। ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি লোকের সন্তান সন্ততি যদি উহাদের মত শিল্প বাণিজ্য এবং উপনিবেশ দ্বারা আপনাদিগের আহার্য্য সাধন করিতে যায় তবে সমস্ত সৌর জগৎটা ইহাদিগের প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে।

অতএব সিদ্ধান্ত এই হইতেছে যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান থাকিবে এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী রক্ষা করিবে। যদি তাহাই হয় তবে কি এখানকার বৈবাহিক প্রণালী সাধারণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে? আমার বোধ হয় তাহা পারিবে না। এ দেশে বাল্যবিবাহই প্রচলৎ থাকিবে। দেশভেদে বিবাহের বয়স ভিন্ন হয়। শীতপ্রধান দেশমাত্রে অধিক বয়সে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশমাত্রে অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে।

অতএব অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া যে ভারতবর্ষীয়দিগের কোন একটা বিশেষ রোগ তাহা নহে। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এবং ইহার খুব উচ্চ স্থানীয়। উহাদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবার রীতি কন্যার ১৬ হইতে ২০বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে। অতএব বাল্যবিবাহের সহিত হিন্দুয়ানির তেমন কোন সংস্রব নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অধিক বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিতেন তাহার পরে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন। বৌদ্ধদিগের সময়ে যতি ধর্ম্মের আত্যন্তিক বাহুল্য দেখিয়া তাহাদিগের নিরসনের পর দীর্ঘব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে বং সেই অবধি অল্প বয়সে ব্রাহ্মণের বিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য ছিল তখনও এদেশে কন্যাকাল বার তের ব ের অধিক বলিয়া অবধারিত হয় নাই। —ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।

তবে কি বৈবাহিক ব্যাপারে কোন পরিবর্ত্তই আবশ্যক হয় নাই?—আমার মতে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। (১) যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়া রাজকার্য্য করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে অল্পবয়সে বিবাহ অকর্ত্তব্য। (২) কতকগুলি লোক উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ

একেবারে পরিত্যাগ করুন এবং স্বদেশীয় কৃষিশিল্পাদি উত্তমরূপে বুঝিয়া আমেরিকা ইউরোপ চীন জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া কৃষি শিল্পাদির উন্নতির উপায় অবগত হউন। তাঁহারা নির্লোভ নিঃস্বার্থ এবং ভোগ-সুখ-ত্যাগী হইয়া যে উপদেশ দিবেন তাহা দেশীয় বড়লোক এবং ছোটলোক সকলেই সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সর্ব্ব-প্রকার উন্নতি হইবে। ভারতবর্ষে যে এতটুকু নিঃস্বার্থতা আছে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা এরূপে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন তাঁহারা মাতৃভুমির প্রকৃত উপাসনা করিবেন—এবং সে উপাসনা ঈশ্বরোপাসনা হইতে অভিন্ন।

আমি ঐ পর্য্যন্ত করিবার বিশেষ চেষ্টাই করিতে বলি। আমি বেশ জানি ইংরাজ সম্মিলিত স্বত্বাধিকার ভাল বলেন না এবং তিনি প্রমাণ দ্বারা দৃষ্টান্তদ্বারা এবং ব্যবস্থা-শাস্ত্রকেও কিছু মোচড় দিয়া সম্মিলিত স্বত্বাধিকার প্রণালী বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ অল্প বয়সে বিবাহেরও বিপক্ষ—কোন্ নিয়ম কোন্ দেশে খাটে, তিনি তাহা ভাবিয়া বুঝেন না। তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান যে তাঁহার নিজের যে রীতি নীতি তাহাই ভাল, আর সকল রীতি নীতিই অপকৃষ্ট; সুতরাং ইংরাজ ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের উপযোগী ব্যবস্থা চালাইতে চাহেন। করুন, কিন্তু যখন প্রাকৃতিক শক্তি ঐ চেষ্টার বিরুদ্ধ তখন ওরূপ কোন মোহান্ধ এবং অবৈধ চেষ্টায় বিশেষ ফলই ফলিবে না। আর যদি তাঁহার চেষ্টার ফল সত্য সত্যই ফলে, তবে এমনি বিষময় হইবে যে, পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে তাহার লক্ষণ এপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। *

হিন্দুসমাজ ও কূপমণ্ডূকতা।

হিন্দু সমাজের প্রতি এই একটী দোষারোপ হইয়া থাকে যে, ইহার শাসনে থাকিয়া হিন্দুরা কখন স্বদেশের বাহির হইতে পান না এবং সেই জন্য স্বদেশ বহির্ভূত কোন ব্যাপারই শিখিতে বা বুঝিতে পারেন না, * নিতান্ত সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ-হৃদয় হইয়া থাকেন। কূপমণ্ডূকতা দোষ বই কি—কিন্তু অপরাপর লোকের পক্ষে উহা যত দোষ হিন্দুর পক্ষে তত দোষ

না হইতে পারে। হিন্দুর বাসভূমি সমুদায় পৃথিবী মণ্ডলের প্রতিকৃতি স্বরূপ। এই বাসভূমির বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন পুণ্যতীর্থ—তীর্থ দর্শন করা শাস্ত্রের বিধি, আর হিন্দুরা সেই বিধি পালনপূর্ব্বক পর্ব্বে পর্ব্বে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। অতএব স্থূলদৃষ্টিতে হিন্দুদিগকে যত বদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা তত বদ্ধভাবাপন্ন নহে।

হিন্দুদিগের সমুদ্রগমন নিষেধ চিরকালের অবস্থা নহে। হিন্দু বণিকেরা অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে যে সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন তাহার ভূরি পরিমাণ উল্লেখ সামান্য কাব্য গ্রন্থে এবং কিম্বদন্তীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, এবং লম্বক দ্বীপে যে হিন্দুদিগের উপনিবেশ সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার অতি সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল সুদূর সাগর মধ্যস্থ সেই সকল স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। অদ্যাপি সেই সকল স্থানে রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ লম্বক দ্বীপের রাজা হিন্দু, সেখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মুসলমান ইতিবৃত্তেও দৃষ্ট হয় যে, সিন্ধুদেশ হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমুদায় উপকূলভাগের লোক সামুদ্রিক বাণিজ্য করিত। আরব বোম্বেটিয়াদিগের দৌরাত্ম্যেই ঐ বাণিজ্য শৃঙ্খলাবিচ্ছিন্ন এবং বিলুপ্ত হইয়া যায়। আবার ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং যদিও এদেশীয়দিগের মধ্যে সেই বাণিজ্য কার্য্যে মুসলমানেরাই প্রধান, তথাপি হিন্দু জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণী সম্প্রদায়ও নিতান্ত পশ্চাৎপদ নহে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের "নাডগোট" নামক স্থানের চেটী বা শ্রেষ্ঠীরা যবদ্বীপের সহিত বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। মদুরাধিষ্ঠাত্রী দেবী "মিনাচি" বা "মীনাক্ষীর" নামে তাঁহাদের ষ্টীমারের নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রগমনে জাতিপাত যদিও লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু লোকের আচারে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। অতি বিচক্ষণ কোন একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনারা স্বজাতীয় বিলাতফেরৎদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন?" তিনি বলিলেন "আমরা ওবিষয় লইয়া কোন বিচার বাহুল্য করি না। যিনি বিলাত হইতে আসিলেন, তিনি বিনা আড়ম্বরে

প্রায়শ্চিত্ত ও কেশাদি সংস্কার করিয়া কয়েক দিন পরে স্বজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদিগের স্বজনেরাও তাঁহাদিগের বাটীতে যান। চলন বলন দেশীয় রীতি ক্রমেই হয়; ক্রমে তাঁহাকে দুই একটী ক্ষুদ্রভোজে নিমন্ত্রণ করি, তিনি আসিয়া ভোজনাদি করিয়া যান। অনন্তর বৃহৎ বৃহৎ ভোজাদিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ চলে, এবং পরিশেষে তিনি নিমন্ত্রণ করিলে সকলে গিয়া তাঁহার বাটীতে ভোজন করি। আমাদের প্রণালী এই; আমরা বিলাত যাওয়া লইয়া কোন গোলযোগই করি না।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুজাতীয় ব্যক্তি, বিনা সমাজত্যাগে সমুদ্রগমন এবং বিদেশ পরিভ্রমণ করিতে পারেন। তবে আত্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের ভক্তি এবং মমতা আছে, তাঁহারাই ঐরূপ পারেন। যাঁহারা একেবারে আত্মগৌরব পরিশূন্য হইয়া নিজ সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ভালবাসেন এবং সমাজের নিকট নতভাব ধারণ না করিয়া তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা সমাজ মধ্যে পুনর্ব্বার গৃহীত হইতে পারেন না, সেই স্থলেই প্রায় প্রায়শ্চিত্তাদির কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে আত্মগৌরব এবং সমাজগৌরব আছে। প্রকৃত কথা এই যে, যদি বিদেশ গমনের তাদৃশ প্রয়োজন এবং যথাযোগ্য উপায় থাকে, তবে বিদেশ গমনে হিন্দুসমাজ বিশেষ বাধা প্রদান করেন বলিয়া বোধ হয় না। স্পর্দ্ধা করিয়া সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিলে কোন সমাজই কখন ক্রুদ্ধ হয় না। হিন্দুসমাজ বিনয় ব্যবহার মাত্র চাহেন। এই সমাজ উদ্ধত দুর্ব্বৃত্তদিগেরই প্রতি দণ্ড করেন। অন্যান্য সমাজে কোন ব্যক্তি যদি প্রচলিত মতবাদ হইতে অপর কোন মতবাদ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। হিন্দু সমাজে ঐরূপ কখনই হয় নাই, পরধর্ম্মবিদ্বেষ কূপমণ্ডূকতার প্রধান লক্ষণ—তাহা হিন্দু সমাজে আজিও নাই, কস্মিন্‌কালেও ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কথিত আছে, ভগবান শঙ্কর স্বামীর সময়ে কোন কোন বৌদ্ধের তুষানল হইয়াছিল। কিন্তু তৎসম্বন্ধে ইহাও কথিত আছে যে, ঐ প্রায়শ্চিত্ত সমাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হয় নাই। যে পণ করিয়া বিচার হয় সেই পণ রক্ষা মাত্র।

যাহা হউক, কূপমণ্ডূকতার সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। স্বদেশ হইতে বাহির না হইলেই যে মানুষের কূপমণ্ডূকতা জন্মে আর বাহির হইবেই যে ঐ দোষ একেবারে ঘুচিয়া যায়, একথাও প্রকৃত কথা নহে। কত ইংরাজের সহিত আলাপে দেখা যায়, অনেকানেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াও তাঁহারা সেই সেই দেশের প্রকৃতি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। আর অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ পনর, কেহ বিশ, কেহ ত্রিশ বৎসর এদেশে কাটাইয়াও এদেশের অতি সাধারণ বিষয় সকলেও ঘোর মূর্খ থাকিয়া যান।

ঐ সকল লোককে দেখিলে একটী রুসীয় ভদ্র সন্তানের সহিত মহাত্মা পীটরের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে, সেই কথা মনে পড়ে। মহাত্মা পীটর স্বয়ং সাম্রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া অনেকানেক ইউরোপীয় রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বড় বড় জমীদারদিগের সন্তানদিগকে ইউরোপের নানা দেশে প্রেরণ করিলেন। একজনকে ইটালী যাইতে অনুজ্ঞা হইল। স্বদেশবৎসল রুসীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন পরদেশে পদার্পণ করাও দোষ মনে করিত। যে ব্যক্তি ইটালী যাইতে আদিষ্ট হইল সে নিজ ব্যয়ে একটা সুবৃহৎ যান প্রস্তুত করিল। এবং তাহারই ভিতর রান্না খাওয়া প্রভৃতি সকল কাজ চলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সে ঐ যান মধ্যে রহিল, ভৃত্যেরা উহা ইটালী দেশের প্রধান নগর রোম পর্য্যন্ত লইয়া গেল এবং তথা হইতে ফিরাইয়া আনিল। সে ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ত্ত হইয়াছে শুনিয়া সম্রাট পীটর তাহাকে ডাকিলেন এবং সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইটালী দেশ কেমন দেখিলে?" * * "আজ্ঞে দেশ দেখি নাই।" * * "দেশ দেখ নাই কি—এই সেদিন মাত্র তথা হইতে আসিলে না?" "আজ্ঞে তা বটে—কিন্তু দেশ দেখি নাই" * * "গেলে এলে কেমন করে?" আজ্ঞে একটা বড় গাড়ি করিয়া গিয়াছিলাম, একবারও বাহির হই নাই"—পীটর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রহিলেন।

অনেকানেক ইউরোপীয়ের বিশেষতঃ কোন কোন ইংরাজের ঐরূপ এক একটী যান সমভিব্যাহারেই থাকে—উহাঁরা কখন তাহার ভিতর

হইতে বাহির হয়েন না। ঐ যান কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত নয়—উহা অহঙ্কার, দাম্ভিকতা, পরজাতির প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ বিনির্ম্মিত, উহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর পদার্থ—ইংরাজ উহারই ভিতরে বসিয়া সকল দেশ ভ্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষে চাকুরি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যান। আমাদের সমাজ তদ্রূপ কূপমণ্ডূকতার সৃষ্টি করিতে পারে না।

বঙ্গ সমাজে ইংরাজ পূজা।

সুয়েজ প্রণালীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বহু দেশের আচার ব্যবহারের দ্রষ্টা বিচক্ষণবর লেসেপ সাহেব বলেন যে, মিশরদেশ কখন কোন ইউরোপীয় জাতির অধীন হইয়া থাকিবে না। কারণ মিশর দেশীয়া রমণীগণ কখনই ইউরোপীয়দিগকে বিবাহ করিতে সম্মতা হয় না। একথার তাৎপর্য্য এই যে, পতিভাবে গ্রহণই ভক্তি এবং প্রণয়ের চিহ্ন; মিশরীয় স্ত্রীলোকেরা যখন ইউরোপীয়দিগকে পতিভাবে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু, যখন ভক্তি প্রেম-সুলভ স্ত্রীহৃদয়েও ইউরোপীয়ের প্রতি ঐ ভাব জন্মে না, তখন ঐ আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতির অধীনতা হইবে না, অথবা যদি হয়, সে অধীনতা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে না।

কোন সময়ে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলাম। সেখানে দেখিয়াছিলাম ব্রহ্মদেশীয়া ভদ্রমহিলাগণও পদস্থ ইংরাজদিগের রক্ষিতা স্বরূপ হইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করে না। প্রত্যুত তাহারা তাদৃশ অবস্থাকে আপনাদিগের গৌরবসূচক মনে করে। ঐ দেশেই দেখিয়াছিলাম অতি ভদ্রবংশীয় স্ত্রী পুরুষ সকলে আপনাদিগের পুরোহিতবর্গ পরিবৃত হইয়া কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার পদদ্বয়ে পুষ্প চন্দন দিয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

যখন ঐ ব্যাপার দর্শন করি, তখন মনে হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় কি সমূহ মঙ্গল হইতেছে! ঐ প্রথা থাকাতে লোকে স্বজাতীয়দিগের মধ্যেই বড় লোক দেখিতে পায়, বিদেশীয় রাজপুরুষকেই সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোপরি দেখে না, এবং

সেই জন্য উহাঁদিগের প্রতি অযথা ভক্তিও করে না। আমি ভাবিলাম, যে ব্রহ্মদেশীয়েরা যে কাজ করিতে পারিল আমাদিগের অতি নীচ জাতীয় লোকেও তাহা করিতে ঘৃণা বোধ করে। ভারতবর্ষীয় কোন লোক যদি নিতান্তই আত্মবিস্মৃত হয়েন, তবে ইংরাজ করস্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহার সমাদর না করিলে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েন; যদি নিতান্তই হীনচেতা হয়েন তবে ইংরাজের সহিত একত্রে খানা খাইতে ভাল বাসেন; যদি একান্তি মুগ্ধ হইয়া থাকেন তবে ইংরাজ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলে বা তাঁহার নামটীর সম্বোধন পূর্ব্বক পত্রাদি লিখিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন; যদি সর্ব্বতোভাবে পৈত্রিক গুণ-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে ইংরাজের অনুরূপ চাল চলন অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়েন; ভারতবাসী ইংরাজী পড়িয়া শুনিয়া যদি অত্যধিক নীচ হইলেন, তবে স্বজাতীয় ধর্ম্ম এবং নীতি এবং আচার অপেক্ষা ইংরাজের ধর্ম্ম এবং নীতি এবং আচার প্রণালীকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিলেন এবং ইংরাজের সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত অহরহ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি আপনার ভগিনী ও কন্যাকে ইংরাজের রক্ষিতা করিয়া দিয়া এবং ইংরাজের পায়ে পুষ্প চন্দন দিয়া স্বয়ং চরিতার্থ হইতে পারেন না। যেখানে জাতিভেদ নাই এবং পরাধীনতা আছে, সেখানে পরাধীনতার অতি বিষময় ফলই ফলে, সেখানে আত্মগৌরব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, মন ক্ষুদ্র হয় এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মিবার কোন পথই থাকে না। আমাদিগের দেশে ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেবতা স্বরূপে সম্পূজিত হয়েন না। কিন্তু তাঁহারা পূজা পাইবার নিমিত্ত যেন বিলক্ষণ সচেষ্ট হইয়াছেন; এবং তাহার ফললাভও কিছু কিছু করিতেছেন।

আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, বাঙ্গালার প্রথম চারিজন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যখন দেশের বিভিন্ন ভাগ পরিদর্শনে বাহির হইতেন, তখন কোন আড়ম্বরই হইত না। হালিডে সাহেব নীলকরদিগের বাটীতে বাটীতে খাইতেন, রাজা এবং জমীদারদিগের সহিত ছোট ছোট দরবারে দেখা করিতেন, মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর, জজ প্রভৃতির আদালত দেখিতেন এবং

কোন গোলযোগ না করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। গ্রাণ্ট সাহেবের রীতিও প্রায় ঐরূপ ছিল, তবে তিনি নীলকর সাহেব-দিগের বাটীতে গিয়া ভোজ খাইতেন না এবং প্রজারা যে সকল দরখাস্ত দিয়া আপনাদের দুঃখ জানাইত তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন। বীডন সাহেব বড় একটা ভ্রমণ করিতেন না, যাহা একটু করিতেন তাহাতেও আড়ম্বর হইত না। গ্রে সাহেব কিছু কিছু বেড়াইতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি স্বহস্তে ছাতা ধরিয়া একটী বাজারের ভিতরে পাদচারে বেড়াইতেছেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য কেমন কেমন দরে বিক্রীত হইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেছেন।

তাহার পরে কাম্বেল সাহেব আসিলেন এবং সমভিব্যাহারে সওয়ার যাইবে, যেখানে যাইবেন সেখানে বাজি পুড়িবে এবং আলোক দেওয়া হইবে এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কমিশনর এবং মাজিষ্ট্রেটেরা একটু একটু মুচকি হাসিলেন, কিন্তু আজ্ঞাপালন করাইলেন। আর কি, লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল! টেম্পল সাহেবের আমলে বাজি পোড়ান এবং আলোকদান বাড়িয়া উঠিল। তখন কলাগাছের সারি দিয়া আলোক দিবার জন্য এবং বাঁশের গেট করিবার জন্য এত আড়ম্বর হইত যে কোন কোন গ্রাম একেবারে বাঁশ ও কদলীবৃক্ষ শূন্য হইয়া পড়িত।

ইডেন সাহেবের সময়ে বাজীপোড়ান আলোকদান পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন হইল না, ধ্বজার সংখ্যা অতিবর্দ্ধিত হইল এবং স্থানে স্থানে সফের-ফৌজ তাঁহার বডিগার্ড বা শরীর-রক্ষক সৈন্যরূপে দর্শন দিতে লাগিল। টমসন সাহেবের সময়ে ইডেনের মতই সব, বেশীর মধ্যে ব্যাণ্ড বাজে। কথিত আছে বেলী সাহেবের সময়ের উৎসবে গয়াতে ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। যেমন ঐ সকল আড়ম্বর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া আসিতেছিল, তেমনি উহার সহিত ভোজের ধুমধামও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইলিয়ট সাহেব কিছু কমাইতেছেন; তাঁহার সকল ধরণেই একটু বিশেষত্ব আছে; তাঁহাকে এক রকম ছাড়িয়া বলা যায় যে, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরেরা নিতান্ত ভোজভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; উহাঁদিগকে এখন যে ডাকে তাহারই বাটীতে গিয়া ভোজ খান। যাঁহারা ভোজ দেন তাঁহাদিগের মান সম্ভ্রম কি

বাড়ে তাঁহারাই জানেন, কিন্তু ধন ব্যয় অপরিমিতরূপেই হয়। এক একটা শর্ব্বরী ভোজের খরচে চারি পাঁচটা খুব জাঁকাল দুর্গোৎসব হইতে পারে—অনেক বড় বড় দিঘীর পঙ্কোদ্ধার হইতে পারে। আমি বেশ জানি যে, একজন মহারাজ কোন মাড়বারী মহাজনের স্থানে আট হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া একটী সান্ধ্য ভোজ দিয়াছিলেন। আর একজন মহারাজের ঐরূপ উৎসবে পনর হাজার টাকা ব্যয় হয়; আর একজনের কয়েকদিনের ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ হাজারের কিছু অধিক হইয়াছিল।

গবর্ণর সাহেবদিগের দেখাদেখি, কমিসনর সাহেবেরা, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এবং চুনা পুঁটি সকল সাহেব, দেশীয় লোকদিগের খরচে ভোজ খাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন। বাজি পোড়ান, আলোক দান, নিশান খাড়া ত কথায় কথায় হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজজাতির আড়ম্বর প্রিয়তা ছিল না, কিন্তু সেটী বিলক্ষণই বাড়িয়া উঠিতেছে। ইংরাজ মনে করিতেছেন যে, এইরূপ হইতে হইতে তিনি ক্রমে পূজা পাইবেন। ইংরাজ মুখে বলিতেছেন যে তিনি দেশীয়দিগের বাটীতে ভোজ খাইয়া তাহাদিগের সহিত সুসামাজিকতা করিতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যে প্রকার করিলে পূজিত হইতে পারেন, ইংরাজ সে পথে যাইতে জানেন না। তাঁহার ভোজ খাইয়া বেড়ানতে তিনি ভারতবাসীর চক্ষে নিতান্ত নির্লজ্জবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

শুদ্ধ নির্লজ্জবৎ নয় অতিশয় নিষ্ঠুরের কাজই করিতেছেন। রাজা মহারাজ বেচারারা ত একে ঋণজালে জড়িত তাহাতে ঐ সকল ভোজ দিবার দায়ে তাহারা আরও ঋণগ্রস্ত হইতেছে; আর যে দেশে চারি পাঁচ কোটি লোক অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করে তথায় দানের প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে।

সেদিন শুনিলাম কোন জিলার জজ সাহেব মাস কয়েকের জন্য ছুটি লইয়া একবার স্বদেশে যাইবেন। অমনি তাঁহাকে একটী ভোজ দিবার জন্য একটা চাঁদার বহি বাহির হইল, উহাতে সহি হইল, টাকা উঠিল এবং জজ সাহেব ও অপরাপর সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিলেন। আর একদিন শুনিলাম, একজন অতি

প্রধান তীর্থের প্রধান দেবসেবক নিজ ভবনে নূতন কালেক্টর সাহেবের আগমন উপলক্ষে ইংরাজভোজের একটা প্রকাণ্ড আয়োজন করিতেছেন। ভোজের ফর্দ্দ দেখিতে পাইলাম, তাহাতে মুর্গি, ভ্যাড়া এবং বেঙ্গের ব্যঞ্জন এক একটী এবং গোমাংসের ব্যঞ্জন তিনটি। মদ্য বহুবিধ। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, দেবসেবক, রাজা রাজড়ার পুরোহিতের এই কীর্ত্তি! দেখিয়া শুনিয়া ভয় হইল, কালে বঙ্গদেশও বা ব্রহ্মদেশের ন্যায়—ইংরাজ পূজায় অবনত-মস্তক হইবে। যদি দেশের জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া যায়, যদি বিদেশীয় রীতি নীতিই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যদি দেশীয় লোকের জ্ঞানচক্ষুঃ একেবারে অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তবে ওরূপ হইলেও হইতে পারে।

একটী সার কথা বলিয়া রাখিতেছি। ইংরাজ যতই ভোজ খাউন, মদের গ্লাস হাতে করিয়া যতই লম্বাচৌড়া বক্তৃতা করুন, উনি আপনার কাজ ভুলিবার লোক নহেন। তুমি রাজা বা মহারাজ বা বড়লোক যে কেবল উহাঁর খোসামোদ করিতেছ—কোন "মতলব" আছে, তাহা উনি বিলক্ষণ জানেন; তুমি উহাঁর প্রতি ভয়প্রযুক্তই ওরূপ করিতেছ ভালবাসার জন্য তিলার্দ্ধও নয় তাহাও জানেন; এবং তাহা জানিয়া তুমি একটু ঘেঁসিতে গেলেই তোমার অপমান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের ওরূপ পূজা নিতান্ত অফল পূজা। পূর্ব্বোল্লিখিত দেবসেবকটী ঐ ভোজ দেওয়ার পর তাঁহার ইন্‌কমট্যাক্স বেশী ধরা হইয়াছে বলিয়া যখন আপীল করিলেন তখন কর্ত্তব্যপরায়ণ নবাগত কালেক্টর মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, "যে এক রাত্রে পাঁচ হাজার টাকা ভোজে খরচ করিতে পারে, তাহার আয় অত কম কখনই হইতে পারে না।"

যদি আমার পরামর্শ কেহ শুনেন তবে আমি বলি, ইংরাজের সম্মান কর; কিন্তু এমন ভাবে কর, যাহাতে সম্মানিত ইংরাজের নাম থাকে এবং দেশীয় লোকের উপকার হয়। বাজি পোড়াইয়া আলো জালিয়া টাকা নষ্ট করিও না। ভোজ দিয়া অনর্থক অপব্যয় এবং অপকর্ম্ম করিও না। যে ইংরাজের তুষ্টিসাধনার্থ ঐ সকল করিয়া থাক, তাঁহার নামে ইন্দারা, দীর্ঘিকা, রাস্তা, ঘাট, স্কুল, অতিথিশালা, ছাত্রবৃত্তি, মেডাল,

চিকিৎসালয় প্রভৃতি যাহা কিছু পার, স্থাপন কর। এরূপ করিতে আরম্ভ করিলেই দেখিতে পাইবে যে বীরপ্রকৃতিক ইংরাজ "সত্য সত্যই" তোমার গৌরব করিবেন। এখন তোমার খরচে তোমার বাটী বসিয়া ভোজ খাইয়া মনে মনে তোমাকেই অশ্রদ্ধা করেন।

—**:**—

ঈর্য্যাপ্রবণতা।

ইংরাজের সংস্পর্শে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে একটী বিশেষ দোষ জন্মিতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমার বোধ হয় সে দোষটী ক্রমে ক্রমে ন্যূন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও উহার এত অবশেষ আছে যে, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। ঐ দোষটীর নাম ঈর্ষ্যাপ্রবণতা। বাঙ্গালী স্বজাতীয় লোকের প্রতি অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। যখন ১৮৩৫ অব্দের পর মুন্সেফ সদর-আমীন প্রভৃতির পদ সৃষ্ট হইল, তখন অনেক লোক শুদ্ধ স্বজাতীয় হাকিমদিগের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বলিত, আমরা কালা হাকিমদিগের নিকটে বিচার প্রার্থনা করি না—ইংরাজ হাকিমেরা আমাদিগের মোকদ্দমার বিচার করিলেই আমরা অধিক সন্তুষ্ট হই। কোন কোন ইংরাজ ঐ কথার সূত্র পাইয়া এককে এক শত করিয়া বাড়াইয়াছিলেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাতেও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয়েরা স্বজাতীয় লোক সকলকে উচ্চপদস্থ দেখিতে পারে না—অতএব উহাদিগকে উচ্চপদ দিয়া কাজ নাই। আজিও ইংরাজদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ কথা বলিয়া থাকেন। এবং বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, ও কথা বলিবার সকল [illegible]রণ এখনও নিঃশেষিত হয় নাই।

আমরা এখনও স্বজাতী[illegible] [illegible]াকের সম্যক্ গৌরব করিতে শিখি নাই। ইংরাজেরা যেমন [illegible] [illegible]থাতে এবং সকল কাজে স্বজাতীয় সকল লোকের সম্মান [illegible] [illegible]্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, বাঙ্গালীদের এখনও সেরূপ শিক্ষ[illegible] [illegible]াকিয়া উঠে নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি. যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষা এবং ইংরাজী বিদ্যা এমন উত্তমরূপে

শিখিয়াছেন যে ঐ বিজাতীয় ভাষায় অনর্গল লিখিতে এবং বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাদের ক্ষমতা কি অল্প। অপর কোন ভাষায় ওরূপ লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে কয়জন বড় ইংরাজই সমর্থ। শ্রুত আছে যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিস্রেলি সাহেব যখন বর্লিন নগরে গমন করিয়া ছিলেন তখন সেখানকার মন্ত্রি-সমিতির মধ্যে ভাল করিয়া ফরাসি-ভাষাও কহিতে পারেন নাই এবং সেই জন্য বিসমার্ক তাঁহাকে ইংরাজী ভাষাতেই কথোপকথন করিতে বলিয়াছিলেন। আর যে যাহার পরিচিত সাহেবদিগের মধ্যেই দেখ না, তাহার মধ্যে কয়জন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অথবা বিশুদ্ধ হিন্দিতে আপনাদিগের মনের ভাব সকল সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা কেমন ইংরাজী শিখে, আর কত শিখে। ইংরাজেরা যে উহাদের অনাদর করেন, তাহার একটা হেতু আছে। অনাদর না করিলে তাঁহাদিগের জাতীয়ভাব থাকে কৈ—আর আপনাদের অন্নসংস্থানই বা কৈ থাকে। কিন্তু উহাঁদিগের দেখাদেখি, আমাদিগেরও কি স্বদেশীয় কৃতবিদ্যগণকে অনাদর করিতে আছে? মনে কর, মহামহোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি একজন সামান্য লোক ছিলেন, উহাঁর ন্যায় পণ্ডিত বিচক্ষণ তীক্ষ্নদর্শী এবং বাগ্মী কয়জন লোক ছিলেন? কিন্তু আমরা কি উহাঁর সম্পূর্ণ গৌরব করিয়া থাকি? অথবা যতদিন ইংরাজকেও উহাঁরি গৌরব করিতে না দেখিয়াছিলাম, ততদিন উহাঁর প্রকৃত গৌরব করিতে জানিতাম? উহাঁর সমান আর কেহ থাকুন বা না থাকুন, কিন্তু আমাদিগের সম্পূর্ণ গৌরবের যোগ্য আরও অনেক আছেন। সে সকলকে আমাদিগের মাথায় করিয়া রাখা উচিত।

তাহার পর ধর, যাঁহারা স্বজাতীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করেন—ইংরাজের নিকট আদর খুঁজেন না। আমরা কি তাঁহাদিগেরও বেশ গৌরব করিতে পারি? বঙ্কিমচন্দ্র কি একটা সামান্য লোক! আজি কালি উহাঁর দুই একটী পুস্তক ইংরাজীতে এবং জর্ম্মেণ ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে দেখিয়া আমাদিগের মনে যদি একটু প্রকৃত ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে ত বলিতে পারি না—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উনি যে কতটা

ভক্তির পাত্র, তাহা সকলে বুঝিতে পারে নাই। একটি তথ্যকথা এই—ইংরাজমাত্রেই সকল বাঙ্গালীর অপেক্ষা বড়লোক নহেন। যত বাঙ্গালী আছে, সকলের চেয়েই বড়লোক যদি এমন ইংরাজ থাকেন ত সে ইংরাজ এখানে আইসেন না। যদি বাঙ্গালী স্বজাতীয় প্রধান লোকদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়া উঠে, তাহা হইলে এখনও দেখিতে পায় যে, বঙ্গভূমি সত্য সত্যই রত্নপ্রসবা। যে দেশে শিরোমণি এবং জয়দেব এবং চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে দেশের সকল লোক কখনই জন, চার্লস্, হনরি, মাথু হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে না। * * * * * তবে সমস্ত রাজশক্তি ইংরাজের হস্তগত, ইংরাজের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে চাকুরি হয় না, পদমর্য্যাদাও বাড়ে না, কোন কিছুতেই সুবিধা পাওয়া যায় না, এই জন্য লোকে ইংরাজের মনস্তুষ্টি করিতে যায়—এবং ইংরাজ আমাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যার চিহ্ন দেখিতে পাইলে কিছু বিশেষ তুষ্টই হইয়া থাকে। এই জন্য অনেক অল্প-প্রাণ বাঙ্গালী ইংরাজদিগের সাক্ষাতে স্বজাতীয়ের নিন্দাসূচক অনেক কথাই কহিয়া ফেলে।

একজন ইংরাজের সহিত কথোপকথন হইতে হইতে এ দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে কথা উঠিল। তিনি বলিলেন "—স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা না দেওয়া বড় অপকর্ম্ম।" * * আমি বলিলাম "স্ত্রীস্বাধীনতা একটা নূতন বিশেষ কথা বলিয়াই আমার বোধ হয় না। যে দেশের পুরুষেরা যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে, সে দেশের স্ত্রীলোকেরা তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়া থাকে—এই নিয়ম বই আর কিছুই নহে। তোমাদের ইংলণ্ডে আজও ত স্ত্রীলোকের সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার বিষয়ে গণ্ডগোল চলিতেছে; অতএব সেখানেও পুরুষের স্বাধীনতা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অবশ্যই কম হইবে।" * * তাহা বটে, কিন্তু তোমরা ত আপনা আপনির মধ্যেও স্ত্রীলোকদিগকে সভাস্থলে আসিতে দেও না—ইহার কারণ কি?" এই বলিয়াই ইংরাজটী বলিলেন—অমুক বাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালীরা বরং ইংরাজদিগের সভায় আপনাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু

স্বজাতীয় পুরুষদিগের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ়তর অবিশ্বাস!!" এই কথাটী শুনিয়া একবারে অবাক হইয়া রহিলাম। তাঁহার "বাবুটীকে" চিনিতাম। মনে করিলাম আর কোন কথা বলিব না, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ হইল না। বলিলাম, "আপনারা অমন সকল কথায় কিরূপে বিশ্বাস করেন, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ও কথাটা শুনিলেই ত অবিশ্বাস হয়। যদি কোন চীনীয় কি অপর জাতীয় কোন লোক আমার কাছে ঐরূপ বলিত যে, সে স্বজাতীয় লোকের অপেক্ষা আমাকে অধিক শ্রদ্ধা করে, তবে আমি অবশ্যই অনুমান করিতাম যে, ঐ ব্যক্তি প্রকৃত কথা বলিতেছে না তাহার কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় আছে। কিন্তু আপনারা অনায়াসে ঐরূপ কথাগুলা গিলিয়া ফেলেন কেমন করিয়া? ইংরাজ কি এতই তোমামোদের বশ হইয়া গিয়াছে? আমি দৃঢ় করিয়া বলিতেছি যে, ঐ বাবু আপনার নিকট সত্য কথা বলে নাই। * * মার্কিনদিগের স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা অধিক স্বাধীন, ইউরোপীয় স্ত্রীগণ, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ অপেক্ষা স্বাধীন। আর ভারতবর্ষের ভিতরে যে প্রদেশে হিন্দুজাতির স্বাধীনতা অধিক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীগণের স্বাধীনতা ভারতের অপর সকল প্রদেশীয় স্ত্রীগণের অপেক্ষা অধিক। স্ত্রী-স্বাধীনতা পুরুষ স্বাধীনতারই ফল মাত্র।"

বিদেশীয়ের নিকট স্বজাতীয়ের অকারণ নিন্দা ব্যতীত আরও এক প্রকারে বঙ্গবাসীর ঈর্ষ্যা দোষ দেখা দেয়। যদি কোন বাঙ্গালীর কোন উচ্চ পদ অথবা অন্যরূপ সুবিধা হইল, অমনি অনেকে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সকল সময়েই ওরূপ করা ভাল বলিয়া বোধ হয় না। কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন—দেখ, অমুক কর্ম্মটী আমি অমুককে দিলাম বলিয়া অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, এই পাঁচ জন আপনাপন মনের দুঃখে কান্দিয়া গেল। ওরূপ করিলে কি কোন প্রকারে মনের সন্তোষ লাভ করা যায়? কাজ একটী, তোমরা ছয় জনেই তাহার উপযুক্ত। অতএব একজনের বইত ছয় জনেরই ও কাজটী হইবে না। যাহার হইল সে অযোগ্য কি না দেখ, যদি অযোগ্য না হয়, তাহা হইলেই আর দোষ ধরা বা দুঃখ করা উচিত নহে। ফলতঃ

তোমাদের তুষ্ট করিবার জন্যই ত একটী ভাল চাকরী ইংরাজকে না দিয়া তোমাদের একজনকে দেওয়া হইল। ইহাতেও যদি তোমরা সকল লোকেই তুষ্ট না হইলে তবে কি জন্য আমরা স্বদেশীয় একজনকে বঞ্চিত করি?” কথাগুলি ঠিক বলিয়াই আমার বোধ হয়। আমি অনেকবারই দেখিলাম যখন কাহার একটা কিছু ভাল হইয়াছে, অমনি তাহার হইতে না কেন অমুকের না হইল কেন, এই ভাবে গোল উঠিয়াছে। ওটা ভাল লক্ষণ নয়। স্বদেশীয় যাহার যখন কিছু ভাল হইয়াছে তাহাতেই সকলের ভাল হইল মনে করা উচিত! তবে “নিতান্ত” অযোগ্য লোকের উন্নতি হইলে তাহা অবশ্য দূষিতে হয়। কিন্তু উনিশ বিশ এমন কি পনর বিশ হইলেও দোষ ধরিতে নাই।

বিভিন্ন প্রকারের ইংরাজ রাজপুরুষ।

ভারতবর্ষ যতদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ছিল, ততদিন ইংরাজেরা বলিতেন যে, ভারতবর্ষের লোকসকলকে আত্মশাসনে সক্ষম করিয়া তুলিবার নিমিত্তই আমরা ভারতবর্ষে আছি। ইহারা আত্মশাসনে সক্ষম হইয়া উঠিলেই আর কেহ আমাদিগকে ইহার শাসন ভার বহন করিতে হইবে না। কথাটা গোড়াথেকেই মিছা। কিন্তু কথাটার একটা মহৎ গুণ ছিল। ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য যে একটা অত্যুচ্চভাব মনে রাখিয়াই করিতে হইবে, ঐ কথাটা দ্বারা তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইত। ভারতবর্ষবাসীকে আত্মশাসনের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে—সুতরাং (১) ইহাদিগের অন্তর্বিচ্ছেদ যাহা কিছু আছে তাহা মিটাইয়া দিতে হইবে। (২) ইহারা যাহাতে পরস্পর খাওয়া-খায়ি না করে তাহা করিতে হইবে (৩) ইহারা যাহাতে একান্ত ধনহীন হইয়া না পড়ে তাহার উপায় করিয়া চলিতে হইবে (৪) ইহারা যাহাতে কূপমণ্ডূকতা শূন্য হয় এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখে তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে—ফলতঃ ভারতবর্ষকে সম্মিলিত, সমৃদ্ধ, ধনশালী এবং স্বাধীন প্রকৃতিক করাই ইংরাজ-শাসন-প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরাজদিগের নিজের

লাভ অবান্তর বিষয় থাকিবে। তখনকার কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিতেন—দেখ,আমেরিকার ইউনাইটেড্ প্রদেশ যতদিন ইংলণ্ডের অধীন ছিল ততদিন ইংলণ্ডের বড় কিছুই লাভ হয় নাই ; ঐ প্রদেশ স্বাধীন সবল এবং ধনশালী হইয়া অবধি উহার সহিত ইংলণ্ডের যে বাণিজ্য ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের সমূহ লাভ হইতেছে। তেমনি ভারতবর্ষ সবল এবং ধনশালী হইলে ইংলণ্ডের যত লাভ, উহা দুর্ব্বল এবং অক্ষম অবস্থায় ইংলণ্ডের গলায় পড়া হইয়া থাকিলে তত লাভ নাই। কেহ কেহ এরূপও বলিতেন যে, ভারতবর্ষ উহার বর্ত্তমান অবস্থায় ইংলণ্ডের বলবর্দ্ধক পদার্থ নহে, উহা ইংলণ্ডের পক্ষে ক্ষতিজনক বস্তু হইয়া আছে।

এখন আর ওরূপ কথাসকল শুনা যায় না। মহারাজ্ঞীর খাস দখলে আসিয়া অবধি ইংরাজেরা কথা বদলাইয়াছেন। ডিউক অব আর্গিলই বোধ হয় ষ্টেট সেক্রেটারী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বলেন যে ভারতবর্ষকে আমাদিগের চির-অধীনাবস্থায় রাখাই আমাদিগের রাজনীতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। তাহার পর অবধি ঐ ভাবের কথা যার তার মুখে শুনা যাইতেছে। একদিন একটি ইংরাজের সহিত ঐ সম্বন্ধে কথা কহায় তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর যে ভারতবর্ষকে আত্মশাসনে সক্ষম করাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ?" আমি বলিলাম, "আমি স্বপ্নেও তাহা মনে করি নাই—আমি এই মনে করি যে ওরূপ একটা উচ্চতম সদুদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে রাজ্যের সুপালন হয়। যেমন যিশু বলিয়াছেন, ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হইবার চেষ্টা কর। তাহাত বস্তুতঃ কেহ হইতে পারে না, কিন্তু ওরূপ আদর্শ মানসচক্ষে রাখিয়া চলায়, অনেকের শুভ ফল ফলে। আমি সেইরূপ ভাবিয়া মনে করি যে ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা বলিতেন তাহা ভালই বলিতেন, উহাতে কতকটা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ছিল। "এখন ঐ কথার বদলে যে কথা উঠিয়াছে তাহাতে কি শুভ ফল দেখিতেছেন ?"—"এখন কি কথা উঠিয়াছে ?" আমি—"এখন সময়ের অসময়ের বিনা বিচারে বলা হইতেছে, এ দেশে সকল বিষয়ে ইংরাজ-প্রাধান্য রক্ষা করাতেই এ দেশীয় লোকের উপকার—সেই জন্য

ইংরাজ-প্রাধান্য রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক প্রয়োজনীয়।” তিনি বলিলেন—“এমন কথা কে বলে?”। আমি বলিলাম—“অমন কথা আজি কালি কে না বলে?—গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব ত স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন যে, কোন ইংরাজ কোন ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করিলে, ইংরাজের কোন দণ্ড হওয়া উচিত নয়। কারণ ইংরাজভীতি ভারতবর্ষীয়ের হৃদয়ে খুব বদ্ধমূল করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য—এমন কথাতেও ত কোন ইংরাজ কিছু বলিলেন না, প্রত্যুত ওরূপ কথা যে লিখিয়াছিল, তাহাকেই প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান হইল! কিন্তু ঐ মত রক্ষা করিয়া চলিলে অর্থাৎ সাধারণতঃ ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজের দৌরাত্ম্য বাড়িতে দিলে ফল কি হইবে? ন্যায়পরতা রক্ষা না করিলেই রাজ্য ছারখার হয় —স্থায়ী হয় না!”

অপর একটী সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত আত্মশাসন সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, “এখনও দেশীয় লোকের হস্তে কোনরূপ আত্মশাসন-শক্তি দিবার সময় হয় নাই —এখনও গবর্ণমেণ্টের বল দেশের লোকের উপর তেমন চাপিয়া বসে নাই।” আমি বলিলাম—“মহাশয় মনে করিতেছেন গবর্ণমেণ্টের বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের বাঁধন এমনি কড়াকড় হইয়া বসিয়াছে যে, প্রায় পক্ষাঘাতের উপক্রম হইয়াছে।” উল্লিখিত মহাশয় সেই পর্য্যন্ত আমার উপর চটিয়া রহিলেন। কিন্তু ইনি গ্রাণ্ট ডফের চেয়ে ভাল লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। গ্রাণ্ট ডফ্ ভারতবাসীর পীড়ক—ইনি স্বজাতিপোষক মাত্র, ফলবলতঃ পীড়ক।

আমি অপর আর এক প্রকার ইংরাজের নমুনা পাইয়াছি। এই দল দেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার বড়ই প্রতিকূল। ঐ দলের কোন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন—“ইংরাজী পড়িয়া লোকে চাকুরি চাকুরি করিয়া বেড়ায়—চাকুরিও যোটে না—উহারা বড়ই ক্লেশ পায় —আমার ইচ্ছা করে ইংরাজী স্কুল কলেজের সংখ্যা কমিয়া যায়।” আমি বলিলাম—“আমার ইচ্ছা করে যে ইংরাজী স্কুল কলেজের

সংখ্যা আরও অনেক বাড়ে।" তিনি বলিলেন—"বাড়িলে কি হইবে? —আরও কতক গুলা উমেদার বাড়িবে বইত নয়।" * * "বাড়ায় হানি কি? উমেদার অধিক হইলে চাকুরি দিবার নিমিত্ত ভাল লোক পাইবার সম্ভাবনা বাড়ে বইত কমে না?" * * * তাহাতে দেশের মঙ্গল কই?" * * "তবে লোকে কি করিবে?" * * শিল্প বাণিজ্যাতে যাইবে; নূতন নূতন শিল্প কার্য্যের উদ্ভাবন করিবে" * * * "বটে —ওকথা ইংরাজের মুখে কতই শোভা পায়—যে কার্য্যে অধিক মূলধন কি অধিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ প্রয়োজন নাই, আমাদিগের সেই লবণোৎপাদন শিল্প পর্য্যন্ত ইংরাজ কত পরিশ্রম এবং কত অবিচার করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে—আজি সেই ইংরাজ আমাদিগকে শিল্প কার্য্যের শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করিতেছে, ধন্য ইংরাজের নির্লজ্জতা।" ইংরাজটি অধোবদন হইয়া রহিলেন,কিন্তু নিজ মাহাত্ম্যগুণে আমার উপর চটিলেন না, পূর্ব্বাপেক্ষা বরং কিছু অধিক সদয় হইয়াই থাকিলেন!

আর একটি ইংরাজের কথা বলিব। তিনি অনেকদিন বঙ্গদেশে কর্ম্ম করিয়া বাঙ্গালীর প্রকৃতি এবং চরিত্র বিশেষরূপেই অবগত হইয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপর একজন ইংরাজ ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়া প্রথমোল্লিখিত ইংরাজের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে বাঙ্গালীদের প্রিয় হইবেন। প্রথমোল্লিখিত ইংরাজ পরামর্শ দিলেন— "বাঙ্গালীদিগকে নিকটে যাইতে দিও, উহাদিগকে কথা কহিতে দিও —উহারা আমাদের কাছে আসিয়া কথা কহিতে পাইলে বড়ই আনন্দিত হয়। এই পর্য্যন্ত করিলেই হইবে—আর কিছু করিতে হইবে না।"

এই যে কয়েকটী উদাহরণ দিলাম, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী দলের লোকও দেখা যাইতেছে। (১) পীড়ক (২) স্বজাতিপোষক (৩) বাহ্যদর্শক (৪) অবজ্ঞাকারক। এরূপ হওয়া ভাল নয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণ এ দেশীয়দিগের আদর্শ স্বরূপ থাকাই সঙ্গত। তবে এদেশাগত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যেও যে অতি মহাত্মা লোক সকল আছেন সে বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য

মাত্র। প্রকৃত বড় লোক ব্যতীত কোন জাতি এত বড় থাকে না এবং ধর্ম্মসূত্রের অনুসারে না চালাইলে কোন রাজত্বও সকল দিকেই এমন সুচারুরূপে চলে না।

স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্য।

ইংরাজকৃত যাবতীয় কার্য্যের হাড়ে হাড়ে যে স্বার্থপরতা মিশাইয়া থাকে তাহা তাঁহার অনুমোদিত স্বাধীন বা শুল্কবিহীন বাণিজ্য প্রণালীর ইতিবৃত্ত এবং তদ্বিষয়ক বিচার প্রণালীর পর্য্যালোচনার দ্বারা অতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়। ইংরাজের মাতৃভূমি তেমন উর্ব্বরা নহে, এই জন্য সেখানে শস্যোৎপত্তি ভাল হয় না এবং শস্যোৎপত্তি ভাল না হইলে জমির খাজানা বাড়ে না। ভূম্যধিকারীগণ আপনাদিগের খাজানা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিলেন যে বিদেশ হইতে শস্যের আমদানী হইতে পাইবে না অর্থাৎ আমদানী শস্যের উপর এত অধিক শুল্ক গ্রহণ হইবে যে, সে শুল্ক দিয়া বিদেশীয় শস্য দেশীয় শস্যের অপেক্ষা সস্তা দরে বিক্রীত হইতে পারিবে না। তাহা হইলেই দেশজাত শস্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং উহাঁদের খাজনারও বৃদ্ধি হইবে। এই ব্যবস্থা (কর্ণ ল) ভূম্যধিকারিবর্গের অসীম স্বার্থপরতার ফল। সাধারণ লোক, বিশেষতঃ শিল্পজীবীরা এই ব্যবস্থায় আপনাদের স্বার্থের ব্যাঘাত দেখিল। তাহারাও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আমদানী শুল্ক উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত আন্দোলন করিতে লাগিল। এবং ঐ আন্দোলনের সমকালীন বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহাদের প্রস্তুত শিল্পজাত বিনা শুল্কদানে অপরাপর দেশে বিক্রীত হইতে পায়, তাহা হইলে উহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। ঐরূপ হইলে অপরের ক্ষতি হয় কি না, তাহা ভাবিয়া বুঝিবার আর অবসর হইল না। উহাদের আগ্রহে কব্‌ডেন সাহেব নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে স্বাধীন বাণিজ্যটি বড়ই উৎকৃষ্ট বস্তু। তিনি আমেরিকায় গিয়া ঐ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন, রুসিয়ায় গিয়া তত্রত্য সম্রাট নিকোলাস ও

ফ্রান্সে গিয়া সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানকে ঐ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কব্‌ডেনের মতানুগামীরা বলেন যে, তিনি সকলকেই স্বাধীন বাণিজ্যের সার তথ্য বুঝাইয়া দিলেন এবং সেই জন্যই ১৮৪৬ অব্দে প্রকাশ্য বক্তৃতায় নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিয়াছিলেন, "আর দশ বৎসর মধ্যেই সমুদয় পৃথিবীময় স্বাধীনবাণিজ্যপ্রণালী প্রচলিত হইয়া যাইবে।" ইংরাজ অন্যের ইষ্টানিষ্ট কিছুই বুঝিতে পারে না। সে পরচিত্তবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবেশনী শক্তিতে একেবারেই বঞ্চিত। যাহাতে তাহার ভাল তাহাতে অপরের মন্দ হইতে পারে ইংরাজের এ বোধটী নাই। অথচ এই স্বাধীন বাণিজ্য ব্যাপারের বিচারটী একবার স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলেই ইহার অসারতা দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে। বিচারটী এই—কোন দেশের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন দ্রব্যজাত স্বল্পতর পরিশ্রমে এবং সুন্দরতররূপে জন্মে। ঐ বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা যদি অব্যাহতে আপনাপন প্রদেশজাত দ্রব্যের বিনিময় করিতে পায় তাহা হইলে কি সকলেরই ভোগসুখ বৃদ্ধি হয় না? অবশ্যই হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেই স্বাধীন বাণিজ্য প্রথা জন্মে, অতএব ঐ কথাও শুভকরী।

এস্থলে স্পষ্টই দেখা যায় যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ একরাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের ন্যায় নহে। উহাদের রাজা ভিন্ন, সমাজ ভিন্ন, লাভালাভ ভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, খনিজ ও কৃষ্যাদিপ্রসূত দ্রব্যসমূহের প্রতি যে কথা খাটে; মানব কৌশলজাত শিল্পদ্রব্যের প্রতি সে কথাগুলি ঠিক খাটে না, শিল্পজাত সকল দেশে সমান হইলেও হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ইংরাজ যে ভাবে স্বাধীন-বাণিজ্য চালাইতে চাহেন তাহাতে সকলেরই সমূহ ক্ষতি। ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত লইয়াই দেখ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলা হয়, এখানে তুলা জন্মে বটে, কিন্তু ঐ তুলা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করায় ভারতবর্ষে যত পরিশ্রম লাগে ইংলণ্ডে তাহা লাগে না। ভারতবর্ষের তন্তুবায়দিগের হস্তের বল লাগে, ইংলণ্ডে বাষ্পীয় যন্ত্রের বলে কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বাষ্পীয় যন্ত্রের বল ভারতবর্ষেই প্রযুক্ত হউক না, তাহা হইলে বোম্বাই জাহাজ ভাড়ার ব্যয় এবং অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক ব্যয় বাঁচিয়া

যাইবে। ভারতবর্ষীয়েরা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে জানে না। তাহা শিখাও বা শিখিবার অবকাশ দাও। যতদিন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে না পারে যন্ত্রই পাঠাইতে থাক, বিনা শুল্কে কাপড় পাঠাও কেন? কয়েক বৎসরের জন্য আমদানী কাপড়ের উপর "কড়া" শুল্ক স্থাপিত হইলেই এদেশে অনেক কল বসে। ফলকথা, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথায় অনেক অপচয়।

মার্কিনেরা এবিষয়ে বড় যুক্তিযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করে। ইউরোপ হইতে কোন একটী নূতন দ্রব্য তাহাদের দেশে গেল। তাহারা নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য ঐ দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া দেয়। সেই কয় বৎসরের মধ্যে তাহাদের দেশের শিল্পীরা ঐ দ্রব্যটী প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টা সফল হইলে শুল্ক উঠাইয়া লওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথাটী দেশীয় শিল্পোন্নতির ব্যাঘাতক এবং অনর্থক অর্থহানিকর।

কিন্তু ইংরাজ সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, ঐ জাতির বার্ত্তা শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতেরা স্বাধীন বাণিজ্য প্রণালীর যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই—অন্ততঃ এতদিন পারেন নাই। কিন্তু যাই জর্ম্মণী ও আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য তাঁহাদের তুল্য অথবা তাঁহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে অমনি কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন যে, স্বাধীন বাণিজ্য প্রথাটী বিশুদ্ধ প্রথা নয়, প্রত্যুত উহার প্রতি তাহাদের যে ভক্তিটা ছিল তাহা নিতান্ত অপসিদ্ধান্তমূলক!!

স্বাধীন চিন্তা।

কোন সময়ে পল্লিগ্রামনিবাসী একজন বর্ষীয়ান্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি ইংরাজদিগের মধ্যে এ অমুক ও অমুক বলিয়া চিনিতে পার কিরূপে? ওদের ত সকলেরই বর্ণ, গঠন, পরিচ্ছদ একরূপ!" এ কথাটীতে একটী প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে। সাদৃশ্যোপলব্ধি সামান্য জ্ঞানমূলক, বৈসাদৃশ্যোপলব্ধি বিশেষজ্ঞানমূলক। দূর হইতে দেখিলে পরস্পর বিসদৃশ বস্তুজাতকে পরস্পর সদৃশ বোধ হয়, নিকটে আসিয়া

দেখিলে পরস্পর সদৃশ বস্তুর মধ্যেও যে সূক্ষ্ম ভিন্নতা আছে তাহা উপলব্ধ হইয়া উঠে।

ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজ্য করিতেছেন, ভারতবর্ষীয়দিগের অনেক সংস্রবে আসিতেছেন, আমাদিগের ভাষাও কেহ কেহ শিখিতেছেন, এবং কেহ কেহ বা আমাদিগের শাস্ত্রাদি সমালোচনা করিতেছেন। কিন্তু যতই করুন তাঁহারা ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্নরুচি, ভিন্নপ্রকৃতি। তাঁহারা কখনই ভারতবাসীর তেমন ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন না। এবং সেই জন্য তাঁহারা ভারতবাসী জনগণের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য ভাবই অধিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন ভারত-বাসীদিগের মধ্যে গতানুগতিকতাই প্রবল, উহাদিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাতন্ত্রিকতা অল্প। যখন ইংরাজ এই কথা বলিলেন তখন ইংরাজি শিক্ষিত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরাও যে ঐ অভিমতি ধ্রুব জ্ঞানে গ্রহণ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ সকলেই জানেন যে, হিন্দুসমাজে বিভিন্ন সময়ে শাস্ত্রবাক্যের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সময়োপযোগী সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক রীতি নীতির এবং পৌরাণিক রীতি নীতির পর্য্যালোচনা করিলে এবং এখনকার সামাজিক নিয়ম সকল ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, হিন্দুসমাজে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন নিতান্ত অল্প হয় নাই এবং উহাঁদের মধ্যে কতকটা স্বাধীন পথাবলম্বনক্ষম চিন্তাশীল ব্যবস্থাপকদিগের অপ্রতুল ছিল না। ঋষি দিগের সন্তানেরা তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিয়া অধিকারীভেদে বিধির ভেদ হয় এই তথ্য সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া মদ্যাদি ব্যবহারের সঙ্কোচন, বর্ণসঙ্কর এবং শূদ্রদিগের অবস্থার উন্নতিসাধন, অতি অল্পে অল্পে কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণেই করিয়া আসিতেছেন। মিতাক্ষরার সম্মিলিত স্বত্বাধিকার ব্যবস্থা হইতেই যিনি বঙ্গদেশের অধিকতর উপযোগী দায়ভাগের ব্যবস্থা বাহির করিয়া লইলেন তিনি ইয়ুরোপীয়ের চক্ষেও কি স্বাধীন চিন্তাশীল নহেন? শ্রুতিবাক্যের উপরেই ষড়্‌দর্শন স্থাপিত বটে, কিন্তু ও গুলির প্রত্যেকই কি স্বাধীন চিন্তাশীল ঋষিদিগের

প্রণীত নয়? ভাষ্যকার এবং টীকাকারেরা যে প্রধান প্রধান গ্রন্থের স্ব স্ব মতবাদানুসারী ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও ত স্বাধীন চিন্তার ফল।

আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ছিল এবং এখনও আছে, একথা ইংরাজী শিক্ষিতদিগের কর্ণে বড়ই বিসদৃশ বোধ হইবে, এই জন্য "স্বাধীন" এবং "স্বাধীন চিন্তা" এই দুইটী কথার অর্থ একটু সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। আমরা যখন বলি ইংরাজেরা "স্বাধীন-জাতি" তখন এই কথাই বলিতে চাহি যে, উহারা ভিন্নজাতীয় অধিনায়ক-দিগের অধীন নহেন, স্বজাতীয় রাজপুরুষদিগের অধীনে এবং স্বজাতীয় ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত।—ইহাই স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার ইচ্ছানুসারে চলিলে, কোন প্রকার নিয়মের ও ব্যবস্থার অধীন না হইলে,তাহাকে স্বাধীনতা বলে না—তাহার নাম "উচ্ছৃঙ্খলতা"। উচ্ছৃঙ্খল মানুষ বা সমাজ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ইংরাজ যখন বাইবেল মানেন, স্বদেশীয় রীতিনীতি মানিয়া চলেন তখনও তিনি স্বাধীনচিন্তাশীল হইতে পারেন। আমরা আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কুলাচার মানিয়াও তদ্রূপ স্বাধীন চিন্তাশীল থাকিতে পারি। তাহাতে পরাধীনতা ঘটে না। তবে শাস্ত্রে আছে, "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"। শাস্ত্রের আদেশগুলি আমাদের যুক্তির মুখে বুঝিয়া লইতে শুধু স্বাধীনতা দেওয়া আছে এমন নয়, বিশেষ আদেশ করাই আছে। প্রতিকূল যুক্তিগুলি শুন অনুকূল যুক্তিগুলি ভাবিয়া দেখ, ভক্তি থাকিলে, উপযুক্ত গুরু পাইবে এবং অনুকূল যুক্তিগুলিই ধরিতে পারিবে, সংশয় ঢুকিতে পারিবে না এবং অন্ধ গোঁড়ামিও করিতে হইবে না। চেষ্টা করিলেই এরূপ "প্রকৃত স্বাধীন চিন্তার" বলে তথ্য জানিতে পারিবে এবং বুঝিবে যে, যাঁহারা আপনার শাস্ত্র মানে তাঁহারাই স্বাধীন। তাঁহাদের মন পরাধীন হয় নাই। এই "স্বাধীনতা" আছে বলিয়াই আমাদের দেশের ব্যবস্থাপকেরা কখন প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসন ত্যাগ করেন নাই। "প্রাচীন শাস্ত্রাচার এখন আর খাটে না, এখন অপরের আচার গ্রহণ করিতে হইবে"—এমন কথা আমাদের একান্ত আত্মগৌরবসম্পন্ন মহাত্মাদিগের মনে কখনও উদয় হইতে পারে নাই।

"এখনকার অবস্থায় এরূপ করা ভাল বোধ হইতেছে বটে কিন্তু আরও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক যে সেইরূপই ভাল কি না" ?—"অনেক ভাল লোকেরই ভাল বোধ হইতেছে ? তবে ভাল হওয়া অসম্ভব নয়"।—"কিন্তু প্রাচীন সর্ব্ব দিগ্দর্শী শাস্ত্রকারেরা তাহা হইলে সে উপদেশ দেন নাই কেন? আমাদেরই ত ভুল হইবার কথা"। তাই ত! এই শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থ কি এইরূপ নয়? ঋষিরা এ বিষয়ে কতকটা মত দিয়াছেন বলিয়াই ত দেখাইতেছে! আচ্ছা যতটুকু মত দিয়াছেন বলিয়া বুঝা যাইতেছে তাহা যখন পবিত্রতা রক্ষার—নিবৃত্তিমার্গের—অনুকূল, তখন ততটুকু মাত্র আচার ও ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন করা যাউক"।—আমাদের দেশের স্বাধীন চিন্তা এইরূপ। এবং এই জন্যই সকল সময়ে আমাদের শাস্ত্র বচনের অনুসন্ধান। ফলতঃ, ভক্তিমান, আত্মগৌরবসম্পন্ন, ধীরস্বভাব ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার উপায় নাই। সংযত ব্যক্তিকে সকল কাজ সাবধানে করিতে হয়। তাঁহাকে যদি স্বাধীনতাহীন বলিতে পার তবে হিন্দুও তোমার কাছে স্বাধীন চিন্তাবিহীন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন আমাদের সংস্কারকেরা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ মত প্রচার করিতে দেখিয়া নিজেদের ন্যায় "স্বাধীন চিন্তাশীল" বলিয়া স্থির করেন এবং আনন্দে অধীর হন। তিনি যে আচার ব্যবহারে নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, সেটা তাঁহাদের বড় বিসদৃশ ঠেকিত। শেষে তিনি যখন সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত দিলেন তখন আর "কৃতবিদ্যেরা" তাঁহাতে স্বাধীন চিন্তার আভাষ দেখিতে পাইলেন না। বিধবা বিবাহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন তাহার বিপরীত বলিয়া ঐ চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে চাঁদে কলঙ্ক বলিয়াই আমি মনে করি, কিন্তু যে জন্যই তাঁহার ঐ বিষয়ে ঐদিকে প্রবৃত্তি হউক তাঁহার জীবনে অনেকটা বরাবর একই ভাবের নিয়মানুগামিতা দেখিতে পাই। তিনি বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময়ে অন্তঃকরণের পরাধীনতা প্রকাশ করিয়া বৈদেশিক মত প্রচার চেষ্টা করিতেছিলেন না। ইংরাজী

শিক্ষিতেরা তাহা মনে করিয়াই সুখী হইয়াছিলেন বাহ প্রতিষেধ ধীরে
প্রকৃত পক্ষে পরাশর স্মৃতির অধীনে আসিয়া কতকটা স্ব অন্তর্ভুক্ত করিতে
রাখিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আন্দোলনের সময়েও.ওয়া যায়। বড় ঘরে
নায়কেরই অধীন ছিলেন, সুতরাং সহবাস সম্মতি সম্বন্ধোহবিচ্ছেদ প্রভৃতি—
ত্যাগ করিয়া ইংরাজী মতের পোষক অন্য কোন কিছু খুঁজি
এবং ইংরাজের গত গুলি "নিজের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত" বলিয়া
করিতে যান নাই? তবে তিনি যে সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজ
অনুকূল ছিলেন, সেটি দেশকাল পাত্র বিবেচনায় তাঁহার বুঝিবা রকম, তাহা ত

যে মনুষ্য যেরূপ কুলে জন্মিয়াছে, যেরূপ শিক্ষা পাইয়াে লনের সমুদায়টা
বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি সেইরূপ। যিনি সংস্কৃত শিক্ষা পাইয়াে রা খুব জোরে
কুলে জন্মিয়াছেন, নৈসর্গিক ভক্তিপ্রবণতা আছে, তীর্থভ্রম না, কেহ কিছু
লাভ করিয়াছেন, সাধু সঙ্গে পবিত্র হইয়াছেন, তিনি শাস্ত্রাচারে করেন, অনেকে
কিন্তু তিনি সেই জন্যই ইংরাজীওয়ালার চক্ষে স্বাধীন চিন্তাহ ষ্ট পীড়ন করে
বলিবেন—"সকল কথায় শাস্ত্রের উল্লেখ কেন? যুক্তি কি বলে মুঠার জায়গ
বলি, তোমার ঐ "যুক্তিটা" আর কখন কেহ ব্যবহার করি আম
যদি কখন কেহ করিয়া থাকে তবে তুমি তাহার অধীন! তাহার সে
যুক্তি অবলম্বন করিয়া "তুমি" স্বাধীন কিসে হইলে? যিনি সংস্কৃত শিখেন
নাই, বৈদেশিক সংসর্গে অধিক আসিয়াছেন, ইংরাজি ভাক্ত বিজ্ঞানের
দুটা গত শুনিয়া শিখিয়া লইয়াছেন, এবং নৈসর্গিক উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী,
তিনি নিজের বা নিজের অনুরূপ অবস্থাপন্ন লোকের চক্ষে "স্বাধীন চিন্তা-
শীল" হইলেও স্বজাতীয় সাধারণের নিকটে এবং প্রকৃত বুদ্ধিমান সকল
জাতীয় লোকের নিকটেই স্বাধীন চিন্তাবিহীন। তিনি অসম্পূর্ণ ইউরোপীয়
ভাক্ত বিজ্ঞানের দুটা গতের এতই অধীন যে, ঐ গত কয়েকটী অপেক্ষা
উচ্চতর কিছু থাকিতে পারে, এইটুকু অনুমান করিবারও ক্ষমতা তাঁহার
নাই! তাঁহার চিন্তার পরাধীনতা এতই কঠোর। ফলতঃ সংস্কারও শিক্ষা
ছাড়িয়া চিন্তাই হইতে পারে না। সুতরাং "স্বাধীন চিন্তা" একটা কথার
কথা মাত্র।

স্বাধীন চিন্তার প্রকৃত অর্থ স্বজাতীয় শাস্ত্রব্যবস্থার ও আচারের

উঠিবার সময় দম্ দম্ করিয়া শব্দ হইবে। জুতা মস্ মস্ করিয়া ডাকিবে, ঝনাৎ করিয়া কবাটের শব্দ হইবে, দর্শনমাত্রে অট্টহাস্যের হো হো রব উঠিবে, ঘড় ঘড় শব্দে চেয়ার সরিবে, অন্তঃপুরবাসিনীরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিবেন, বাটীতে একজন মানুষ আসিয়াছেন বটে!

ইংরাজের অনুকরণে আমাদিগের বাহ্য ব্যবহারে এইরূপ হঠকারিতা দোষ জন্মিয়াছে। ভিতরে অপেক্ষাকৃত অতি গুরুতর দোষ সকল দেখা দিতেছে। এই সেদিন আমি একখানি পত্র দেখিলাম। পত্রখানি এক জন ইংরাজী কৃতবিদ্য তাঁহার বিদেশস্থ পীড়িত পিতাকে লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই—"শ্রীচরণেষু—মহাশয় ত সে প্রদেশে গিয়া রহিলেন। বাটীতে যাঁহারা আছেন, সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে অল্প বা অধিক পরিমাণে ভুগিতেছেন। আমার আর কোন সেবা শুশ্রূষাই হয় না।" ইহার বহুকাল পূর্ব্বে ঠিক ঐরূপ ঘটনা হওয়াতে আর একজন তাঁহার বিদেশগত পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারও মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "শ্রীচরণেষু—খুড়ি ঠাকুরাণী এবং পিশি ঠাকুরাণী উভয়েই পীড়িতা হইয়া আছেন। আমারও শরীর যেরূপ তাহাতে উহাঁদিগের প্রকৃতরূপে সেবা হয় না—অতএব বিরাজকে তাহার শ্বশুরালয় হইতে একবার এবাটীতে আনয়ন করিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে। কিন্তু তাহারও ছেলেরা পাছে এখানে আসিলে পীড়িত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে একটু ইতস্ততঃ করিতেছি। মহাশয়ের যেরূপ অনুমতি হইবে, সেইরূপ করিব। ইতি"

এই দুইখানি পত্রের দুইজন লোকই ইংরেজীনবিশ—প্রথম খানির লেখক একেলে, দ্বিতীয় খানির লেখক সেকেলে। ঐ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একেলে নিজের সেবার ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়াই ব্যতিব্যস্ত,—সেকেলে গুরুজনের সেবা করিতে অসমর্থ বলিয়া উদ্বিগ্ন। কিন্তু একটী কথা বলিয়া রাখি—অনেক একেলের মধ্যে সেকেলে আছেন, এবং অনেক সেকেলের ভিতরেও একেলে ছিলেন। কোন সম্প্রদায় বা দল বিশেষের প্রতি দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়—ইংরাজীর বৃদ্ধি এবং ইংরেজের অনুকরণে অহং ভাবের আতিশয্য হইতেছে, ইহাই বলা মাত্র উদ্দেশ্য।

এ দেশে ইংরাজেরা খুব মোটা মাহিয়ানা পান, খুব বড় বড় বাড়িতে থাকেন, সর্ব্বকাল গাড়ী ঘোড়া চড়েন এবং দলে দলে চাকর নফর রাখিয়া থাকেন। "কৃতবিদ্যেরা" আপনাদিগের কি অবস্থা এবং ইংরেজদিগের কি অবস্থা, তাহা না বুঝিয়া ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া সময়ে সময়ে বড়ই বিভ্রাট করিয়া ফেলেন। থাকেন ছোট বাড়িতে—ঘরে ঢুকেন লাফ দিয়া—মাথায় দ্বারের চৌকাঠ ঠেকে। চাকর একটির বেশী নাই—সেই জল তুলিবে, বাজার করিবে, গোরুর জাব কাটিবে, কিন্তু বাটীর "কৃতবিদ্য" বাবুর সেই খানসামা—"বেহারা"। বাবু নিজে কোন কাজ স্বহস্তে করিবেন না—স্বহস্তে কাজ করা দূরে থাকুক, জুতা, কাপড় লাঠি, ঘড়ি, কেতাব পত্র সব ছড়াইয়া ফেলিবেন; কিছুই যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিবেন না। ফল এই হয় যে, দ্রব্য সামগ্রী তছরূপ হয়, চুরি যায় এবং প্রয়োজনের সময়ে হাতে আইসে না। যে "কৃতবিদ্য" মদ ধরেন নাই, তাঁহারও সাধারণ অনুকরণ দোষে এই দশা। ইংরাজদিগের দেখাদেখি মদ ধরিলে ত আর কথাই নাই, লক্ষ্মীছাড়া দশা পূর্ণমাত্রায় ঘটে।

"* * ঐ যে সাহেবের জিনিসপত্রগুলি নীলামে কেনা গেল, ওগুলি কেমন পরিষ্কার রহিয়াছে, ঠিক যেন নূতন।" * *—ইংরেজেরা জিনিস পত্র নষ্ট করেন না, উহাঁরা বড় সাবধানে দ্রব্যাদির ব্যবহার করেন—ভাঙ্গা চোরা ময়লা করা উহাঁরা বড়ই দোষ মনে করেন। উহাঁরা বাবুয়ানা করিতে জানেন, অথচ বাবুয়ানা করিয়া লক্ষ্মীছাড়া হন না।"

ইংরাজ অনেক কাজ স্বহস্তে করিয়া থাকেন—সকল কাজই স্বহস্তে করিতে পারেন। জিনিস পত্র ঝাড়া পোঁচা সযত্নে করাইয়া থাকেন। প্রত্যহ ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়া দেখেন, "মলাই ডলাই" ভাল হইয়াছে কি না। রুমাল দিয়া জিনের কোন অংশ ঘসিলে যদি ময়লা বাহির হয়, তাহা হইলে সহিসকে কৈফিয়ত করেন—ঘোড়দৌড় মাত্র করিয়া ঘোড়ার সম্বন্ধে উদাসীন হয়েন না। উহাকে উপযুক্তরূপ টহলান হয় কিনা দেখেন—উহার দানা খাওয়ান দেখেন—প্রত্যহ স্বহস্তে কিছু না কিছু খাওয়ান। কোট ভাল করিয়া রৌদ্রে দিয়া বুরুষ করা হইয়াছে কিনা

দেখিয়া লয়েন।—"এইরূপে বুরুষ করিতে হয়"—দেখাইয়া বাং য়া দিতে পারেন।

ইংরাজের বাবুয়ানায় 'আলস্য" নাই। ঘরদ্বার বল, ফুলবাগান বল, বাড়ীর ভিতরের রাস্তা বল, সকল দিকেই সযত্ন দৃষ্টি থাকে। এ দেশে অগাধ টাকা পাইয়া ইংরাজ নবাবী চাল দেখান এবং স্বজন প্রতিপালন করেন না বলিয়া নিজের উপর অধিক খরচ করিতে পারেন—কিন্তু ভিতরের খবর জানিলে উহাঁরা কিরূপ সাবধানে ও সুবিধায় জিনিস পত্র ক্রয়াদি করেন তাহা বুঝা যায়, এবং যত খরচ দেখায় তত যে নয় তাহার উপলব্ধি হয়। ফলতঃ অধিকাংশ ইংরাজই বেশ সঞ্চয়ী। উহাঁরা দেশে গেলে অতি সামান্য ভাবেই দিনপাত করিতে পারেন। উহাঁদের লক্ষ্মীছাড়া দশা নহে।

তবে উহাঁরা সকলেই স্ত্রী পুত্রের জন্য তেমন চিন্তা করেন না,কাজ কর্ম্মের অনেক সুবিধা বলিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ জন্যও তেমন ভাবেন না, হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ যাইতে বা ইনসলভেণ্ট হইতে লজ্জা বোধ করেন না, মদ্যাদি পান করেন—এজন্য অল্প আয়ের ও নিম্নশ্রেণীর ইয়ুরেশীয়ের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবেই লক্ষ্মীছাড়া দশা আছে। আমাদের কৃতবিদ্যেরা উহাঁদেরই অনুকরণ করিতে যাইতেছেন। "মধ্য শ্রেণীর ইংরাজের ইংলণ্ডীয় ব্যবহারের" অনুকরণ করিতে গেলে যে একেবারে আলস্য বর্জ্জন করিতে হয়।

রাজভক্তি।

স্বহস্তঘটিত মূর্ত্তির প্রতি দেববুদ্ধি হইতে পারে। আমরা যাহাকে আপনাদিগের মনঃকল্পিত গুণ এবং শক্তি সমূহের আধার বলিয়া জ্ঞান করি, তাহার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করা আমাদিগের পক্ষে কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রত্যুত বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, আমরা সর্ব্বস্থলেই আদৌ নিজ মানসসম্ভূত গুণাবলী দ্বারা পদার্থ বিশেষকে বিভূষিত করিয়া লইয়া

এবং তদনন্তর সেই অলঙ্কৃত পদার্থের প্রতি স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি, প্রভৃতি ভাবের আবির্ভাব করতঃ তত্তৎ রসে একান্ত নিমগ্ন হইয়া থাকি।

রাজভক্তি এইরূপ ভাব। সকলেই জানি যে রাজাও অন্যান্য সামান্য ব্যক্তির ন্যায় রোগশোকাদির বশীভূত, তিনি ভয়লোভাদিকে অতিক্রম করেন নাই, ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার ধন, গৌরব, শক্তি, মর্য্যাদা কিছুই নাই—রাজার যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার প্রজাবর্গের দ্বারা প্রদত্ত—তিনি প্রজাব্যূহের প্রতিভূ বই আর কিছুই নহেন। কিন্তু এ সমস্ত জানিয়াও আমরা রাজাকে সমস্ত শক্তির এবং গৌরবের আধার জ্ঞান করি। তিনি নরদেব—মনুষ্যের মধ্যে দেবতা—তিনি পূজ্যপাদ, তিনি নিষ্পাপ, তাঁহার দর্শনে পুণ্য, তাঁহার স্পর্শে রোগক্ষয় হয়। অন্য কথায় কাজ কি?—'সর্ব্বানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ"—রাজ শরীরে ইন্দ্র, যম, বরুণ কুবেরাদি যাবতীয় লোকপাল সমস্ত বিদ্যমান—তিনি ভূস্বামিরূপে পিতৃতর্পণের অংশাধিকারী।

ফলতঃ, রাজভক্তি যে আমাদিগের কল্পনামূলক ভাব তাহার কোনও সংশয় নাই। সুতরাং ব্যক্তিভেদে, জাতিভেদে এবং সমাজের অবস্থাভেদে যেমন কল্পনাশক্তির তারতম্য হয় সেইরূপ রাজভক্তিরও যে ইতর বিশেষ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। কল্পনাশক্তির প্রাবল্য থাকিলে উহা মনঃকল্পিত পদার্থের বাস্তবিক প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবেই বিস্মৃত করিয়া দেয় এবং ঐ শক্তি দুর্ব্বল হইলে প্রকৃত বিষয় কখনই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া যায় না।

প্রাচ্যদেশবাসী অপেক্ষা প্রতীচ্যদেশবাসীদিগের কল্পনাশক্তি প্রবলতর। সুতরাং ইউরোপখণ্ড অপেক্ষা আসিয়াখণ্ডে রাজভক্তির আধিক্য। ইংরেজদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা স্বভাবতঃ সমধিক রাজভক্ত। ইউরোপীয়দিগের যে রাজভক্তি তাহার সহিত রাজার সমাজপ্রতিভূত্ব এবং লোভদ্বেষসঙ্কুল মানুষভাব সর্ব্বদা সুস্পষ্টরূপে মিশ্রিত থাকে এবং রাজার প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের সর্ব্বদা সচকিত ভাবে দৃষ্টি প্রযুক্ত থাকে। ভারতবাসীরা রাজার প্রতি সমস্ত গুণের আরোপ করিয়া, বিশ্বস্ত অন্তঃকরণে মন ভরিয়াই তাঁহাকে ভক্তি করেন।

এই জন্য এদেশে সর্ব্বদা অতি সযত্নেই প্রজার হিতার্থে রাজশক্তির পরিচালনা করা আবশ্যক। যাহারা রাজাকে সর্ব্বগুণাধার মনে করেন তাহাদের সুখস্বপ্ন সুধুসুধু ভাঙ্গিয়া দিতে নাই। তাহাদের কোনও ভার বৃদ্ধি করিতে নাই। "একার্য্যটা অন্যায় তথাপি সম্প্রদায় বিশেষের বা রাজনীতির অনুরোধে করিতেছি" একথা কখন বলিতে নাই। অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক মনে করেন "আধুনিক দেশীয় সামন্ত রাজাদের মধ্যে অনেকে যখন সুধু নিজের সুখের এবং আড়ম্বরের দিকেই দৃষ্টি করেন, তখন এদেশের রাজধর্ম্মের আদর্শই ঐরূপ। হিন্দু মুসলমানের আমলে রাজা সমস্ত রাজস্ব নিজের ব্যয়ার্থে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, ঐ টাকা হইতে প্রজার জন্য কিছুই করিতে হইত না।"—কিন্তু রাজকোষ যে ন্যস্তধন, ইহা এই পুণ্য ভূমিতে নূতন কথা নহে। রামরাজ্যই ভারতবর্ষে রাজধর্ম্মের আদর্শ। বল বিক্রম এবং প্রজারঞ্জন উভয়েই অতুল্য! মুসলমান সম্রাট নাজীর উদ্দিন স্বহস্তে কোরান লিখিয়া তাহার আয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করিতেন। সাম্রাজ্যের রাজস্বের এক কপর্দ্দকও নিজের শরীরের জন্য ব্যয় করিতে আপনাকে অধিকারী মনে করিতেন না। এ কার্য্য মুসলমানদিগের প্রকৃষ্ট অভ্যুদয়কালেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু কখন কোনও ইউরোপীয় রাজা স্বপ্নেও একথা ভাবিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহারা সকলেই মোটা পেনসন পান এবং কখন প্রজারা দূর করিয়া দিলে কি খাইবেন তাহার জন্য সকলেই আমেরিকা ও সুইজারলণ্ডে সম্পত্তি কিনিয়া ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ানের ন্যায় দুটাকা গুছাইয়া রাখিতেছেন।

এদিকে হিন্দুশাস্ত্রের মহিমা এরূপ যে, দেশীয় রাজাদের জাঁকজমক প্রভৃতি—তুলা পুরুষ দান, দীর্ঘিকা খনন, নহরের জল আনয়ন প্রভৃতি—এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য দেবালয়াদির নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যেই মুখ্যতঃ ধনের প্রয়োগ করিয়া দেয় এবং দেশীয় শিল্পজাতেরও উৎকর্ষ উৎপাদন করে। ঢাকাই মসলিন, কাশীর কিংখাপ, কাশ্মীরী শাল, গাজিপুরী আতরের সৃষ্টি এদেশীয় রাজা ও নবাবদিগের আড়ম্বরপ্রসূত বটে, কিন্তু তাহার উৎপাদনে বহু শত বর্ষকাল ধরিয়া বহু সহস্র এদেশীয় লোক

প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে রাজা ও জমিদারেরা যে কিরূপ সামান্য বাটীতে থাকিতেন এবং কত বড় বড় যে দীর্ঘিকা খনন করাইতেন তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এই জন্যই ইউরোপীয়ের চক্ষে একান্ত অকর্ম্মণ্য সামন্ত রাজাও কার্য্যতঃ অনেকটা প্রজাহিতকারী এবং প্রকৃত পক্ষে প্রজার ভালবাসার পাত্র। উহাঁদের "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে খাওয়ান" ইউরোপীয়েরা একটা নিন্দার কথা স্বরূপ উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা যে অনেকটা শিক্ষাবিভাগের বৃত্তির রূপান্তর মাত্র তাহা বুঝেন না।

আজকাল দেশীয় রাজারা দীর্ঘিকা খনন, তুলাদান, দেশীয় শিল্পজাতের ব্যবহার, সকলই কম করিয়া বিলাতী শিল্প, বিলাতী খানা দেওয়া এবং বিলাতী কর্ম্মচারীতেই অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং সেই জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্য ধরণে "সিভিল লিষ্ট, বজেট এবং ডিপার্টমেণ্ট" প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় প্রজারঞ্জনে সমর্থ হইতেছেন না। প্রজারা রাজাকে যে পরিমাণ টাকা দিয়া দেশীয় কর্ম্মচারীর বেতনে, শিল্পের মূল্যে ও দানে তাহার যে পরিমাণ ফিরিয়া পাইত, এখন তদপেক্ষা অধিক টাকা দিতে হইতেছে—অথচ ফিরিয়া অনেক কম পাইতেছে। কতক ইংরাজীশিক্ষা প্রবেশ করায় দেশীয় রাজ্যেও প্রধান প্রকৃতিবর্গ ঐ সকলের খোঁজ লইতে আরম্ভ করিতেছে।

রাজকার্য্যের প্রতি এখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে অভ্যাস হওয়ায় এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা আর "দেশীয় বেবন্দোবস্তা নিয়ম খারাপ ছিল এখনকার বন্দোবস্তে সবই ভাল হইয়াছে" এই কথা শুনিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন না—তাঁহারা আর মোটা কথায় ভোলেন না। ঠিক ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের সুরে জিজ্ঞাসা করেন—"মোটের উপর দেশীয় প্রজারা এসব বন্দোবস্তে রাজস্বের টাকা বেশী ফেরৎ পাইয়াছে কি না?" তাহা না পাইলেই ত ইউরোপীয় মতে রাজকার্য্যের বন্দোবস্তে মৌলিক দোষ পড়িল।

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয়দিগের রাজভক্তির এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন তাঁহাদের মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতির অনুকূল নহে। এই জন্যই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় "ভোট" দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

প্রভৃতির হাঙ্গামা তেমন উপকারী বলিয়া বোধ হয় না। এদেশে রাজা ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া ধার্ম্মিক মন্ত্রীদিগের সহায়তায় যাহা যাহা করেন, তাহা তখনই হউক, অথবা দুই দিন পরেই হউক সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে ন্যায্য এবং প্রজাহিতকারীরূপে প্রতীয়মান হইলে ইংরাজী-শিক্ষিত প্রজার মধ্যেও রাজার প্রতি একটী দেববৎ ভক্তি জন্মিবার কথা। "আমরা কি বুঝি—এত দূরদর্শন—এত সহানুভূতি মানবে কি সম্ভবে?" এদেশীয় প্রজার মনে রাজার সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের উদ্রেকই প্রার্থনীয়। নচেৎ প্রজার ধর্ম্মহানি হয়। ইংরাজীশিক্ষিত হইলেও তাঁহারা ত এদেশজাত বটেন; সুতরাং রাজাকে সর্ব্বগুণময় মনে করিতে অন্তঃকরণের অন্তঃস্থলে তাঁহাদেরও অপ্রবৃত্তি নাই। এসকল গেল ইংরাজীশিক্ষিতদিগের কথা। এদেশীয় সাধারণ প্রজা সকল অবস্থাতেই রাজভক্ত আছে এবং নিজের গুণেই চিরকাল তাহা থাকিবে।

—**§**—

জীবনরক্ষা বা দৈনন্দিন পুস্তক।

সেদিন আমাদিগের বহুপূর্ব্ব পরিচিত কোন আত্মীয়ের পৌত্রপর্য্যায়ী একটী ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। ইহাঁর পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আমার পিতৃঠাকুর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কখন কখন আমাদিগের বাটীতে আসিতেন এবং আমার বয়স যখন আট দশ বৎসর তখন আমাকে লইয়া একটু আদর করিতেন এবং আমার অধ্যয়নাদি কিরূপ হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। পিতৃঠাকুরের ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমার বেশ স্মরণ আছে, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃপৌত্র এই আগন্তুককে আমি কখনই পূর্ব্বে দেখি নাই; ইনি আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। পরিচয় পাইবামাত্র পিতৃ ঠাকুরের ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্মরণ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে পিতৃঠাকুর কেমন সুখ্যাতি করিতেন তাহাও স্মরণ হইল এবং পিতৃ ঠাকুরের পাঠাবস্থার যে বিবরণ বালককালে শুনিয়াছিলাম তাহাও স্মরণ হইল। আমি আগন্তুকের সহিত সেই সকল পূর্ব্ব কথার আলোচনা করিতে লাগিলাম।

৫২।৫৩বৎসর পূর্ব্বে যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা যেন গত কল্য বা পরশ্ব হইয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। কাল যেন কিছুই চাপা দেয় নাই—সকলই সজীব এবং জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। জীবনের পথে গমন করিতে করিতে যখনই পাছু দিকে চাহিয়া দেখি, প্রায়ই অতীতভাগ অধিকদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না—কিছু দূর মাত্র দেখা যায়। সেই জন্যই আপনাদের জীবিত কালটী অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি কোনও কারণে অতীত কালভাগ অধিক দূর পর্য্যন্ত স্মৃতির চক্ষে খুলে, তবে আর আয়ুষ্কালকে তত অল্প বলিয়া বোধ হয় না এবং জীবনসুখভোগটি অতি গাঢ়তররূপেই হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে।

বস্তুতঃ কালের পরিমাপক, ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই। যে কালের মধ্যে ক্রিয়ার আধিক্য তাহাই দীর্ঘকাল। যে কালের মধ্যে ক্রিয়ার অল্পতা তাহাই অল্পকাল। নিদ্রাতে স্বপ্ন দর্শন অধিক হইলে নিদ্রার কালটী দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়—নিদ্রা গাঢ় এবং স্বপ্নশূন্য হইলে কালের অনুভব মাত্র থাকে না। এই জন্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে কাল ক্রিয়ার আধার মাত্র নহে, ক্রিয়াই কাল।

এই ভাবিয়া আমি আত্মীয় স্বজনকে একখানি দৈনন্দিন পুস্তক রাখিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিয়া থাকি। যিনি যিনি সেই পরামর্শানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদের আয়ুষ্কালও তাঁহাদের দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হইয়াছে—তাঁহাদের কাহার মুখ হইতে কখন পরমায়ুর অল্পতা নিবন্ধন কোন দুঃখের কথা শুনিতে পাই নাই।

বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতা।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ"। এ দেশের লোকেরা সেই বাণিজ্য অথবা কৃষিকার্য্য কিছুই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন না বলিয়াই ইহাঁরা নির্ধন হইয়া আছেন। যদি মনে করা যায়, কেনই ইহাঁদিগের ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা হয় না, তাহার আর কোন উত্তরই ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না, কেবল এই মাত্র বলা যাইতে

পারে যে, ইহাঁরা ক্ষীণপ্রকৃতি ও ভীরুস্বভাব এবং অত্যন্ত আলস্য-পরায়ণ, অতএব ইহাঁদিগের আকাঙ্ক্ষা দুর্ব্বল, ইহাঁরা কোন-নূতন কর্ম্মে হাত দিতে পারেন না এবং পরিশ্রমকেই তদ্দ্বারা প্রতিবিম্বের সকল দুঃখের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

মহাভারতে একটি শ্লোক আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমুদায় পৃথিবীতে যাবৎ রত্ন আছে, সমুদায় প্রাপ্য হইলেও দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি-দিগের মন পরিতৃপ্ত হয় না।

পৃথিবী রত্নসম্পূর্ণা হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎসর্ব্বং তস্মাত্তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ।

আমি যখন ঐ শ্লোকটি শুনিলাম তখনই মনে মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, এমন লোক কি কখন এই বাঙ্গালার মাটীতে জন্মিয়াছিল যে, পৃথিবীর সমুদায় রত্ন পাইলেও সে তুষ্ট হইত না। সম্প্রতি ত তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না! সচরাচর মনুষ্যেরা বিদ্যা সম্ভ্রম শক্তি এবং ধন এই চারিটি পাইবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু আমা-দের দেশের লোকেরা এক্ষণে "এণ্ট্রেন্স" পর্য্যন্ত বিদ্যা করিয়া তুলিতে পারিলেই অধিকাংশ সন্তুষ্ট হয়েন। যিনি এলএ পর্য্যন্ত উঠিলেন, তিনি ত মহামহোপাধ্যায় হইলেন। যিনি বিএ তিনি অতীতাধ্যাপক, আর যিনি এমএ তাঁহার কথাই নাই—তাঁহার বিদ্যা উপচিয়া পড়িতে থাকিল—শরীর মধ্যে আর উহার স্থান হয় না—তাঁহার চলিতে বা কথা কহিতে গেলেই বিদ্যাবত্তার চিহ্ন সমস্ত যেখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু ইউরোপে ত এরূপ হয় না। সেখানকার বিএ বা এমএ রাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় লোক নহেন, যাঁহারা কোন তথ্য উদ্ভূত বা আবিষ্কৃত করিতে না পারেন তাঁহারা আপনাদিগকে সামান্য লোকের মধ্যেই জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমাদের এখানেত কেহই কোন নূতন ব্যাপার বাহির করিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সচেষ্ট হইলেন না। বিদ্যালয়ের নিয়োজিত কয়েকখানি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলেন। আমাদিগের বোধ হয় যদি দুই একজন বাঙ্গালী কিছু নূতন কাজ করিয়া তুলিতে পারিতেন তাহা হইলেই বাঙ্গালা দেশের নাম

উজ্জ্বল হইয়া উঠিত এবং বাঙ্গালী জাতিটির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়া এদেশের শাসন প্রণালীও এক্ষণকার অপেক্ষাও অনেকাংশে ঔৎকর্ষ লাভ করিত। বিদ্যা বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ত এইরূপ। সম্ভ্রমের আকাঙ্ক্ষা ইহা অপেক্ষা বড় অধিক প্রবল বলিয়া বোধ হয় না।

শান্তি ও সুখ।

শান্তি ও সুখ দুইটী শব্দ লোকের মুখে শুনিতে যত পরস্পর নিকটবর্ত্তি-ভাবব্যঞ্জক প্রকৃত পক্ষে উহারা তেমন নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট নয়। নিকট কি? প্রত্যুত ঐ দুইটীর মধ্যে অনেকটা বৈপরীত্য সম্বন্ধই দেখা যায়। শান্তি ধৈর্য্যগুণকে অবলম্বন করে, স্থৈর্য্যকে সমানয়ন করে, আত্মপরে সম্মিলন করে; বিষয়ানুরাগ হ্রাস করে, নম্রতা, দয়া, ক্ষমা, তুষ্টি প্রভৃতি কোমল মনোভাবের পোষণ করে। সুখ কার্য্যপরতাকে অবলম্বন করায় দুরাকাঙ্ক্ষার সমানয়ন করে, আত্মপরভেদ বৃদ্ধি করিয়া দেয়, বিষয়ানুরাগ জ্বালাইয়া তুলে, ধৃষ্টতা কাঠিন্য লালসা এবং অসন্তোষ প্রভৃতি মনোভাবকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। শান্তি এবং সুখে অনেক প্রভেদ। শান্তি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে, সুখ বিষমতা আনিয়া দেয়।

ঐ যে কথাগুলি বলা হইল তাহার উপর একটী বিচার চালান যায়। বস্তুতঃ আজি কালি ইংরেজদিগের হিতবাদ এবং জর্ম্মণদিগের অনুশীলনবাদ শিখিয়া ইংরাজীশিক্ষিত নব্যদল বুঝিয়াছেন যে, সুখই জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং শান্তিতে এবং সুখেতে আমি যে প্রভেদ আছে বলিলাম তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বলিতে পারেন—শান্তিই কিসের জন্য? উহাও ত সুখের জন্য। আমি বলি তাহা নয়—শান্তি শান্তিরই জন্য। যে সমাজে ধর্ম্ম শিক্ষাদি গুণে লোকের মন শান্তির দিকে যায়, সে সমাজে লোকের প্রকৃতি কিরূপ হয়, আর যে দেশে মানুষের মন সুখানুসন্ধানেই রত তথায় মনের ভাব কিরূপ হইয়া থাকে, আমি ইহাই বলিয়াছি। তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে, যাঁহারা বলেন মানুষ সুখের জন্যই সকল কাজ করে তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে অনেক প্রকার কষ্ট কল্পনা করিতে হয়

সাক্ষাৎ ইখানুসন্ধান সকল কার্য্যের মূল নহে। ঐ যে সেদিন মান্দ্রাজের অগ্নিকাণ্ডে একটি সুশিক্ষাসম্পন্ন যুবাপুরুষ চারিটী লোকের প্রাণ বাঁচাইয়া পঞ্চমটীকে বাঁচাইতে গিয়া স্বয়ং মারা পড়িল সে কি আত্মসুখের জন্যই ওরূপ করিয়াছিল? যদি এমন সকল স্থলে সুখানুসন্ধানের আরোপ করা যায়, তাহাতে প্রকৃত তথ্যের নির্ব্বাচন কিছুই হয় না। সুখ শব্দের লক্ষণ মাত্র পরিবর্ত্তিত করা হয়, অর্থাৎ এই বলা হয় যে, যে জন্য যাহা কিছু করা হউক সে সকল উদ্দেশ্যেরই নাম সুখ।

ইহাকে আত্মাশ্রয় দোষ বলে। বস্তুতঃ মানুষই বল, আর অপর প্রাণীই বল, আর উদ্ভিদই বল, আর যাহা কিছু বল, সকলই শক্তির আধার অথবা শক্তিময় অথবা শক্তিস্বরূপ বলিতে পার। একটী পরমাণু যে আর একটী পরমাণুকে আকর্ষণ করে তাহার কারণ কি? অগ্নি যে স্থানে থাকে তাহার চতুর্দ্দিকে উত্তাপ বিতরণ করে কেন? উদ্ভিদ যে দিকে আলোক পায় ফিরিয়া ঘুরিয়া সেই দিকেই বাড়িয়া যায় কি জন্য? সদ্যোজাত বানরশিশু যে মাতৃগর্ভ হইতে অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া বৃক্ষশাখা ধরিতে পারে তাহার হেতু কি? নরশিশু জাতমাত্র মাতার স্তনে মুখ দেওয়াইলেই, তাহা টানে কেন?—পরদুঃখ দেখিলেই ধর্ম্মশীল মনুষ্যের মনে দয়ার উদ্রেক হইয়া সেই দুঃখ নিবারণের চেষ্টা হয় কেন?—এই সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—উহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ অথবা সংস্কারজাত কিম্বা শিক্ষালব্ধ গুণ। যদি তাহারও কারণ জিজ্ঞাস্য হয় তবে নিরীশ্বরবাদীকে "জানিনা" বলিতে হয় এবং সেশ্বরবাদী বলেন "ঈশ্বরের ইচ্ছা—কিন্তু সেই ইচ্ছার কারণ কি জানি না।" মানুষের কাজও স্বভাবসিদ্ধ, সংস্কারসিদ্ধ এবং শিক্ষাসিদ্ধ বস্তু। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই কোনও উদ্দেশ্যই নিশ্চিত থাকে না, কর্ত্তার নিজের মনেও উদ্দেশ্য অনুভূত হয় না। যেগুলির উদ্দেশ্য অনুভূত হয়, সেগুলিও সকলে সুখানুসন্ধানপ্রেরিত হয় না। এই জন্য কর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য আর কাম্য। নিত্য কর্ম্মে কোনও উদ্দেশ্য নাই করিতে হয় তাই করি। কাম্য কর্ম্মে উদ্দেশ্য এবং অভিলাষাদি থাকে। নিত্য কর্ম্মও যেমন বিধি প্রণোদিত হইয়া করিতে হয় কাম্য কর্ম্মও সেইরূপ বিধি নিষেধ মানিয়া সংযতচিত্তে করিতে হয়।

যাহা ইচ্ছা তাহাই যে নিজের সুখোদ্দেশ্যে অসঙ্কুচিতরূপে করিয়া ফেলিতে পারা যায় তাহা নহে। তবে বিধিপ্রণোদিত কার্য্যেই ক্রমশঃ শান্তি লাভ হয়।

সমাজ সংস্কার।

কোন সমাজেরই সংস্কার বিশুদ্ধ অনুকরণের দ্বারা হইতে পারে না। হিন্দু সমাজের কোন নিয়ম তোমার মন্দ বোধ হইয়া থাকে এবং তাহার সংশোধনের ইচ্ছা হইয়া থাকে, একটু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখ যে, ঐ নিয়মের সহিত অপর কোন্ কোন্ নিয়মের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, এবং তাহা দেখিলেই কোন্ ভাগে কেমন করিয়া পরিবর্ত্ত করিতে হইবে, আর হইবে কি না তাহা বুঝিতে পারিবে। ৺ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কারক গাছে গাছে ফলে না। প্রকৃত সংস্কারক বড়ই অসাধারণ জিনিস। কিন্তু আজি কালি যে দুই পৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়াছে সেই সংস্কারক। হিন্দু সমাজ বড়ই উচ্চ পদার্থ; যে ইহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই ভাগ্যবান পুরুষ। এই সমাজ পৃথিবীর অপর সকল সমাজ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তির অধীন, সুতরাং ইহাতে উপদেষ্টৃ যাজকবর্গের প্রাধান্য। উপদেষ্টার প্রাধান্য সংযম ও বিদ্যাবত্তার উৎকর্ষে; অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সংযমশীল ও বিদ্যাবান করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দু সমাজের সম্যক্ বলবত্তা জন্মিবে। শুদ্ধ আর্য্যশাস্ত্রে বিদ্যাবান করিলেও অনেক দূর হইবে, কিন্তু যদি উভয়, সংস্কৃত দর্শনে এবং ইংরাজী বিজ্ঞানে, দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে প্রগাঢ় বিদ্যাসম্পন্ন করিতে পার তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই। হিন্দু সমাজ যে জন্য এতদিন এত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সজীবাবস্থ, আছে, সেই উদ্দেশ্য বিনা বিঘ্নে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহা না হইলেই যে পারিবে না এমন নহে। তবে মধ্য পথে অনেক বিঘ্ন াপত্তি হইবে, কেখন কখন শত্রুপক্ষীয়েরা হাসিবে, আর মিত্রপক্ষীয়েরা ।তে t

হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্থপরতা স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ ভাব মার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয় তবে হিন্দু সমাজ অবশ্যই উহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিবে, এবং ইউরোপ খণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করিবে। বেকন ডেকার্ট কাণ্ট প্রভৃতিরা যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রের জ্যোতিঃ তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু চীন জাপান প্রভৃতি আসিয়া খণ্ডকে যেমন ধর্ম্ম জ্যোতিঃ দিয়াছে তাহা অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতিঃ ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে। জর্ম্মণ দার্শনিক সোপেনহার বলিয়াছেন, "যেমন গ্রীসদেশ হইতে ইউরোপ যত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার ভারতবর্ষ হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল আলোক পাইবে— আমার জীবনের সুখ এবং মৃত্যুর সম্বল যে ভারতবর্ষীয় উপনিষদ গ্রন্থনিচয় তাহা অনধিক কাল মধ্যে ইউরোপীয় এবং অন্যান্য জাতীয় সকল গ্রন্থের উপরিভাগে অতি গৌরবে আসন পরিগ্রহণ করিবেই করিবে।"

সামাজিক ব্যবস্থা।

সমাজে ব্যবস্থার প্রয়োজন দুইটী কারণে হয়। এক কারণ সমাজান্তর্গত জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি নিবন্ধন উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য সামগ্রীর অভাব; দ্বিতীয় কারণ, ভিন্ন সমাজের সহিত সংঘর্ষ। প্রথম কারণ হইতে সমাজান্তর্গত যাবতীয় নিয়মের উৎপত্তি। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণের সহিত জনসংখ্যার সমীকরণ দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বাড়াইয়া এবং (২) জনসংখ্যা অতিবর্দ্ধিত হইতে না দিয়া। সকল সমাজে ঐ দুইটী অবলম্বিত হইয়া থাকে। তবে সমাজের মূল প্রকৃতি অনুসারে ঐ পথগুলি বিভিন্ন হয়। খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রথম উপায় ভূম্যাদিতে স্বত্বসংস্থাপন। তাহা (১) অনাবাদী ভূমির আবাদ দ্বারা হয়, আর (২) আবাদী ভূমির কৃষির পারিপাট্য বৃদ্ধি

করিয়া হয়। দেশের ভূমি হইতেই মনুষ্যের জীবনোপায়; অতএব ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত উহাতে স্বত্ব নিরূপণ হয়। স্বত্ব সংস্থাপিত হইলেই দ্রব্যের প্রতি স্বত্বাধিকারীর যত্ন হয়। প্রথমে স্বত্বটা গোষ্ঠীপতি বা গৃহস্বামীতে প্রকটীভূত হইয়া থাকে। বন জঙ্গল কাটিয়া যে ব্যক্তি কোন ভূমির আবাদ করিবে, সে ঐ ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবে, যে সমাজে এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, (যথা মনুসংহিতার সময়ে এদেশে হইয়াছিল) তথায় অনাবাদী ভূমির সত্বরেই আবাদ হইয়া যায়। তাদৃশ সমাজে কৃষির পারিপাট্যও জন্মে। তদ্রূপ সমাজে পিতৃধনে সকল পুত্রেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। যে সমাজে ওরূপ নিয়ম না হইয়া সমুদয় বা অধিকাংশ ভূমি রাজার অথবা প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীর বস্তু বলিয়া অবধারিত হয় (যেমন ফিউডাল সিষ্টেমের সময় ইউরোপে হইয়াছিল) তথায় অনাবাদী ভূমির সত্বরে আবাদও হয় না, আর কৃষিকার্য্যের তেমন পারিপাট্যও জন্মে না। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল দেশে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃষকবর্গের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে সেই সকল দেশেই ভূমির আবাদ ভাল হইয়াছে এবং কৃষিকার্য্যেরও উৎকর্ষ জন্মিয়াছে। কোন কোন দেশে এখনও ভূমিতে প্রজার স্বত্ব স্বীকৃত হয় না—যথা ইংলণ্ডে। ওখানে প্রজাস্বত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত এই কথা বলিয়া আজি কালি অনেকে মত প্রচার করিতেছেন এবং ভূম্যধিকারিবর্গের বিহারের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূমিভাগ যে অকৃষ্ট থাকিবে আর যাহাও কৃষ্ট হইবে তাহা পাশুপাল্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে, ইহাও অতি অন্যায্য ব্যবস্থা বলিয়া অনেকের প্রতীত হইতেছে।

ইংলণ্ডে ভূম্যধিকারিবর্গের প্রভুতা অধিক এবং দায়াধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সকল স্বত্ব বিভাগের প্রতিকূল। ওখানে পৈত্রিক ধনের অধিকার জ্যেষ্ঠ পুত্রতেই বর্ত্তে আর কোনও পুত্র কিছুই পায় না। এরূপে ঘটিত যে সমাজ তাহার অন্তরে জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধিসহকারে জীবনোপায় বৃদ্ধি পায় না, সে সমাজের লোককে বাঁচিতে হইলে স্বদেশের বাহিরে চলিয়া আসিতে হয় অথবা কৃষি ভিন্ন অন্য কোন জীবনোপায় বাহির করিতে হয়। ইংরাজেরা দুইই করিয়াছেন। স্বদেশ হইতে দলে দলে

বাহির হইয়া অপরাপর দেশ অধিকার করিয়াছেন আর আপনাদের দেশেও কলকারখানা প্রস্তুত করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় আপনাদের শিল্পজাত বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে বিজিত রাজ্যের ভূমিতে রাজার হয় বটে, কিন্তু পৈতৃক ধনে পুত্র কন্যা উভয় প্রকার সন্তানেরই স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই ভূমিবিভাগ জন্মে এবং স্বদেশমধ্যেই অধিক লোকের জীবনোপায় হয়। চীনীয় এবং জাপানীয়দিগের মধ্যে ভূসম্পত্তি রাজার বলিয়াই গণ্য এবং আর্য্যদিগের মধ্যে রাজস্ব যেমন রক্ষণাবেক্ষণের ভৃতিস্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত, উহাদিগের মধ্যে তাহা নয়, রাজস্বটী রাজার স্বত্বাধিকারিতার ফল—তাঁহার ভাগধেয়। কিন্তু উহাদিগেরও মধ্যে পৈতৃক ধনবিভাগ সকল পুত্রসন্তানের মধ্যে সম পরিমাণে হয়—আর জ্যেষ্ঠাধিকারের ত কথাই নাই—ভারতবর্ষেও যে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রচলিত ছিল তাহারও নাম গন্ধ নাই। চীন জাপান প্রভৃতি দেশে অনাবাদী ভূমি নাই বলিলেই হয়, উহারা কৃষিকার্য্যেও অতি নিপুণ অতএব ঐ সকল সমাজে, ও স্বদেশের অন্তর্ভাগেই জীবনোপায় করিবার জন্য প্রকৃত চেষ্টা হইয়াছে।

সমাজে জনসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার নিমিত্তও সর্ব্বত্র চেষ্টা হইয়াছে, বৈবাহিক বিশেষ বিশেষ নিয়ম সেই চেষ্টাসম্ভূত বস্তু। কোনও সমাজের আদি অবস্থার বৈবাহিক প্রথা ভাল নয়। আমাদের যে আট প্রকার বিবাহের কথা মনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে তাহার একটী ভিন্ন সকলগুলিই পশুবদাচরণসম্পন্ন এবং ঘৃণাকর। সীজর নিজ গ্রন্থে তৎকালের ইংলণ্ডবাসী লোকেরা"—কেও" পত্নীত্বে গ্রহণ করিত বলিয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে আমাদের আট প্রকারের বিবাহের সকল প্রকারই ছিল, আর বৌদ্ধ জাতীয়েরা যে ঐ বিষয়ে বড়ই অল্প বিচার করিত তাহা উহাদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সমাজের আদিমাবস্থা গিয়া যখন বিচারের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বিবাহ দুই প্রণালীতে মাত্র হইয়া থাকে—এক যাহাকে আমরা ব্রাহ্মবিবাহ বলি, আর দ্বিতীয় যাহাকে গান্ধর্ব্ব

বলা যায়। হিন্দুসমাজে আর গান্ধর্ব্ব বিবাহও প্রচলিত নাই, কেবল ব্রাহ্ম বিবাহ আছে। ইউরোপে গান্ধর্ব্ব এবং ব্রাহ্ম অথবা উভয় মিশ্র আছে, মুসলমানদিগের ব্রাহ্ম এবং পিশাচ আছে, বৌদ্ধদিগের ব্রাহ্ম গান্ধর্ব্ব আছে। অতএব বিবাহপ্রণালীর সংকোচ হিন্দুসমাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এবং বোধ হয় সেই জন্য দত্তক এবং ঔরস দুই প্রকারের পুত্রত্ব বিধান হইয়াছে। অন্য সকল সমাজে ঔরস ভিন্ন পুত্র হয় না। হিন্দুসমাজে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের বিধান দ্বারা এবং ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিধবা-বিবাহের নিষেধ দ্বারা বৈবাহিক প্রণালীর আরও সংকোচ হইয়াছে। বাল্য বিবাহের দ্বারা সন্তান জনন অল্প হয়, কি অধিক হয়—সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয় মত পাওয়া যায় নাই—আমার অনুমান এইরূপ যে, বয়োধিক বিবাহে যত সন্তান হইবার সম্ভাবনা, বাল্যবিবাহে তাহার অধিক নয়। যে গাছে আগে ফল ধরে তাহার ফল শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, যদি একথা প্রকৃত হয় তবে বাল্যবিবাহও অন্যান্য উপায়ের ন্যায় লোকসংখ্যা ন্যূন না করুক উহা বৃদ্ধি করিতেছে না। ইউরোপীয় সমাজগুলিতেও জনসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার উপায় হইয়া আছে। যে সকল দেশ কাথলিক মতাবলম্বন করিয়া আছে, সেগুলিতে অনেক নরনারী চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে, আর যে সকল দেশ প্রটেষ্টাণ্ট মতানুগামী সেখানে চিরকৌমার ব্রত না করুক কিন্তু অনেক লোকে বিবাহ করে না, আর যাহারা করে তাহারা অধিক বয়স হইলে বিবাহ করে, সুতরাং সন্তান অল্প হয়। ইংলণ্ডে কুমারীগণ ১৪।১৫ বৎসর বয়সে গর্ভধারণ যোগ্যা হয়, কিন্তু ওখানে ২১।২২ বৎসরে তাঁহাদিগের বিবাহ হয়; অতএব ইহাতে যে সাত আট বৎসর বাদ যায়, সে সময়ের মধ্যে বিবাহ হইলে তিন চারিটী সন্তান হইতে পারিত। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ফরাসিজাতীয়েরাই সামাজিক নিয়মের বিনাবলম্বনে আপনাদিগের জনসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিয়াছে, মুসলমানেরা অল্প বয়সে বিবাহ করে এবং অনেকে বিবাহ করে। সেই বহুবিবাহ অপত্যসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখে। ভূতপূর্ব্ব নবাব নাজিমের ২৬টী বেগম ছিল কিন্তু নবাব সাহেবের সন্তানসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬টী হইয়াছিল এবং তাহারও বত্রিশটী নাকি

শৈশবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, ২৪টী বই বাঁচে নাই। কি এখানে, কি অন্যত্র, বড ছোট অনেক মুসলমানের ঘরেই এইরূপ হইয়া থাকে।

বৌদ্ধমতাবলম্বি জাতীয়দিগের বিবাহ এক সময়ে একাধিক হয় না, তাহারা খুব বয়স পার করিয়া দিয়াও বিবাহ করে না। ইহাদিগের বৈবাহিক প্রণালীতে সন্তানসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার কোন উপায়ই দেখা যায় না, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে শিশুহত্যা প্রচলিত।

অধিকারী ভেদ ও স্বদেশানুরাগ।

আমি মাতৃভূমির নানা দেশ দর্শন করিয়াছি। যে সকল ভাগ স্বচক্ষে দর্শন করি নাই তাহারও বিবরণ যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছি। যখন যেখানে গিয়াছি অথবা যেখানকার বিবরণ পাঠ করিয়াছি সকলই যেন দুই প্রকার চক্ষুতে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইয়াছে—এক, আমার চর্ম্মচক্ষুতে; অপর, হৃদয়াধিষ্ঠিত কোন মহাপুরুষের জ্ঞানচক্ষুতে। যখন আমার বয়ঃক্রম পঞ্চম বর্ষের অনধিক, তখন পিতৃদেবের স্থানে রামায়ণের প্রথম শ্লোক আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছি, পরে যখন দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স তখনও তাঁহারই স্থানে ঐ শ্লোকের সর্ব্বজনবিদিত লৌকিক ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। যখন বয়স দ্বাবিংশবর্ষ তখন তাঁহারই স্থানে আবার ঐ শ্লোকের আধ্যাত্মিক ভাব অবগত হইয়াছিলাম। একই শ্লোক একই গুরু, একই শিষ্য—কিন্তু কাল ভেদে অধিকার ভেদ এবং ব্যাখ্যায় প্রভেদ।

যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থ প্রকাশক কোন কার্য্যাই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই

বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথায় প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে আর্য্যবংশীয়দিগের চক্ষুর্তে বায়ান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদায় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ-ঐশ্বরী দেহ।

ধর্ম্ম-বুদ্ধি, ভক্তি-প্রীতি ও আচার রক্ষা।

বহুজন্ম জন্মান্তরে মনুষ্যদেহধারণ হইয়াছে, সেই দেহে মস্তিষ্কভাগ প্রধান এবং পরবর্ত্তী অপর মস্তিষ্কের মধ্যে ধূম্রভাগ (grey matter) সর্ব্ব প্রধান। সেই ভাগ বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবৃত্তিদিগের স্থান। অতএব মনুষ্য যেরূপে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, যদি সেই অনুক্রম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তবে বুদ্ধি এবং ধর্ম্মবৃত্তিদিগের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করাই আবশ্যক। বিনা অনুশীলনে বৃত্তিদিগের বলহানি হয়।

যথা পরিণতং শস্যং পতেৎ প্রসববন্ধনাৎ।
তে পরিণতপাপ্মানঃ পতিষ্যন্তি তথা স্বয়ং॥

অর্থাৎ শস্য পাকিলে যেমন আপন বোঁটা হইতে খসিয়া পড়ে তেমনি পাপ পরিণত হইলে পাপিগণ আপনারাই পতিত হয়।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ, আচারঃ পরমং তপঃ।
আচারাৎ বর্দ্ধতে হ্যায়ুঃ, আচারাৎ পাপসংক্ষয়ঃ।

সুখ, ধর্ম্মের সহচর হইতেও পারে নাও হইতে পারে। কারণ সুখ দুঃখ উভয়ই অভ্যাসস্থলে লঘু হইয়া যায়। কিন্তু ধর্ম্মাচরণের বিশিষ্ট অভ্যাসই ধর্ম্ম।

মস্তিষ্কের উর্দ্ধতমভাগে ভক্তি (veneration) এবং প্রীতির (Love) অবস্থান। ঐ দুই বৃত্তি সর্ব্বশেষে উন্মেষিত হয়। অতএব উহাদিগের অনুযায়ী কার্য্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। 'ভক্ত্যা প্রীত্যাচ পূজয়েৎ' এই মহাবাক্যের বিশেষ সমর্থন করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহাদের কার্য্যদর্শনে এরূপ প্রতীতি জন্মে যে তাঁহাদিগের মস্তিষ্কে ভক্তি এবং প্রীতি সমধিক প্রবলা, তাঁহাদিগের অনুকরণ করা সৎপরামর্শ। তাঁহারাই প্রকৃত "মহাজন"।

যাঁহাদের অন্তঃকরণে প্রীতি থাকে, তাঁহারা কখনই "আর্য্য সমাজের বিগর্হিত আচরণে" প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

প্রকৃতি দেবী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। এই জন্য বিভিন্ন দেশবাসীদিগের ধর্ম্মপ্রণালী ভিন্ন এবং আচারপদ্ধতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। একদেশের ধর্ম্ম অন্য দেশে পরিগৃহীত হইতে গেলেই আচার পদ্ধতির বিকৃতি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য এক দেশের বা এক জাতির ধর্ম্ম অন্য দেশের বা অন্য জাতীয়ের উপর প্রচালিত করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ইউরোপীয়েরা জাত্যন্তর (য়িহুদীদিগের) হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে একেবারে আচারপদ্ধতি-পরিশূন্য হইয়াছেন এবং সেই জন্যই ইউরোপের ছোট লোকেরা নিতান্ত পশুবৎ হইয়া আছে। ভারতবর্ষীয়েরা এখনও আচারপদ্ধতি-পরিহীন হয়েন নাই বলিয়াই এখনও তাঁহাদিগের মধ্যে কতকটা উৎকর্ষ সংরক্ষিত হইতেছে।

স্বাধ্যায় রক্ষা না করিলে বুদ্ধিবৃত্তি এবং কার্য্যপ্রবৃত্তি হ্রস্বতেজা হইয়া যায়। এই জন্যও অর্থাৎ যদি বিদ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন বোধ না হয়, তথাপিও কিছু কিছু স্বাধ্যায় পাঠনার নিত্যপ্রয়োজন।

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়।

সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিনটী কথা যেন কতকটা কথার কথা বলিয়াই মনে হইতেছে। যাহাকে স্থিতি বলে, সেত কেবল বর্ত্তমান কাল লইয়া। কিন্তু বর্ত্তমান কালের অস্তিত্বই প্রকৃতরূপে অবধারণ হয় না। উহার কিয়দংশ অতীতের অন্তর্ভুক্ত এবং অপরাংশ ভাবীর

মধ্যগত। সুতরাং বর্ত্তমান কালই নাই এবং সেই জন্য স্থিতিও নাই। যাহাকে স্থিতি বলে তাহার যে ভাগ বর্ত্তমানের প্রথমাংশে সেটী কারণতাপ্রাপ্ত সুতরাং তাহা উৎপত্তি বা সৃষ্টি এবং যে ভাগ বর্ত্তমানের উত্তরাংশে সেটী কার্য্যতাপ্রাপ্ত বা লয়। অতএব সৃষ্টি এবং লয় বই স্থিতির অন্যবিধ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু তাহা কি সত্য?—নূতনও কিছুই সৃষ্ট হয় না, লয় হইয়াও কিছু একেবারে যায় না। যাহাকে নূতন বলে তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র এবং যাহাকে বিনাশ বলে তাহাও রূপান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। যখন কোন দ্রব্য সৃষ্ট হইতেছে বলি, তখন যে আর কতকগুলির লয় হইয়া গেল তাহা ভাবি না, আবার কোন বস্তুর লয় হইল যখন বলি তখনও যে সেই লয় জন্য অপর বস্তুর উৎপত্তি হইল তাহা ভাবি না। যদি তাহা ভাবিতাম তবে সৃষ্টিতে আর লয়েতে কোন বিশেষ দেখিতে পাইতাম না। অতএব সৃষ্টি এবং লয়ে অভেদ—কারণে এবং কার্য্যে—অভেদ। তবে দাঁড়াইল এই যে, সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়—এই তিন প্রকার দৃষ্টি স্থূল দৃষ্টি মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগের মধ্যে কোন ভেদ নাই। একই ক্রিয়াপ্রবাহ চলিয়া যাইতেছে—তাহার বিরাম নাই—এবং তাহার আদি বা অন্ত আছে কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। এই জন্যই উহার নাম জগৎ। ক্রিয়া মাত্রই গমন বা স্পন্দন। জগৎও ক্রিয়াময় স্পন্দনময় পরিবর্ত্তনময়। "ইহা যাইবে—থাকিবে না" এমন অর্থে ইহাকে জগৎ বলা হয় নাই।

সন্তানোৎপত্তি।

মহাযোগী শ্রীমহাদেব প্রথমে কামকে জয় করেন, তাহার পরে পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য যে জীবজন্তুগণের কাম পরিতৃপ্তি দ্বারা স্ব স্ব সুখ সাধনোদ্দেশে হয় নাই ইহাই এই কথার তাৎপর্য্য। ফলতঃ কেবলমাত্র কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত স্ত্রী-সংসর্গ করা দোষ। এই জন্যই শাস্ত্রে পর্ব্বাহাদিতে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছে

এবং এক্ষণকার লোকে শাস্ত্রীয় বিধি সকল অমান্য করাতে উত্তরোত্তর জাতীয় অপকর্ষ সাধন হইতেছে এবং লোকে নানাপ্রকার ক্লেশে পতিত হইতেছে। ধন্য য়িহুদী জাতি। উহারা এ সকল বিষয়ে আপনাদিগের আচার পদ্ধতি রক্ষা করিয়াই এত বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া অদ্যাপি আপনাদিগের জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে অপর সকল জাতি অপেক্ষা অকাল মৃত্যু অল্প, শরীরের এবং মনের শক্তি অধিক, এবং আয়ুষ্মত্তা দীর্ঘতর।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

আর্য্য পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে ঈশ্বরের স্বরূপতা কিরূপ উপলব্ধ করিয়াছিলেন, তাহা দুইটী বৈদিক মহাবাক্যে স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে। তাহার একটি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মং'—অপরটি 'তত্ত্বমসি'। এই দুইটি মহাবাক্য হইতে যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহা যে কেবলমাত্র আর্য্য-পণ্ডিতদিগের হৃদয়েই সমুদিত হইয়াছিল, অপর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই এমত নহে। সকল জাতির ভাষাতেই ঈশ্বরের একটী নামার্থ "সর্ব্ব"। 'আল্লা' নামটী মহম্মদের স্বকপোল কল্পিত নহে। উহা আরবদেশে পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল এবং 'আকাশ' 'সূর্য্য' এবং 'বলশালী' এই তিনটী অর্থই বুঝাইত। য়িহুদী জাতির মধ্যে 'যেহোভা' নাম প্রসিদ্ধ। তাহার অর্থ 'অহমস্মি' বা 'অস্তীতি মাত্র' বা 'তৎসৎ'। গ্রীকদিগের 'জিউস' শব্দ 'আকাশ' বা 'ব্যাপকত্ব' বোধক। চিনীয়দিগের 'টিয়েন' শব্দ, আকাশ এবং ঈশ্বরবাচক। সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দও ব্যাপকত্ব বুঝায়। খৃষ্ট ধর্ম্ম-প্রচারক সেণ্ট পল্ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরেই আমাদিগের জীবন, গতি এবং সত্তা।' খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা সেণ্ট অগষ্টিনও বলেন "ঈশ্বর এরূপ একটী বৃত্তস্বরূপ যে তাহার কেন্দ্র সর্ব্বস্থলে, পরিধি কোথাও নাই।"

অতএব উল্লিখিত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যের ভাব কোন না কোন সময়ে সকল জাতির মধ্যেই সমুদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে সকলের মধ্যে যে সমভাবে পরিস্ফুট হয় নাই তাহাও

নিঃসন্দেহ। কারণ অপর কোন জাতির মধ্যে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মূল সূত্রের বৃত্তিস্বরূপ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের আবির্ভাব এমন স্পষ্টাভিধানে দেখা যায় না। আর্য্য পণ্ডিতদিগের মধ্যেই 'তত্ত্বমসি' জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব এবং সেই প্রাদুর্ভাবেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের 'হংস' মন্ত্রাভিধান এবং সোহং' জ্ঞানাভ্যাসের উপদেশ, সমুদায় কার্য্যেই পূজাভাবের সন্নিবেশ, সমাধি যোগের অনুষ্ঠান, নিষ্কামতার প্রশংসা এবং মুক্তির নিমিত্ত অভিলাষ।

—**:**—

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও তন্ত্র শাস্ত্র।

(১)

আমাদিগের দেশের চূড়ামণি স্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় হিন্দু ধর্ম্মের উৎকর্ষ এবং সর্ব্বপ্রাধান্য প্রকটনপূর্ব্বক স্বাভিমত ব্যক্ত করায় অনেকানেক স্বল্পবিদ্য, অপরিণামদর্শী, অনুচিকীর্ষা-পরায়ণ ব্যক্তিব্যূহের ভ্রমভঞ্জন এবং মোহান্ধকার তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোৎসব উচ্ছলিত হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত। যে ধর্ম্মপ্রণালী সুদূরদর্শী গাঢ় চিন্তাপরায়ণ, পবিত্রমনা মহর্ষিদিগের দ্বারা সৃষ্ট হইয়া আর্য্যসন্তানগণকে বহুসহস্র বর্ষাবধি পাপস্পর্শ হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছে, যে ধর্ম্ম প্রণালী সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধনের সোপান হইয়া এই বহ্বায়ত ভারতভূমি নিবাসী হিন্দুমাত্রের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একজাতিত্ব ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, যে ধর্ম্মপ্রণালী সুখময়, পবিত্রতাময় হিন্দু গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছে, যে ধর্ম্মপ্রণালী আধ্যাত্মিক চিন্তার চরম উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে সংসাধিত করিয়াছে, যে ধর্ম্মপ্রণালী হিন্দুজাতীয়দিগকে পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা অস্বার্থপর ঈশ্বরপরায়ণ এবং পারলৌকিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে, সেই ধর্ম্মপ্রণালীর গুণগরিমা গীয়মান হইলে কাহার অন্তঃকরণে তৃপ্তি বোধ না হয়? আমি রাজনারায়ণ বাবুকে সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম, এবং তাঁহার সহিত অভিন্নহৃদয় হইতে অভিলাষী হইলাম।

রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মমতাবলম্বী, আমি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মানুবর্ত্তী, কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু আর হিন্দুধর্ম্মের দ্বেষ করেন না, এবং যিনি পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ না করেন, তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জ্ঞানপন্থাবলম্বী হইয়াছেন, এবং যথাকালে মুক্তিভাক্ হইতে পারেন। যে ধর্ম্ম প্রণালীর মূলে ইহলৌকিক সমৃদ্ধিকামনা নিহিত থাকে, যে ধর্ম্মপ্রণালী বিজিগীষা হইতে সমুদ্ভূত হয়, সেই ধর্ম্মপ্রণালীই পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ শিখাইয়া দেয়। আর্য্যধর্ম্ম সেরূপ মূল হইতে জন্মে নাই। একান্ত অস্বার্থপর হিন্দু মানসক্ষেত্রে, জ্ঞানবীজ হইতে, ভক্তিবারি সিঞ্চনে, এই কল্পবৃক্ষ জন্মিয়াছে, ইহার শাখাপল্লব বিটপাদি সামাজিক শুভ নিয়ম সমস্ত, ইহার পুষ্প পবিত্রতা, ইহার ফল শান্তি।

আমি কখনই ব্রাহ্ম মতাবলম্বীদিগের প্রতি বিরক্ত হই নাই। ব্রাহ্মদিগের জন্মিবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মেরা জন্মিয়াছেন, আমার চিরকালই এই বোধ আছে। ব্রাহ্মদিগের বিষয় যখন ভাবিয়াছি, তখনই পৌরাণিক বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ সংবাদ আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় এবং রিপুদমনশীল বশিষ্ঠ মহর্ষির একটি কামধেনু ছিল। রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় সন্তান বিশ্বামিত্র রাজা সেই কামধেনুকে বলে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বয়ং কিছুই করিলেন না, কিন্তু নন্দিনী (ঐ কামধেনু) আপন শৃঙ্গ ক্ষুর পুচ্ছাদি হইতে যুদ্ধপরায়ণ বিবিধ ম্লেচ্ছজাতীয়ের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহারা বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করিয়া কামধেনুকে উদ্ধার করিয়া দিল। আমার মনে নিরীহ হিন্দু জাতিই বশিষ্ঠ, কামধেনু হিন্দুধর্ম্ম, বিশ্বামিত্র প্রবল প্রতাপ রাজধর্ম্ম, এবং কামধেনুর শরীর নিঃসৃত ম্লেচ্ছগণ ব্রাহ্ম মতাবলম্বী আধুনিক যুবকবৃন্দ। ব্রাহ্মদিগের রূপ ধারণ করিয়াই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আপন প্রভাব প্রকাশ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মকে সুদূরপরাহত করিলেন। কামধেনুপ্রসূত বিদ্বেষ বিবর্জ্জিত ঐ ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক।

এতক্ষণ মনের কথা বলিলাম। এক্ষণে একটি কাজের কথা বলিব।

রাজনারায়ণ বাবু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের স্বরূপপ্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তন্ত্রশাস্ত্রেরও সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তিনি ভালই করিয়াছিলেন।

কিন্তু কয়েকজন নিতান্ত অল্পজ্ঞ অসার ব্যক্তির প্রলাপ বাক্যকে প্রামাণিক বাক্য মনে করিয়া ডাক্তার মরে মিচেল সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিরাও ঐ জন্য রাজনারায়ণ বাবুর দোষ ধরিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবু যে আত্মপক্ষ সমর্থনে অশক্ত তাহা নহে। তিনি স্বয়ংই ঐ সকল প্রতিবাদ খণ্ডনে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। তথাপি আমি তন্ত্র শাস্ত্রের বাস্তবিক প্রকৃতি কিরূপ, তাহা কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। রাজনারায়ণ মহারথীর অনুবর্ত্তী সামান্য পদাতি হওয়াও গৌরবের বিষয়।

ধর্ম্মপ্রণালী মাত্রেই ত্রিধা হইয়া থাকে। প্রথম আভ্যন্তরিক, অপর গার্হ, তৃতীয় সামাজিক। ইংরাজদিগের প্রণালী দেখ, তাঁহারা শয়নকালে এবং শয্যা হইতে উঠিবার সময়ে এক একবার ঈশ্বরোপাসনা করেন। ঐ সময়ে অপর কেহ তাঁহাদিগের নির্জ্জন আভ্যন্তরিক উপাসনার সহযোগী হয়েন না। ঐ উপাসনা উপাস্য এবং উপাসকের পরস্পর সাক্ষাৎসম্বন্ধ পরিচায়ক। তাঁহারা ভোজন করিতে বসিবার পূর্ব্বক্ষণেও ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। ঐ উপাসনায় তাঁহাদের পরিবারবর্গের সাহচর্য্য হয়। ইহা গার্হ। তাঁহারা গির্জ্জা ঘরে গিয়া প্রতি রবিবারে উপাসনা করেন। এইটি সামাজিক। হিন্দু প্রণালীতেও উপাসনা ঐ প্রকারে ত্রিবিধ—যথা ইষ্টদেবতার পূজাদি। ইহা আভ্যন্তরিক। শালগ্রাম শিলা, বিগ্রহ এবং শিবাদির পূজা। ইহা গার্হ। দোল দুর্গোৎসবাদি উৎসব কার্য্য। ইহা সামাজিক।

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পূজাবিধি ঐ প্রণালী ত্রিতয়ের এক ভাগ অর্থাৎ প্রথম ভাগকেই বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করে। অপর দুই ভাগের প্রতি ইহার স্পষ্ট দৃষ্টি নাই। কেন নাই এবং যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা সেইরূপ আছে কেন, তদ্বিষয়ে অধিক বলিব না। হিন্দুরা অপর ধর্ম্মাবলম্বিদিগের অধীন হইলে পর তন্ত্রশাস্ত্র প্রকটিত হয়, এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

সম্প্রতি বিচার করিয়া দেখ, আভ্যন্তরিক উপাসনার প্রকৃত মূল কি হইতে পারে? আত্মার সম্যক্ এবং সমগ্র উন্নতির সাধনই এই উপাসনার যথার্থ উদ্দেশ্য। আত্মোন্নতি কিরূপে হইবে? আত্মার

সর্ব্বপ্রধান শক্তির উত্তেজনা দ্বারা। আত্মার সর্ব্বপ্রধান শক্তি কি? ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি থাকাতেই মনুষ্যকে স্বাধীন জীব, সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তার ছায়া স্বরূপ এবং সেই প্রোজ্জ্বল পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ বলিয়া অনুভব হয়। অতএব ইচ্ছাশক্তির সম্বর্দ্ধন তান্ত্রিক উপাসনার উদ্দেশ্য। ইচ্ছা-শক্তির খর্ব্বতা কি কি হেতুতে জন্মে? কতক শরীরের দোষে, কতক মনের দোষে। শরীরের দোষ নিবারণ তন্ত্রোক্ত যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, মনের দোষ সংশোধন তন্ত্রোক্ত সাধনাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম, যোগ, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ শরীর সংস্কারের উপায়। (১) শব, চিতা, পঞ্চমুণ্ডী, কমলাসন প্রভৃতি সাধন, ভয় বিশেষতঃ মৃত্যুভয় জয় করিবার উপায়, (২) লতা সাধনাদি ব্যাপার কামজয়ের উপায় (৩) কুটীচর ধর্ম্ম পালনাদি লোভ এবং ক্রোধজয়ের পন্থা (৪) মানস পূজা এবং ধ্যান ধারণাদি মনের একাগ্রতা এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিবর্দ্ধক।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতি এই। যে শাস্ত্রের প্রকৃতি এরূপ সে শাস্ত্র যে মদ্যপান এবং পরস্ত্রীগমন শিক্ষা দিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। তবে একটি কথা আছে, সেইটি ভাল করিয়া বুঝিয়া হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে কথা এই—

আমাদিগের শাস্ত্রকারিগণের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, গুরূপদেশ নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহারা সাধারণের বোধগম্য করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণালী ব্যাখ্যা করিতেন না। দ্ব্যর্থ অথবা গূঢ়ার্থ কিম্বা বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদক শব্দের ব্যবহার তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিতেন। তাঁহা-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ত কেবল কথার কথা ছিল না। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে একটি শিক্ষণীয় প্রকৃত বিদ্যা করিয়া তুলিয়া ছিলেন। এই জন্য যেমন ঘড়ি গড়া, জুতা গড়া, ছুতারের কাজ, স্থপতির কাজ গুরূপদেশসাপেক্ষ, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানও তেমনি গুরূপদেশ সাপেক্ষ।

(২)

আমি পূর্ব্বপত্রে তন্ত্রশাস্ত্রের বাস্তবিক প্রকৃতি কিরূপ, তাহার স্থূল স্থূল বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি তদ্বিষয়ে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তন্ত্রের সংস্কৃত কালিদাসের সংস্কৃত অপেক্ষাও ললিত এবং সম্মার্জ্জিত এবং

তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় প্রকৃতি এরূপ যে, পরকীয় অধিকারের প্রভাব দেশের উপর পতিত না হইলে সেরূপ হইতে পারিত না। যেমন কোন উদ্ভিদের পত্রের বর্ণ দেখিয়াই বলা যায় যে, সেটি রৌদ্রাতপে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, ছায়াতলে জন্মিয়াছে, সেইরূপ সাহিত্যাদি শাস্ত্রের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকটন সময়ে সমাজ স্বাধীন কি পরাধীন ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকটিত হয়। এ বিষয়েও সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই। তন্ত্রের সংস্কৃত জয়দেব গোস্বামীর সংস্কৃতের গৌড়গন্ধে গন্ধিত,তন্ত্রের উপমালঙ্কারাদি বঙ্গদেশের প্রকৃতির সহিত বিশিষ্টরূপেই মিলে,এবং তন্ত্রে যে অক্ষরমালার নির্দ্দেশ আছে,তাহা বাঙ্গালা অক্ষর কিন্তু যাঁহারা ভারতবর্ষের নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, তন্ত্রশাস্ত্র এখনও বঙ্গপ্রদেশের বহিঃস্থ অনেকানেক স্থানে বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়া থাকে। আমি ত্রিহুতে, আগ্রায় এবং কাশ্মীররাজের অধিকারে তান্ত্রিক দীক্ষা হইয়া থাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এবং বুন্দেলখণ্ডে ও ত্রৈলঙ্গের কোন কোন স্থানে এখনও তান্ত্রিক দীক্ষার প্রচলন আছে, তাহাও প্রামাণিক লোকমুখে শুনিয়াছি। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি এবং প্রচার সম্বন্ধে ৺রাজা রামমোহন রায়ের প্রমুখাৎ যে শ্লোকটি কেহ কেহ শুনিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না।

"গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা মৈথিলীপ্রবলীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, তন্ত্রশাস্ত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরাধীনাবস্থায় এই বঙ্গদেশে স্বতঃ সমুদ্ভূত হয়, এবং স্বতঃই ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া পড়ে। এ শাস্ত্র কি বঙ্গবাসীদিগের অশ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত? এ শাস্ত্র কি তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্তই অযোগ্য হইতে পারে? এ শাস্ত্রের কি কোন ভাগে এমন কিছু থাকা সম্ভব নয় যাহা জানিতে পারিলেএবং জানিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের বিশিষ্ট উপকার দর্শে? বুদ্ধিমানেরা আপনাপন মনো-

মধ্যে উল্লিখিত প্রশ্ন কয়েকটির সদুত্তর প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন। তাঁহারা ইংরাজীভাষা শিখিয়া যত সাহিত্য এবং যত পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন তৎসমুদয়ের"অর্থ"পর্য্যালোচনা করুন। অনর্গল বাক্যপ্রয়োগের অপেক্ষা প্রকৃত অনুষ্ঠানের কত সমধিক মাহাত্ম্য তাহা অনুধাবন-করুন। তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই। অনেক বাকী আছে—সারভাগই বাকী আছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝুন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম, মুসলমান অধিরাজদিগের একচ্ছত্র রাজ্যকালে সমুৎপন্ন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মও রোমীয় সম্রাটদিগের সাম্রাজ্যসময়ে সমুৎপন্ন, এই জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের সমপ্রকৃতিক, এবং খৃষ্টধর্ম্মের সমপ্রকৃতিক বলিয়া ঐ ধর্ম্ম নবীন ব্রাহ্মদিগের নিকট সমাদৃত এবং তৎকর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে অনুকৃত হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের অবস্থা যেরূপ, আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে যে ধর্ম্ম আমাদিগকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এবং রিপুদমন শিখাইয়া আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে তেজস্বিনী করিয়া তুলিবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে বাক্‌বিতণ্ডা পরিহারপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন অভ্যাস করাইবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে পরপ্রত্যাশারূপ পিশাচীর হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া স্বাবলম্বনের পরাকাষ্ঠায় উন্নত করিবে, যে ধর্ম্ম আমাদিগকে শুদ্ধ অনুষ্ঠানে শুভময় ফল গ্রহণে লোলুপ করিবে,যে ধর্ম্ম আমাদিগের আলস্য এবং জড়তার অপনয়ন করিয়া সাধনমাহাত্ম্য আমাদিগের চক্ষে জাজ্বল্যমান করিয়া দিবে, সেই ধর্ম্ম আমাদিগের প্রকৃত অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবে। কলিতে নিগমই বেদ, শিবের উক্তি এই। প্রস্তাব দীর্ঘ হইল, তথাপি শিবভগবতীর একটি কালোচিত স্তব পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। স্তবটি আমি এখন নিজে গড়িলাম না, যেন কোথাও পূর্ব্বে দেখিয়াছি, স্মরণ হইতেছে।

"হে দেশহিতেচ্ছা দেবি! দুর্গতি বিনাশিনি! দনুজদলনি! তোমার সাধকেরা কি কঠোর তপস্যাই করিয়াছেন:—ঐ দেখিতেছি একটি যুবা পুরুষ জ্বলন্ত অনল মধ্যে আপন বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহাই হোমীয় করিতেছেন! ঐ একটি স্ত্রীলোক আপন দন্তবিচ্ছিন্ন রুধিরাক্ত জিহ্বাগ্রকে দেবীর চরণতলে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন! আবার ঐ একজন

গম্ভীরদর্শন মধ্যবয়স্ক পুরুষ আপন প্রিয়তম পুত্রদিগকে দেবীর সমক্ষে বলি প্রদান করিতেছেন।

হে ধর্ম্ম সংস্কার! হে দেবাদিদেব! তোমার আরাধনাও সামান্য কঠিন কার্য্য নয়! কোন্ ব্যক্তি তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সংসার সুখ কামনা পরিহার না করিয়াছেন? তোমার কোন্ সেবক কলঙ্কাভিলিপ্ত সমাজ বহিষ্কৃত এবং রাজনিগ্রহে নিগৃহীত না হইয়াছেন? ঐ দেখিতেছি একজন রাজবংশসম্ভূত মহানুভাব নিজ সদয় হৃদয় দর্শিত অহিংসা ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ পৈত্রিক রাজ্য সম্পদ তুচ্ছ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন! ঐ আর একটি মনুজদেব পৃথিবীর পাপভার স্বয়ং বহন করতঃ চৌরবৎ দণ্ডিত হইয়াও ঐশী দয়ালুতার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন!"

আরও কেমন করিয়া বলিব? তন্ত্র শাস্ত্র গুহ্য প্রকরণ। 'ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।' "গুহ্য? তবেই মন্দ, যা ভাল তাত গোপন করিতে হয় না।" বটে রে, পুঁটে ছেলে! তুই গোপনের ফল কি বুঝিবি? তুই ইংরাজীতে বক্তৃতা কর, গ্যাড্ ম্যাড্ ফিস্ ফাস্ কর্, সাহেবেরা তোর মাথায় হাত বুলাবেন, যদি চাহিস্ ত বড় চাকুরিও দিবেন, ইংরাজী কাগজে তোর নামটাও উঠিবে।

কলিতে অর্থাৎ পাপেতে মনুষ্য বামন হয় অর্থাৎ খর্ব্ববুদ্ধি হয়।

(৩)

রাজনারায়ণ বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ওয়ালা। বোধ হয়, এখনকার যে সকল পুঁটে ছেলেরা বড়ই ইংরাজীর গোঁড়ামী করে, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাদিগের সকলকেই দশ বৎসর ধরিয়া ইংরাজী পড়াইতে পারেন।

যখন সেই রাজনারায়ণ বাবুই হিন্দু ধর্ম্ম এবং তন্ত্র শাস্ত্রের প্রশংসা করিয়াছেন, তখন আমি বুঝিতেছি যে, ইংরাজী বিদ্যায় এমন কিছু নাই যাহাতে স্বধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষকরাকে নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী করিয়া দেয়। এইরূপ বুঝিয়া আমার বড়ই সুখ হইতেছে। যখন রাজা ইংরাজ তখন রাজবিদ্যা ইংরাজী শিখিতেই হইবে, আর ইংরাজী শিখিলেই যদি

স্বধর্ম্মবিদ্বেষ্টী হইতে হয়, তবে সকলেই ক্রমে স্বধর্ম্মবিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিবে। যখন যখন এইরূপ ভাবিতাম তখনই চক্ষুতে জল আসিত, প্রাণ বিকল হইত, শীঘ্র মৃত্যু হয় প্রায় এমন, ইচ্ছাও করিতাম। কিন্তু আজি কালি একটু আশ্বস্ত হইয়াছি, আর মনে মনে করিতেছি, শিবের উক্তি কি মিথ্যা হবে—দুদিন পরে হউক, দশদিন পরে হউক তন্ত্রশাস্ত্রের সমাদর বাড়িবে, ইংরাজী ভক্তির যে প্রবল স্রোতঃ বহিতেছে তাহার মোহানায় চর পড়িবে—আবার নিজের ধর্ম্ম নিজের দেশ ভাল লাগিবে। আহা! এমন দিন কি হবে? শবসাধন সিদ্ধ হবে? মরা আবার বাঁচিবে? মহানিশা ত উপস্থিত। কৈ সে সাধক মহাপুরুষ কৈ?

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতি কিরূপ, ঐ শাস্ত্র কেমন সময়ে প্রকট হইয়াছিল, এবং আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে ঐ শাস্ত্রের কেমন উপযোগিতা অনুভব হয়, তাহা পূর্ব্ব দুই পত্রে বলিয়াছি। এক্ষণে তন্ত্র শাস্ত্রের আর একটি অপূর্ব্ব ভাবের উল্লেখ করিব।

ভারতবর্ষবাসী আর্য্য সন্তানদিগের সকল দুর্ভাগ্যের মূল কি? গৃহবিচ্ছেদ—অনৈক্য! সেই গৃহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ সাম্প্রদায়িক মতভেদ। এই কথাটি মনে রাখিয়া তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তন্ত্রের একটি প্রকৃত গুণ উপলব্ধ হইবে।

পুরাণ পাঠ কর দেখিতে পাইবে, পদে পদে সাম্প্রদায়িক মতভেদ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবদিগের পুরাণই ভিন্ন ভিন্ন। স্কন্দ পুরাণে শিবই সর্ব্বেসর্ব্বা; কালিকাপুরাণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদ্যা ভগবতীর অপত্য বৈ নয়, পদ্মপুরাণে বিষ্ণুই পরমেশ, ব্রহ্মা এবং শিব তাঁহার বিভূতি এবং ভগবতী তাঁহারই যোগমায়া অথবা বিদ্যাশক্তি; ফলতঃ পুরাণের সময়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বড়ই প্রভাব। শুদ্ধ মতভেদের প্রভাব নয়—মুখোমুখিও যেমন, হাতাহাতিও তেমনি। শিবরামের যুদ্ধ, বাণরাজা এবং কৃষ্ণের যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপার সমস্ত বিলক্ষণ রক্তারক্তি ব্যাপার, তাহার সংশয় নাই।

যে ধর্ম্ম প্রণালীর মধ্যে ওরূপ সাম্প্রদায়িক মতভেদ জন্মে, তাহারই

একটি প্রবল শত্রু জন্মিয়া থাকে। যখন ঘরাও ঝগড়া তখনই বাহিরের শত্রুর উপদ্রব। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়দিগের পরস্পর অনৈক্যের যখন বড়ই প্রাদুর্ভাব, সেই সময়ে মহম্মদীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি; প্রোটেষ্টান্টদিগের পরস্পর মতভেদের সময় জেসুইটদিগের উদয়, সুন্নি সিয়ার বিবাদ কালে সুফিদিগের জন্ম, এবং পঞ্চোপাসকদিগের পরস্পর বিসংবাদকালে বুদ্ধদেবের অবতার। আমার বোধ হয় পঞ্চোপাসকেরা যে সময়ে বিবাদ করিতেছিলেন সেই সময়ে বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রাবল্যে ভয়যুক্ত হইয়াই হিন্দু পঞ্চোপাসকেরা কিয়ৎ পরিমাণে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এবং সেই সম্মিলনের ফলে ষড়্দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং গুপ্ত তান্ত্রিক সাধনাও "আরম্ভ" হয়।

যাহা হউক, পঞ্চোপাসকেরা একবার পরস্পর বিবাদ পরিহার পূর্ব্বক মিলিলেন। যিনি রাম তিনিই শিব, যিনি ব্রহ্মা তিনিই গণেশ, যিনি লক্ষ্মী তিনিই গৌরী এইরূপ অভেদ জ্ঞানের কথা সকল শাস্ত্রে প্রচারিত হইল, বিবাদ মিটিল, নূতন ক্ষত্রিয়কুলের সৃষ্টি হইল, বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার চলিল, যুদ্ধও চলিল, বৌদ্ধেরা হারিল, নির্ব্বাসিত হইয়া গেল।

পঞ্চোপাসকদিগের জয়, জয়ের পরেই জয়োল্লাস, আবার গৃহবিচ্ছেদ। উপপুরাণ কয়েকটি এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ ঐ বিবাদের পরিচায়ক। রাজাদিগের মধ্যেও বিবাদ। কাশী এবং কালঞ্জরে জয়চন্দ্র এবং পৃথ্বীরাওয়ে যে সকল যুদ্ধের কথা শুনা যায় তাহা ঐ অন্তর্বিচ্ছেদের দুই একটি শেষ শিখা মাত্র। অন্তর্ব্বিচ্ছেদে ও ভ্রষ্টাচারে তেজ হ্রাস হইল। মুসলমান আসিল, সকল আগুনই একেবারে নিবিল। স্বাধীনতা গেল, সাম্প্রদায়িক মতভেদের বিচার থামিল। আবার সম্মিলনের চেষ্টা। সেই চেষ্টার ফল তন্ত্রশাস্ত্রের পুনর্ব্বার চর্চ্চা। *

তন্ত্রশাস্ত্রে ভেদজ্ঞানের বড়ই নিন্দা। কালী কৃষ্ণে, তারা রামে, বিষ্ণু

* বারভূঞাদের সময়ে কিয়ৎপরিমাণে তান্ত্রিক বীরাচারী প্রকৃত বীরপুরুষদিগের আবির্ভাব বাঙ্গালীর মধ্যেই হইয়াছিল। তান্ত্রিক শিক্ষায় তখন এই বাঙ্গালীকে কি করিয়াই তুলিয়াছিল।

শিবে ভেদ জ্ঞান করিলেই নিশ্চয় অধোগতি। রূপভেদ, নামভেদ, মন্ত্রভেদ কিছুই নয়—ওগুলি কেবল উপাসকেরই সুবিধার নিমিত্ত।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

তন্ত্রশাস্ত্র সমাজের পরাধীনতার সময়ে সমুৎপন্ন। পরাধীনতা দেশবাসীদিগের তেজস্বিতা থাকিতে সংঘটিত হয় না। অতএব তান্ত্রিক দীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য লোক সকলকে তেজস্বী করা। পরাধীন জাতির মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিবার যো থাকে না। মুখ ফুটিয়া বলিতে চাও বিজেতাদিগের মনের মত যাহা হয় বল, তাহাদিগের মনের মত যাহা না বলিবে তাহাতেই তাঁহারা রুষ্ট হইবেন। তন্ত্রশাস্ত্র বাহিরের চেঁচাচেঁচির মধ্যে না গিয়া, মনঃস্থির করিতে, গোপন সাধন করিতে শিক্ষা দেয়—হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান বাহির করে না। তন্ত্রশাস্ত্র একপ্রকার ফ্রিমেশনরি। বড় বড় অনেক সাহেব ফ্রিমেশন আছেন। তাঁহারা কি মন্দ লোক? কোন সময়ে ফ্রিমেশনরি দ্বারা পৃথিবীর কি অনেক উপকার হয় নাই? এখনও যে কি হইতেছে কি না হইতেছে কে বলিতে পারে? অতএব তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি বৃথা কটূক্তি করিও না। তন্ত্রশাস্ত্র বই আর কোন শাস্ত্র শবসাধন শিখাইতে পারে না, মরাকে বাঁচাইতে পারে না।

বঙ্গ সমাজের বিবরণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিহার প্রদেশেই অতি প্রবল হইয়াছিল। বিহার বাঙ্গালার সন্নিহিত দেশ। অতএব বাঙ্গালাতেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৌদ্ধের প্রাদুর্ভাবে বেদ-বিদ্যার লোপ হইয়া যায়। কথিত আছে, গৌড়-রাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে "বেদবিদ্যাপারগ ব্রাহ্মণ" আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন।

আমি কান্যকুব্জ নগরেও এই বঙ্গকিম্বদন্তীর অনুরূপ কথা শুনিয়াছি এবং ঐ নগর হইতে অনধিক দূরে মিনেসরাই নামক

গ্রামে গিয়া দেখিয়াছি, সেখানকার ব্রাহ্মণেরা ভরদ্বাজ গোত্র এবং শ্রীহর্ষের সন্তান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। বঙ্গকিম্বদন্তীর সহিত কান্যকুব্জ কিম্বদন্তীর বিশেষ এই, কনোজিয়ারা বলেন যে, রাজ-সভায় ছয় জন প্রধান পণ্ডিত এবং কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার মধ্যে পাঁচ জন সসন্তান আর একজনের কোন সন্তান হয় নাই। যিনি নিরপত্য ছিলেন রাজা তাঁহাকে পাঠাইলেন না, অপর পাঁচ জনকে, তাঁহাদের সন্তানগুলিকে দেশে রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, বঙ্গদেশে যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হইয়া আছে, সে প্রথাটী বঙ্গ দেশেই জন্মে নাই। ইহার মূল কান্যকুব্জেই ছিল এবং অদ্যাপি আছে। রাজা বল্লাল সেন এই কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। তবে বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মেল বন্ধন রাজা বল্লাল সেনের সময়েই হইয়াছিল, একথা সত্য।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গালায় আইসেন,তাহার মধ্যে যিনি শ্রীহর্ষ নামধারী তিনিই সুপ্রসিদ্ধ নৈষধচরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রণেতা। যদি তাহা হয় (না হইবার কোন কারণই দেখা যায় না) তবে উহাঁদিগের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের যথেষ্ট প্রাবল্য হইয়াছিল বলিতে হয়। নৈষধে তান্ত্রিক শাস্ত্রানুমোদিত মন্ত্রগ্রহণের বিশিষ্ট ফলই কথিত আছে। শ্রীহর্ষ স্বয়ংই তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া আপনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "সেই চিন্তামণি মন্ত্র (ত্রিপুরা সুন্দরীর ত্র্যক্ষরী মন্ত্র) চিন্তন কালেই আমি এই কাব্য প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছি।"

তখন হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সমাজপতি ছিলেন। তখন শুদ্ধ নৈষধ বলিয়া নয়, বেণীসংহার, কাদম্বরী প্রভৃতি কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল বিরচিত হইতেছিল। তখন বংশমর্য্যাদানুসারিণী কুলপ্রথাকে তাহার গুণ বর্ণনার দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত। অমুকের সন্তান অতএব কুলীন শুদ্ধ একথা বলিতে হইত না। অমুকের সন্তান অতএব এই এই নবলক্ষণযুক্ত, অতএব কুলীন এরূপ বলা যাইতে পারিত। যেখানে বংশমর্য্যাদার গৌরব গুণগৌরবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে সে বড় ভাগ্যবান

দেশ। বঙ্গদেশ কিছুকাল এইরূপ ভ
ঐ সময়ে বাঙ্গালার রাজগণ সমুদায় গৌড়
বিস্তার করিয়াছিলেন। তখন এই বাঙ্গা
সাহসিক বীর পুরুষদিগের অভাব ছিল না; যে
তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত বীরাচার প্রবল ছিল।

তন্ত্রের ভ্রষ্টাচার প্রবল হইয়া সে অবস্থা গেল। বঙ্গদে
অধীন হইল। শাস্ত্রের লোপ হইল, আচার দূষিত হইল।
মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তান্ত্রিকাচারের দোষ ঘোষণ
কুতর্কের মস্তক ভগ্ন করিলেন। বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির সংবাদ প্র
করিলেন; তাঁহার প্রেমময় সাম্যবাদ আবার সমুদায় দেশটীকে উত্তেজ
করিয়া তুলিল। দেশ প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা গৌরবযুক্ত হইল; উহাতেও গ্রন্থাদি প্রণীত হইতে লাগিল আর সংস্কৃতে অতি রমণীয় কাব্য নাটক স্মৃত্যাদি প্রণীত হইল। তীর্থযাত্রা, কীর্ত্তন, মহোৎসব প্রভৃতির দ্বারা বৈষ্ণবদল দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও যেমন রামানুজ স্বামিকর্ত্তৃক বৈষ্ণবাচারের প্রচার আরম্ভ হইবামাত্র প্রাচীন আর্য্যদিগের আচার প্রণালী স্মার্ত্তাচার নামে অভ্যুত্থিত হইয়াছে, বাঙ্গালাতেও তাহাই হইল। মহাপ্রভু যে সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হয়েন, রঘুরাম শিরোমণিও সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইলেন। শিরোমণি সমুদায় পুরাণ এবং স্মৃতি হইতে অষ্টাদশ আচার কাণ্ড প্রস্তুত করিলেন এবং বঙ্গদেশে সেই পূর্ব্বাচরিত আচার সকল যাহা বৌদ্ধের প্রভাবে এবং তন্ত্রের প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল সেগুলিকে পুনর্ব্বার জাগরিত করিয়া তুলিলেন। সেই অবধি স্মার্ত্তাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে এবং বৈষ্ণবাচারী বৈষ্ণবে পরস্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল এবং উহাদিগের পরস্পরের প্রতিযোগিতায় দিন দিন আচারের আঁটাআঁটি বাড়িতে আরম্ভ হইল।

ইংরাজদিগের প্রথম আগমনের সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গ দেশে সমাজের পতি ছিলেন। তিনি স্মার্ত্তাচারের পক্ষ হইয়া বৈষ্ণবাচারকে

...স্ত দ্বারা এবং দুই একটী নূতন
মতের পোষণ করিলেন।

বঙ্গদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদকে সম্মি-
...কৌশলই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি
গ্রহণ করেন, তান্ত্রিক আচারও স্বীকার করিয়া-
...এক চরম মতবাদও অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি
...সে, উহাই দেশের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তন্ত্রের
...বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিদ্বেষ দেখিয়া তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের
...খ করেন নাই। বেদান্ত দর্শন এবং উপনিষদের সহিত
...ক্য অভিন্ন দেখিয়া তাহাদেরই দোহাই দিয়া সকল কথা কহি-
লেন। যদি তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মেরা তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ এবং সুদূরদর্শী হইতেন, আর জাতীয়ভাব সংরক্ষণের প্রকৃত উপায় সকল বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি যে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে স্খলিতপদ হইতেন না। রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পদ ত্যাগ করিয়া নব্য ব্রাহ্মেরা হতবীর্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাই করুন, ইংরাজী শিক্ষিত ভিন্ন অপর কোন লোকের উপর বড় কিছু করিতে পারিবেন না, অধিকন্তু ক্রমশঃ স্বজাতির সহিত সহানুভূতি শূন্য হইয়া পড়িবেন।

রাজা-রামমোহন রায়ের পর শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাবই প্রধানতঃ উল্লেখ যোগ্য। ইনি অতি সরল ভাষায় হিন্দু মতবাদের শাস্ত্র সম্মত সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন "তাহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার নিজের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া" যদি প্রকৃত তান্ত্রিক সাধনায় বাঙ্গালী ভক্তিপূর্ব্বক রত হয়, তাহা হইলে আবার সমাজ মধ্যে একাগ্রচিত্ত, উদ্যমশীল, নির্ভীক, কর্ম্মঠ ও ধার্ম্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।

রাজা রামমোহন রায় এবং তন্ত্র শাস্ত্র।

(১)

জীবনচরিত পাঠে যে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে, অনেক স্থলেই জীবনচরিত গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণতা দোষে সেই উপকারের ব্যাঘাত হয়। ধর্ম্মসংস্কারকদিগের চরিতাখ্যান এই কথার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ সকল চরিতাখ্যানে প্রায়ই কিছু না কিছু অলৌকিক অদ্ভুত ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। কোন্ বীজ হইতে কিরূপে কোন্ উচ্চ ভাব ঐ সংস্কারকদিগের মানসক্ষেত্রে প্রথমে অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা হয় না, এবং কি কি সুযোগেই বা সেই ভাবের পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল তাহারও কোন প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারা যায় না। অমুক এত অল্প বয়সেই এই তথ্যটী অবগত হইয়াছিলেন এবং ঐ তথ্যের জ্ঞান সমস্ত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সেই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পুরুষকর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া এক্ষণে জাতি সাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে, সকল ধর্ম্মসংস্কারকের জীবনচরিতই এই অদ্ভুত ভাবের ব্যঞ্জক।

বঙ্গদেশের আধুনিক ধর্ম্মসংস্কারক রাজা রামমোহনের চরিতেও কতক পরিমাণে অদ্ভুত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, "রামমোহন তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়সে একেশ্বর মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া আপন পিতার সহিত বিবাদ করিয়া স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কথাটী যে ভাবে লেখা তাহাতে বোধ হয় যেন রামমোহনের মনে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই জ্ঞানটি স্বতঃ উদ্ভূত হইয়াছিল, যেন তাঁহার পিতা রামমোহনের মুখে ঐ কথা শুনিয়া একেবারে তাঁহার প্রতি খড়্গাহস্ত হইয়াছিলেন এবং পিতার তাদৃশ ক্রোধ হওয়াতেই রামমোহনকে দেশান্তরে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ওরূপ কিছুই হয় নাই। একেশ্বরবাদটী এদেশে নূতন মতবাদ নয়, রামমোহনের পিতাও তেমন অজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না। রামমোহন নিজ

পিতার আদেশানুসারে ফারসী পড়িয়া গোঁড়া মৌলবীদিগের স্থানে সাধারণ হিন্দুশ্রাদ্ধাদিকে "পিশাচ পূজা" আখ্যায় নিন্দা করিতে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ৺কাশীধামে গিয়া শাস্ত্রোক্ত পুরশ্চরণও করিয়াছিলেন। তিনি মিশনরী সাজিয়া পরধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

ফলকথা, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, রামমোহন রায় নিজে একটী নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিবেন এরূপ অভিমানে সম্বদ্ধ হয়েন নাই। কয়েক বৎসর গত হইল নগেন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার পুস্তিকায় স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় তন্ত্র শাস্ত্র হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল পত্তন করিয়াছিলেন। রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কার যে আজি কালিকার সংস্কারকদিগের ন্যায় কেবল মত্র অনুকরণ বা স্বেচ্ছাচারমূলক নহে, তাঁহার নিজের ইচ্ছা এবং কল্পনার উপর তিনি যে নির্ভর করেন নাই তাহা বিশেষ পরিষ্কার করিয়া দেখাইবার জন্য এই পত্রখানি লিখিলাম।

রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই জানিয়াছিলেন যে,

কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ২য় উল্লাস ৯ শ্লোক)

কলিতে আগম উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি অন্যপথপ্রবর্ত্তিত হন, তাঁহার গতি নাই; ইহা সত্য, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।

তিনি ইহাও জানিয়াছিলেন যে, আগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই সকল তন্ত্রের সারাৎসার।

যথা নগেষু হিমবান্ তারকাসু যথাশশী।
ভাস্বান্ তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিদং তথা॥
সন্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১৪ উল্লাস ২০১, ২০৯, ২১০ শ্লোক)

পর্ব্বতের মধ্যে হিমাচল যেরূপ, তারকামণ্ডলীর মধ্যে শশী এবং তেজঃ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য যেরূপ, তন্ত্রসমূহের মধ্যে এই তন্ত্ররাজ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও সেইরূপ। তন্ত্র অনেক এবং শাস্ত্রও অনেক আছে সত্য, কিন্তু কেহই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্যও হইতে পারে না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মাহাত্ম্য তোমায় (শিব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন) আর কি বলিব, এই মহাতন্ত্রে জ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এই সকল সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া রামমোহন মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদীয় বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় মতবাদ সমস্ত জানিতেন, কিন্তু সে সকল জানিয়াও তান্ত্রিক মতবাদ এইদেশে এবং এই কালে স্বতঃ উদ্ভুত সুতরাং উহাই এই দেশের এবং এই কালের উপযোগী হইবে বলিয়া তাঁহার বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

রামমোহন রায় দেখিয়াছিলেন যে, তন্ত্র শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং পবিত্র যথা।—

আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনং।
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করং॥
যেন লোকাঃ ভবিষ্যন্তি মহাবল পরাক্রমাঃ।
শুদ্ধচিত্তা পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করা॥
স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতা গুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্ম বিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ।
সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১ম উল্লাস ৭০, ৭৩ শ্লোক)

যদ্দ্বারা মনুষ্যের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, শুভ অনায়াস লভ্য হইয়া পড়ে, যাহাতে লোকে মহাবল পরাক্রম, শুদ্ধচিত্ত, পরহিতে রত, পিতামাতার প্রিয়কর, স্বপত্নীনিরত, পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ, দেবতা ও গুরুতে ভক্তিসম্পন্ন, পুত্র ও স্বজনগণের পোষক এবং—

ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মচিন্তনে রত হয়, মনুষ্যের লোকযাত্রানির্ব্বাহের এবং পারলৌকিক হিতের নিমিত্ত আপনি তাহাই বলুন।

উল্লিখিত বিষয়গুলিই বঙ্গদেশের প্রয়োজন, অতএব সেই সকল প্রয়োজন সাধনোপযোগী যে ধর্ম্মপ্রণালী রামমোহন রায় তাহাই অবলম্বন করিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত স্তবাদি লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি হইল।

(২)

ঐ তন্ত্রের তৃতীয়োল্লাসে উক্ত পঞ্চরত্ন নামক স্তোত্রটী ব্রাহ্মসভার স্তব বলিয়া এক্ষণে প্রসিদ্ধ।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ প্রদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাং।
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা প্রকাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্তিতত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ।
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

(মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ৩য় উল্লাস ৫৯,৬০)

অর্থাৎ তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি চিৎস্বরূপ, অদ্বৈততত্ত্ব ও মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই একমাত্র জীবের আশ্রয়, তোমার ন্যায় বরণীয় আর কেহ নাই, তুমিই একমাত্র জগতের কারণ, তুমি বিশ্বরূপ, তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি নাশ-কর্ত্তা, তুমি একমাত্র পরমপুরুষ, তুমি নিশ্চল ও কল্পনাশূন্য, তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ, প্রাণিগণের একমাত্র গতি, পবিত্রতা বিধায়কেরও পবিত্রতার সাধন। তুমি মহান্ উচ্চপদস্থগণের (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির) নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, রক্ষকের রক্ষক। হে পরেশ, হে প্রভো, তুমি সর্ব্বরূপ কিন্তু অপ্রকাশী, তুমি অবিনাশী অনির্দ্দেশ্য এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর। হে সত্য, হে অচিন্ত্য, হে অক্ষয়, হে ব্যাপক, হে অব্যক্ততত্ত্ব, হে জগদ্ভাসক চন্দ্র সূর্য্যাদির অধীশ্বর, (অথবা হে জগতের দীপ্তিস্বরূপ, অধীশ), তুমি আমাদিগকে ভক্তি বুদ্ধ্যাদির বিশ্লেষ হইতে রক্ষা কর। সেই একমাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা জপ করি, সেই এক জগৎ সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মকে আমরা প্রণাম করি। সেই তুমি সৎ, একমাত্র জগতের নিধান, স্বয়ং আশ্রয়শূন্য, সেই তুমি ঈশ্বর ভবসমুদ্রের পোতস্বরূপ; আমরা তোমার শরণ লইলাম।

ঐ তৃতীয়োল্লাসের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতেই যে রামমোহনের পূজার প্রণালী সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্ ব্রহ্মসাধনম্ ॥
অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ।

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস ৭৭-৮)

অর্থাৎ পরমব্রহ্মের পূজায় আবাহন বিসর্জ্জন নাই। সকল সময়ে এবং

সকল স্থানে ব্রহ্মসাধন হইতে পারে। স্নাতই হউক বা অস্নাতই হউক, ভুক্তই হউক বা অভুক্তই হউক, নির্ম্মলচিত্ত হইয়া পরমাত্মার পূজা করিবে।

ভক্ষ্য পেয়াদি বিচার সম্বন্ধে যেরূপ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাও শাস্ত্রীয় প্রমাণ পরিশূন্য নহে। তৃতীয়োল্লাসে লিখিত আছে—

গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ত্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে।
পক্কং বাপি ন পক্কং বা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্।
সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ॥
যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩য় উল্লাস ৮০, ৮১, ৯১)

অর্থাৎ গঙ্গাজলে বা শালগ্রাম শিলাদিতে অর্পিত দ্রব্যের স্পর্শদোষ থাকিতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্মার্পিত দ্রব্যে স্পর্শদোষ হয় না। যে কোন দ্রব্য পক্কই হউক, আর অপক্কই হউক, "ব্রহ্মার্পণ মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মসাৎ" করিয়া সাধক ব্যক্তি স্বজনগণের সহিত তাহা ভক্ষণ করিবেন। নীচজাতীয় লোকের অন্ন যদি ব্রহ্ম সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণও সেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবে।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে রামমোহন রায় যে সকল উপদেশ প্রদান করেন তাহারও মূল ঐ তৃতীয়োল্লাসে যথা—

কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিং
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিজ্ঞস্য স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ॥
কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতেনাপি কিঞ্চিন
নবিঘ্নঃ প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ॥
অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥
মাৎসর্য্যহীনো দম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ॥

ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যান্নপরানিষ্টচিন্তনং
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৩য় উল্লাস ৯৭-১০২)

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহার বৈদিকাচারই বা কি আর তান্ত্রিকাচারই বা কি? তাঁহার স্বেচ্ছাচারই বিধিস্বরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিলেও তাহাতে তাঁহাদের কোন ফল হয় না, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। হে মহেশ্বরি! সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকার নিরত, নির্ব্বিকার, সদাশয় হইয়া এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মাৎসর্য্যহীন, দম্ভরহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধহৃদয়, মাতা পিতার প্রিয়কারী ও তাঁহাদের সেবনে তৎপর হইবেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যশ্রবণ করিবেন, ব্রহ্ম চিন্তা করিবেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিবেন। সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া "ব্রহ্ম সাক্ষাৎ" ইহা ভাবনা করিবেন, কখন মিথ্যা কহিবেন না, পরের অনিষ্ট করিবেন না, বা পরস্ত্রী গমন করিবেন না।

এই সকল প্রমাণ প্রদর্শনের পরিশেষে দুইটী কথা বক্তব্য। একটী কথা এই যে, রামমোহন রায় কোন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই, করিতে চাহেন নাই। দ্বিতীয় কথা, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মেরই অন্তর্নিবিষ্ট। উহাকে একটী নূতন ধর্ম্ম বলিয়া অকারণে উহার প্রকৃত ভাবের অপহ্নব করায় দোষ বই গুণ হইতেছে না। "আমরা তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মপদ্ধতির অনুসরণ করি" ব্রাহ্মগণ একথা স্বীকার করেন না কেন?

তন্ত্রের ত্রুটি না ত্রুটি নয়?

তন্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা যথাযোগ্য গুরুর দ্বারা হইলে শরীরসাধন বুদ্ধিবৃত্তির তেজস্বিতা সম্পাদন এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অসীম বলবত্তা সাধন হয়। পক্ষান্তরে যথাযোগ্য গুরুর অভাবে তন্ত্রের শিক্ষায় বিবিধপ্রকার দোষের সংঘটন

হইয়া থাকে। শরীর বিকৃত, বা পীড়াগ্রস্ত হয়, বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং পরিষ্কৃত না হইয়া অসম্ভব প্রত্যাশায় মুগ্ধ হইয়া বিকৃত হয় এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দৃঢ়তর না হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে ব্যাঘাত জন্মে এবং কার্য্যাকার্য্য বিচার শক্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেকানেক তান্ত্রিককে এক প্রকার উন্মাদ-গ্রস্ত বলিলেও চলে। তাঁহারা মুখে 'ভৈরবোহং' 'শিবোহং' বলেন, অভেদ বুদ্ধির শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং মদ্য পানাদি বিবিধ দোষে বিলিপ্ত হইয়া পিশাচের ন্যায় ব্যবহার করেন।

তন্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞান এবং তদনুযায়ী শিক্ষা ও অভ্যাস না হইবার এই সব ফল। কিন্তু তন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ী শিক্ষা এবং অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেও যেন একটী প্রধান বিষয়ে ত্রুটি থাকিয়া যায় বলিয়া বোধ হইতে পারে।

সহজেই মনে হইতে পারে,—"তন্ত্রশাস্ত্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষলাভের পথ দেখাইয়া দেন, কিন্তু জাতিগত উৎকর্ষলাভের কোন পথ নির্দ্দেশ করেন না। তান্ত্রিক সাধক বীরপুরুষ বুদ্ধিমান পুরুষ এবং ধর্ম্মশীল পুরুষ হইতে পারেন। প্রকৃতরূপে তান্ত্রিক সাধন করিলে মনুষ্যকে অবশ্যই তাদৃশ পুরুষ হইতে হইবে। কিন্তু সমাজের উন্নতির পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র হইতে কোন পাকা উপদেশ পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। তন্ত্র মৌনী হইতে, চিন্তাশীল হইতে, মন্ত্রগুপ্তি করিতে, ইন্দ্রিয় সংযম করিতে শিখাইবেন, কিন্তু বাগ্মী হইতে, অন্যকে আপনার পক্ষে আনিতে, নিজ মন্ত্রে অন্যকে দীক্ষিত করিতে দলবন্ধন করিতে শিখাইবেন না। তন্ত্র সমাজবন্ধন শিথিল করিতে পারিবেন, খাদ্যাখাদ্য বিচারে খুঁটিনাটির বাড়াবাড়ির রহিত করিতে পারিবেন, ধর্ম্মের অনুষ্ঠানভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইতে পারিবেন, অভেদ জ্ঞান বিস্তৃত এবং বদ্ধমূল করিয়া প্রণয়স্রোত বর্দ্ধমান করিতে পারিবেন, কিন্তু জাতীয় ভাব জন্মাইতে পারিবেন না।"

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র যে অপর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা অধুনাতন তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তন্ত্রশাস্ত্র যে বৌদ্ধবাদ প্রবর্ত্তনের অনেক পরবর্ত্তী তাহাও নিঃসন্দেহ। তন্ত্রশাস্ত্র যে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের পরে প্রবল হইয়াছে তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। এমত অবস্থায় সমুদ্ভূত হইয়াও

তন্ত্রশাস্ত্রে জাতীয় ভাবের সুস্পষ্ট সমুদ্রেক দৃষ্ট হয় না কেন? ও ভাবটী ত ভারতবর্ষ দেশের অনুপযোগী ভাব নয়!—ঐ ভাবের যে চিহ্ন সকল আজি কালি দেখা দিতেছে সেগুলি ত শুদ্ধ বিদেশীয় ভাবের অনুকৃতি মাত্র নয়!

সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে তন্ত্রে জাতীয় ভাব উত্তেজনার তেমন কোন চিহ্ন না থাকিলেও উহার অনুযায়ী শিক্ষা অনেকাংশে বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্যই উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। অতএব জাতীয় ভাব বৃদ্ধির নিমিত্ত সাক্ষাৎ কোন চেষ্টা না করিয়া তন্ত্রের প্রদর্শিত পথে বিনা আস্ফালনে এবং বিনা আড়ম্বরে অল্পে অল্পে পাদ সঞ্চারণ করিয়া দেখিলে হয় যে ফল কি হয়। শরীর শক্ত এবং দৃঢ় কর, বুদ্ধি প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান করুক, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবান হইয়া উঠুক। ঢাক বাজান ছাড়, মৌনাবলম্বন শিক্ষা কর, আর তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক "গুরু" স্বীকার করিয়া গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে ভক্তি করিতে এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে আরম্ভ কর। কিছুতেই "গুরু" ত্যাগী না হইয়া দেখ—কি হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

তন্ত্রের কথা।

(১)

গুরু।

তন্ত্রশাস্ত্রে "গুরু" শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। "গ" অক্ষর "সর্ব্বসিদ্ধি", "র" অক্ষর "পাপধ্বংস" এবং "উ" অক্ষর "শিব" বুঝায়। অতএব "গুরু" শব্দের তাৎপর্য্য সিদ্ধিদাতা এবং পাপধ্বংসকারী শিব। তন্ত্রের মতে শিবই প্রকৃত গুরু। শিবের অধিষ্ঠান সর্ব্বত্র। তিনি জগদ্ব্যাপক ও জগন্ময়। পক্ষান্তরে এই নরদেহটীও সমুদয় জগন্মণ্ডলের প্রতিরূপস্বরূপ। সুতরাং নরদেহেও সর্ব্বময় শিবের অধিষ্ঠান। তন্ত্রশাস্ত্রে এই দেহের একটি স্থল শিবের বিশেষরূপে অধিষ্ঠানভূত বলিয়া চিন্তা করিবার আদেশ আছে। স্থানটি দ্বিদল অক্ষিদ্বয়সম্ভূত একটি কল্পিত পদ্ম, অর্থাৎ মস্তিষ্কের পুরোভাগ। বিশিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হইলে ঐ স্থলেরই স্নায়ুমণ্ডল সমধিক পরিচালিত হয়। চিন্তাকারীর সেই ভাগের পেশীগুলিও যে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তাহা সকলেই দেখিতে পায়। তাদৃশ চিন্তা করিতে থাকিলে শিরোদেশের ঐ ভাগের ক্লান্তির অনুভব হয়। অতএব ঐটি যে বুদ্ধিবৃত্তির অধিষ্ঠানস্থল তাহা ভূয়োদর্শন ও অভিনিবেশ দ্বারা সহজেই সকলের অনুভূত হইয়া থাকে। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ব্যবচ্ছেদবিদ্যার প্রয়োগ এবং পরীক্ষাবিধান দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মস্তিষ্কের পুরোভাগের দ্বারাই বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য সমুদয় সাক্ষাৎরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব প্রাচীন আর্য্যপণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের বর্ণনা প্রণালীর অনুসারে মস্তিষ্কের যে অংশটিকে শিবের অধিষ্ঠিত বলিয়াছেন, তাহাই যে নব্যবিজ্ঞান অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যস্থল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অতএব পরমগুরু শিবের যে প্রকার অধিষ্ঠানস্থল

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় যে, পরমগুরুর আশ্রয় গ্রহণ এবং স্বাবলম্বন একই কথা। গুরু সম্বন্ধীয় প্রকৃত তথ্য এই। এই তথ্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকলেরই স্বীকৃত হইয়া আছে। কিন্তু তথ্যের আবিষ্কার বা জ্ঞানলাভ হইলেই কাজ হয় না। মানুষকে কাজ করিতে হয়। এই জন্য কোন তথ্যের আবিষ্কার হইলে তাহা কিরূপে কাজে লাগিবে তাহা বুঝিবার এবং তাহা বুঝিয়া কাজ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠানপ্রণালী জন্মে। অনুষ্ঠানপ্রণালী কতক স্বত উদ্ভূত আর কতক শাস্ত্রের উপদিষ্ট। গুরু সম্বন্ধীয় তথ্যের স্বত উদ্ভূত অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রোপদিষ্ট অনুষ্ঠান যেরূপ যেরূপ হয় তাহার স্থূল স্থূল কথা পরে বলা যাইবে।

---

(২)

সাধন প্রকরণ।

সাধন প্রকরণ অতি বিস্তৃত ব্যাপার। কিন্তু সকল প্রকার সাধনের উদ্দেশ্য রিপু দমন এবং ইচ্ছাবৃত্তির বলবৃদ্ধি। রিপুদিগের মধ্যে ভয়, লোভ, কাম, ক্রোধ অতি প্রবল। উহাদিগের সমক্ষে বুদ্ধি কার্য্যকারিণী হয় না এবং ইচ্ছা অন্তর্বিধ থাকিলেও রিপুদিগের প্রভাববশতঃ কলুষিত হইয়া বিপথগামিনী হয়। কিন্তু যে চারিটী রিপুর উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে ক্রোধ ভয়ের এবং লোভ কামের অঙ্গ। লোভ এবং ক্রোধ ইহারা সাধারণতঃ কার্য্যের উত্তেজক, কার্য্যের নিবারক নহে। ভয়টী কার্য্যের ব্যাঘাতক।

তন্ত্র মতে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি—এই তিনের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি সকলের প্রধান। তন্ত্রশাস্ত্র ক্রিয়ার লোপ করিতে চায় না। এই জন্য কাম, ক্রোধ এবং লোভ জয়ের অপেক্ষা ভয়ের জয়কেই বিশেষরূপে অভ্যস্ত করিতে বলে। 'নিঃশঙ্ক' 'নির্ভীক' 'ভয়হর' এবম্বিধ শব্দ তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বস্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'ভয়' বিনাশের উপায় বীরসাধনের অন্তর্ভুক্ত। বীরসাধন প্রধানতঃ (১) শবসাধন (২) চিতাসাধন (৩) পঞ্চমুণ্ডী সাধন। এই সকল সাধনই মহানিশায়

জনশূন্যস্থানে একাকী মৃতদেহ বা সাক্ষাৎ মৃত্যুসূচক পদার্থসংসৃষ্ট হইয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়। সকল ভয়েরই মূল মৃত্যুভয়। সংসর্গে সকল ভয়েরই লাঘব হয়। বীরসাধনে মৃত্যুর সহিত পুনঃ পুনঃ সম্যক্ সংসর্গ হওয়াতে এই সাধনের দ্বারা মৃত্যুভয় লঘু হইয়া আইসে। বীরসাধনের মূল তাৎপর্য্য এই। পুস্তকে বীরসাধনের অনেক ফলশ্রুতি আছে। কিন্তু গুরূপদেশের অভাবে ঐ সকল অর্থবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য আর বোধগম্য হয় না এবং ব্যাপারটী কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্র হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু তাহা হইলেও আমি স্বচক্ষে বীরসাধনকারী কয়েকজনকে দেখিয়াছি—তাঁহাদিগের মধ্যে একজন উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় ফলশ্রুতি হইতেই ইহাঁর বীরসাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। অপর সকলকেই নির্ভীক নিঃশঙ্কহৃদয় বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাঁরা রাত্রি-কালে একাকী সর্ব্বস্থলে যাইতে পারিতেন; নৌকারোহণে যাইতে যাইতে প্রবল ঝটিকা উঠিলে বিচল-চিত্ত হইতেন না; অতি প্রিয়তম কাহার পীড়া হইলেও হাত পা হারার ন্যায় উদ্বেগে বিহ্বল হইতেন না। এ গুলি তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত বীরসাধনেরই অবশ্যম্ভাবি শুভ ফল বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়া আছে। ঐ সকল ব্যক্তির ক্রোধও তাঁহাদিগের অনায়ত্ত ছিল না, তাঁহারা মনে করিলেই ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারিতেন, তখনই ক্রোধের দমন করিতে পারিতেন। কামজয়ের ব্যবস্থাও তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইহাকে লতাসাধন বলে। লতা-সাধনের প্রকৃত পদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে অনেক প্রকার অযথাচার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গুরুসন্নিধানে উপদেশলাভ করিয়া যাঁহারা এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে সত্য সত্যই কামজয় করিয়া "স্মরহরসমান ক্ষিতিতলে" হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। যেমন মৃত্যুসংসর্গে মৃত্যুভয়ের জয়ের বিধান, তেমনি কামিনীসংসর্গেই কামজয়ের বিধান সৃষ্ট হইয়াছে।

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কয়েকব্যক্তি কোন মহাপীঠে মন্ত্র জপ করিতেছেন, এমত সময়ে একটা পর্ব্বের উপলক্ষে অনেক স্ত্রীলোক সেই

পীঠস্থলে সমাগত হইল। তাহারা স্থানাভাবে ক্রমে ক্রমে ঐ জপকারী-দিগের সমক্ষে তাহাদের শরীরে ঠেস দিয়া বসিল—হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল—কিন্তু তদ্দ্বারা জপকারীদিগের জপের কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল বোধ হইল না। আমার বোধ হইল ইহাঁরা লতাসাধনে সিদ্ধ হইয়া-ছিলেন, এবং সেই জন্যই তাদৃশ বিকারের হেতুসত্ত্বেও ইহাঁদের চিত্তবিকার জন্মে নাই।

---

(৩)

আসন।

"যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং।"

তান্ত্রিকদিগের অনুষ্ঠেয় কোন কার্য্যই পূজার বহির্ভূত নয়। পূজা ভিন্ন তাঁহারা কোন কাজই করেন না। তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে শরীরই অভীষ্ট দেবতার মন্দির। সুতরাং এই মন্দির দৃঢ় শুচি এবং যথাযথ রাখিবার জন্য যে যত্ন করা তাহা পূজারই অঙ্গ। ঠাকুরের ঘর ঝাঁট্ পাট্ দেওয়া, তাহা ধোয়া মাজা, তাহার উচিতরূপ সংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম—না করিলে প্রত্যবায় আছে। 'আসন' এই সকল কার্য্যের মুখভাগ। 'আসন' করা না হইলে সামান্য বাহ্যপূজাতেও অধিকার জন্মে না। স্নানাদি যে সকল অপর আদ্যকৃত্য আছে, তাহার কোন না কোন অনুকল্প হইতে পারে। অর্থাৎ যদি কোন দিন কোন কারণে জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে না পার, মন্ত্রবিশে-ষের দ্বারা কথঞ্চিৎ সে কাজ চলিতে পারে। কিন্তু 'আসন' না করিলে কোনরূপেই চলে না। আসনের পরিবর্ত্তে মন্ত্রাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা নাই।

তন্ত্রশাস্ত্রে যে কি জন্য 'আসনের' কোন অনুকল্প নির্দ্দিষ্ট হয় নাই—তাহা আসনের প্রকৃতি বুঝিলেই অতি সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। 'আসন' প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যায়াম মাত্র। শারীরিক ব্যায়ামে মাংসপেশী সমস্তের দৃঢ়তা এবং পটুতা সাধন হয়; তন্ত্রশাস্ত্রের আসন প্রকরণে অবিকল সেই

কলাই ফলে। যিনি বেদিয়াদিগের বা ইংরাজী সার্কাসের বাজী দেখিয়াছেন, তিনি যদি তন্ত্রশাস্ত্র শুনেন, তবে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন যে, 'বীরাসন' 'বদ্ধ পদ্মাসন' ময়ূরাসন' 'বৃক্ষাসন' 'গরুড়াসন' প্রভৃতি আসন সমস্ত ব্যায়ামকার্য্যেরই বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। তিনি জানিতে পারিবেন যে, 'বীরাসন' 'পদ্মাসন' এবং 'গরুড়াসন' বেদিয়াদিগের 'নোটন্-পায়রা' খেলার এবং ইংরাজদিগের "বল অব্ রবর" হওয়ার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার। 'বৃক্ষাসন'ও-বেদিয়াদিগের দ্বারা এবং সারকসের অনেক বাজীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ঐ আসনে মাথা ভূমিতে রাখিয়া ঋজুভাবে পদদ্বয় উর্দ্ধে রাখিতে হয়—কখন কখন মাথাও ভূমি হইতে উন্নত করিয়া দুই হাতের উপর মাত্র ভর দিয়া পা উচ্চ করিয়া থাকিতে হয়!

পাঠক এক্ষণে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, কি জন্য 'আসনের' অনুকল্প হয় না। 'আসন' ব্যাপারটী 'কুস্তি'। কুস্তির বদল কিছুতেই হইবার যো নাই। তবে আতুর অক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই নিষিদ্ধ মাত্র। তান্ত্রিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিবেন যে, 'আসন'গুলি উদ্ভিদ্ পশ্বাদির অনুরূপতা বই ত নয়—জ্ঞানময় মন্ত্র তাহাদিগের অপেক্ষা উচ্চতর। উচ্চতর পদার্থ অধস্তন পদার্থের অনুকল্প বা প্রতিভূ হইতে পারে না। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য শরীরে খনিজ, উদ্ভিদ, এবং পাশব প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম নিহিত আছে। ঐ সকল ধর্ম্ম সেই শরীরের ভিত্তিমূল; এবং সেই ভিত্তিমূলের দৃঢ়তাসাধন এবং সংস্করণই 'আসন' প্রকরণের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহা উর্দ্ধতন মনুষ্য প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত কোন জ্ঞানময় ব্যাপারের দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। বাটীর বুনিয়াদ বা একতালার মেরামত উপরের দু-তালার বা তে-তালার কোনরূপ মেরামতে নির্ব্বাহ হয় না।

আসন সম্বন্ধে আর একটী নিয়ম আছে। সে নিয়ম এই যে, একই প্রকার আসনে চিরকাল চলে না। একটী আসন অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর একটী করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলগুলি করিতে হয়। আসন প্রকরণে যে এ প্রকার নিয়মের প্রয়োজন, তাহার কারণ বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শরীরস্থ সকল পেশীরই দৃঢ়তা সাধন চাই। এক-

প্রকার আসনে কতকগুলি অঙ্গেরই পেশী দৃঢ় হইল, সুতরাং অপর পেশীর ব্যায়ামসাধনের নিমিত্ত আসনান্তর আবশ্যক।

আর একটী ব্যবস্থা আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আসন করিতে হয়। 'পদ্মাসন' প্রাতে 'ময়ূরাসন' 'গরুড়াসন' সায়াহ্নে, 'বৃক্ষাসন' মহানিশায়। এরূপ ব্যবস্থার কারণ প্রধানতঃ এই বুঝা যায় যে, কোন আসন অর্থাৎ 'ব্যায়াম' শিক্ষিত হইয়া গেলে তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিলে চলে না—চিরকালই সকল প্রকার ব্যায়ামের অভ্যাস রাখিতে হয়। যেমন কুস্তিতে 'ওঠ বইস্' 'ডন' 'মুগুরভাঁজা' প্রভৃতি ব্যাপার ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া শিখা উচিত এবং সকলগুলিরই চর্চ্চা রাখা আবশ্যক, 'আসন'কাণ্ডেও তাহাই। কিন্তু যদি সকল প্রকার আসনেরই অভ্যাস রাখা উল্লিখিত নিয়মের প্রকৃত তাৎপর্য্য হয়, তবে দূরতর করিয়া তাহাদিগের সময় ভেদ করিবার প্রয়োজন কি? উপর্য্যুপরি প্রাতে সায়াহ্নে এবং মধ্যরাত্রিতে সকল প্রকার আসনই করিতে হইবে এই বিধি করিলেই ত হইত। এই কোটির সিদ্ধান্ত তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। শিক্ষা গ্রহণ করাইতে হইলে অভ্যাস করাইতে হয়। অভ্যাসের নিমিত্ত কালাত্যয় আবশ্যক। কোন অভ্যাসকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিতে হইলে তাহার সত্বর পরিবর্ত্তনে অনেক প্রকার দোষ জন্মিয়া যায়।

---

(৪)
মুদ্রা।

যে মূল কারণ হইতে জীবদেহের কোন বিশেষ সৌষ্ঠব জন্মে সেই সৌষ্ঠবের সম্বর্দ্ধন এবং কার্য্যকারিতার অভ্যাসে সেই মূল কারণেরও প্রাবল্য দর্শে। এই তথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই বাহ্যপূজার অঙ্গীভূত জপপ্রণালীতে কর ধরিবার ব্যবস্থা যে কি জন্য হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্যদেহ যে যে লক্ষণে অপরাপর জীবদেহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহার মধ্যে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যে অপর সকল অঙ্গুলির সর্ব্বস্থান স্পর্শ করিতে পারে এই লক্ষণটী অতি প্রধান। উহাই শিল্পপ্রণালীর

নিদানভূত। শিল্পকার্য্য বাহ্যপূজার প্রকারভেদ মাত্র। বিশেষ বিশেষ শিল্পকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলির বিশেষ বিশেষ সমাবেশ হয়। 'কর ধরিয়া' জপ করিতে গেলে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুল্যাদির সম্যক্ সমাবেশ হইয়া থাকে।

কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নয়। কর ধরিয়া জপ করিবার সময় শরীর উন্নত এবং ঋজু রাখিবার বিধি আছে। শরীর উন্নত এবং ঋজুভাবে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম্ম, অন্য কোন জীবের নয়। এই বিধিরও উদ্দেশ্য, শরীরের সেই ভাবের অভ্যাস এবং সম্বর্দ্ধন—যে ভাব বহু জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য শরীরেই বর্ত্তিয়া গিয়াছে। কি কি গুণের প্রাদুর্ভাবে মনুষ্যশরীরের ঐ ঋজু এবং উন্নতভাব জন্মিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে দেহে ঐ ভাবের সম্বর্দ্ধন হয়, সেই দেহে ঐ সকল গুণ বজায় থাকিবে, এবং তাহাদিগের আধিক্য জন্মিবে ইহা সংস্কৃত শিক্ষা-শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ কথা।

ইংরাজীশাস্ত্রজ্ঞ যুবাদিগকে এই সূত্রটী বুঝাইবার নিমিত্ত এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কোমত্ তাঁহার প্রণীত কোন গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দয়াবৃত্তির উত্তেজন এবং পোষণার্থে দরিদ্রদিগের কর্ত্তব্য যে, তাহারা প্রত্যহ 'উপুড়-হস্ত' করিবার মুদ্রাটী অভ্যাস করে; অর্থাৎ যেন কিছু হাতে করিয়া লইয়া কাহাকে কিছু দিতেছে এইরূপ শরীরভঙ্গী করে। কোমত্ বলেন যে, ঐ মুদ্রার প্রয়োগে মাংসপেশী-দিগের এবং তৎসহ স্নায়ুসমষ্টির তথাবৎ সঞ্চালন হইয়া মস্তিষ্কে দয়াবৃত্তির উত্তেজন করিয়া দেয়। অতএব কোমত্ জানিতেন যে দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া স্নায়ুদিগের যেরূপে উত্তেজিত করে এবং সেই স্নায়ুরা মাংসপেশীদিগকে উত্তেজিত করিয়া যে প্রকারে কার্য্য করায় সেই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ তথাবৎ মাংসপেশীর সঞ্চালন হইলে স্নায়ুদিগেরও সঞ্চালন হইয়া মস্তিষ্কে দয়াবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিতে পারে।

অতএব "ঋজু এবং উন্নতভাবে শরীর রাখিয়া কর ধরিয়া জপ করা" নিতান্ত অল্প শিক্ষা নহে। উহা দ্বারা মনুষ্যদেহের প্রকৃতভাব রক্ষা

হওয়াতে সাধারণতঃ মনুষ্যত্বের সম্বর্দ্ধন হয় এবং শিল্পকার্য্যের অভ্যাসে মনুষ্যত্বের যে ভাগ লাগে তাহারও বিশিষ্টরূপ উত্তেজন হয়।

এই পর্য্যন্ত স্থির হইলেই তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতির মধ্যে যে 'মুদ্রা' প্রকরণ বাহ্যপূজার অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে,তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর অঙ্গভঙ্গীমাত্র বলিয়া বোধ হইবে না। প্রত্যুত বাহ্যপূজায় মুদ্রা প্রয়োগের অবশ্য প্রয়োজনীয়তাই সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। মুদ্রা অনেক প্রকার। সে সকলের নাম প্রকৃতি এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য এবং গুরুমুখে শ্রোতব্য। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, প্রচলিত 'মুদ্রা' গুলির অধিকাংশই অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলিদিগের বিশেষ বিশেষ বিন্যাস; এবং অপ্রচলিত অনেকগুলি যাহাতে অপরাপর অঙ্গের বিভিন্নরূপ বিন্যাসের প্রয়োজন হয়, সেগুলি 'আসন' প্রকরণের অন্তর্ভূত।

আর একটী কথা বলিলেই এই প্রকরণের শেষ হয়। মুদ্রা প্রয়োগের অভ্যাস দৃঢ় হইলে পীড়া অল্প হয়, প্রায়ই হয় না এবং যদি হয় তাহার উপশম অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। তন্ত্রশাস্ত্রের এই কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন প্রকৃত যুক্তি দেখা যায় না। প্রত্যুত, শুনা যাইতেছে আজি কালি ইউরোপখণ্ডের মধ্যেও এইরূপ একটী মতবাদ প্রকাশোন্মুখ হইয়াছে, কোন কোন ইউরোপীয় চিকিৎসক আলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি প্রভৃতি সকল প্রকার প্যাথির অপেক্ষা এই ব্যবস্থাই উৎকৃষ্টতর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন রোগ বিশেষে শরীরের বিশেষরূপ সংস্থান এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষরূপ সঞ্চালন করিলে রোগের আশু প্রতীকার হইয়া থাকে, ঔষধাদি সেবনের প্রয়োজন হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রও সাধকদিগের পক্ষে অবিকল তাহাই বলিয়াছেন এবং যাহারা আসন মুদ্রাদি সাধন করে না কেবল তাহাদিগেরই নিমিত্ত ঔষধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন।

---

(৫)

হঠযোগ।

যোগ বলিলে একটি অতি উচ্চ ভাবই বুঝায়,—সর্ব্বময় ঈশ্বরের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার সম্মিলনসাধন বুঝায়। কিন্তু এই বাহ্যপূজা প্রকরণে সে 'সমাধিযোগের' কোন কথা বলা হইতেছে না। সে যোগের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহা হইতে বহুদূরবর্ত্তী যে শরীর-সাধন ব্যাপারকে কোন কোন স্থলে 'যোগ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, সেই 'হঠযোগের' কথাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহাও যথেষ্ট সংযম ও মনোযোগ ও যত্নসাপেক্ষ। 'হঠযোগ' অতি অসামান্য বস্তু। আমার বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশে এই বিষয়ের প্রকৃতভাব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় নাই। ভাবটী এই;—"যেমন ব্যায়ামচর্চ্চা অর্থাৎ আসনাদিদ্বারা শরীরের বাহ্যপেশী সমস্তকে দৃঢ় এবং সবল করিতে হয়, সেইরূপ অন্তত্বক্ এবং পেশীসমস্তকে দৃঢ় এবং সবল করা উচিত এবং তাহা করা যাইতে পারে।" বাস্তবিক অন্তস্ত্বক এবং পেশীদিগের ব্যায়াম সাধনের নামই 'হঠযোগ'। 'হঠযোগ' অনেক প্রকার। তন্মধ্যে 'নেতী' 'ধৌতী' এবং 'বস্তী'র নাম অনেকে শুনিয়াছেন, এবং কেহ কেহ উহাদিগের অনুষ্ঠানও স্ব স্ব চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। 'নেতী'র অনুষ্ঠান নাসিকা দ্বারা জলশোষণ করিয়া সেই জল মুখবিবর দ্বারা নির্গত করা। 'ধৌতী'র অনুষ্ঠান জলপান করিয়া তাহা উদর হইতে পুনর্ব্বার উদ্গীর্ণ করা। 'বস্তী'র অনুষ্ঠান জলের উপর বসিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া জল তুলিয়া লইয়া ক্ষণকাল বিলম্বে সেই জল ঐ দ্বার দিয়া পরিত্যাগ করা। এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠানই লোকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এক্ষণে 'নেতী' ধৌতী' করিতে জানেন যদিও এমন লোক দুই একজন দেখিতে পাওয়া যায়—"বস্তী" করিতে পারেন এমত ব্যক্তি নিতান্তই বিরল। যাহাঁরা এই ত্রিবিধ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরভাগ প্রত্যহ সুচারুরূপে ধৌত করিয়া ফেলিতে পারিবেন, তাঁহারা যে অবশ্যই শ্লেষ্মা, অজীর্ণ এবং উদরাময়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবেন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু 'হঠযোগ' ঐ ত্রিবিধ অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত নহে। হঠযোগ মনুষ্য শরীরের যাবতীয় অনৈচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত করিতে চায়। ইংরাজীবিজ্ঞানশিক্ষিত সকলেই জানেন যে, শরীরে দুই প্রকার পেশী আছে। এক প্রকার পেশী জীবের ইচ্ছাধীন হইয়া কার্য্য করে—যেমন হাতের পায়ের চক্ষুর এবং অন্যান্য অঙ্গের পেশী। আর এক প্রকার পেশী ইচ্ছার অধীন নহে; ইচ্ছা না করিলেও তাহারা আপনাপন কার্য্য করিতে থাকে, যেমন হৃৎপিণ্ডের এবং ফুস্‌ফুসের পেশী; অথবা ইচ্ছা করিলেও কোন কাজ করে না, যেমন কাণের পাতার পেশী। হঠযোগ ঐ সকল অনৈচ্ছিক পেশীকে ইচ্ছাবৃত্তির আয়ত্তাধীন করিবার নিমিত্ত যত্ন করে। "এ কার্য্য অস্বাভাবিক—এ কার্য্য অসাধ্য" যদি এরূপ বলিয়া কেহ নিবৃত্তি করিতে যান হঠযোগ সে কথা শুনে না। —বলে, 'কি স্বাভাবিক আর কি অস্বাভাবিক তাহার কোন ঠিকানাই নাই; যতক্ষণ যাহা না হয়, ততক্ষণই তাহা অস্বাভাবিক—একবার হইয়া উঠিলে আর তাহা অস্বাভাবিক থাকে না।" যদি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের স্বাদগ্রাহী কেহ বলেন যে, "ঐচ্ছিক পেশীগুলিতে যে সকল স্নায়ু আছে, তাহা উর্দ্ধভাগে বৃহন্মস্তিষ্কে পরিণত সুতরাং ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত, আর অনৈচ্ছিক পেশী নিহিত স্নায়ুগুলির মূল পশ্চাদ্ভাগে দীর্ঘীভূত মস্তিষ্কে, সেখানে ইচ্ছাবৃত্তির কার্য্যকারিতা নাই"—হঠযোগ এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতিও দৃক্‌পাত করে না। বলে, "অনৈচ্ছিক পেশীর স্নায়ু দীর্ঘীভূত মস্তিষ্কে যাইবার পূর্ব্বে বৃহন্মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া যায় তবে কেন ইচ্ছাবৃত্তির বশে আসিবে না?—চেষ্টা করিতে করিতে নূতন স্নায়ুরও সৃষ্টি হইতে পারে; এই জন্মেই না হউক, জন্মান্তরেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে,—পুরুষানুক্রমিক চেষ্টায় কতক ফল অবশ্যই পাওয়া যাইবে—কিন্তু চেষ্টা না করিলে ত কখনই হইবে না।" এই সুদৃঢ় অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া হঠযোগ হৃৎপিণ্ডের এবং ফুস্‌ফসের অনৈচ্ছিক পেশীকে ঐচ্ছিক পেশী করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পায়। এই প্রয়াসের নাম 'প্রাণায়াম' 'কুম্ভক' 'সমাধি'। এই অধ্যবসায়ের প্রতি নির্ভর করিয়া 'হঠযোগ' পশ্বাদি সাধন ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হয়। বলে, "মনুষ্যশরীরে

পশ্বাদি-শরীরের অনেকানেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে—পশুদিগের অপেক্ষা মানুষ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কোন কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—তাহা কেন হইতে দিব? সম্যক্‌রূপে মনুষ্যত্বের রক্ষা করিব এবং পশুদিগের ঐ উৎকৃষ্টগুণগুলিও পুনর্ব্বার আপনাদিগের আয়ত্ত করিব। যদি তাহাই না পারি, তবে মনুষ্য বুদ্ধিতে কার্য্য কারণ জ্ঞান কি জন্য উদ্ভূত হইল—মনুষ্যের ইচ্ছাবৃত্তিই বা কেন বলবতী হইয়া অপর সকল বৃত্তিকে আপনার আয়ত্ত করিতে সক্ষমা হইল? যদি পশুসিদ্ধিই অসাধ্য হয়, তবে ঈশ্বর সিদ্ধি কিরূপে সাধ্যায়ত্ত হইবে? হঠযোগের মূল কথা এই—"মানুষকে বড় হইতে হইবে, সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে হইবে, কিন্তু তাহা কি পূর্ব্বার্জ্জিত গুণের লোপ করিয়া হইতে পারে, না সে সমুদায়ের রক্ষা এবং নূতন গুণের উপার্জ্জন করিয়া হইতে পারে? যদি প্রথম প্রণালীতে না হয় এবং দ্বিতীয় প্রণালীতেই কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হয়, তবে দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলা উচিত, এবং পশুদিগের মধ্যে যে সকল গুণ আছে মনুষ্যের নাই—সে গুণগুলি অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাওয়া উচিত।—চেষ্টার অসাধ্য ত কিছুই নাই!" হঠযোগের এই যুক্তিমূলক যে অনুষ্ঠানপরম্পরা তাহার নাম "পশ্বাদিসাধন।"

পাঠক একটু মনোযোগপূর্ব্বক হঠযোগের অধ্যবসায়টীর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। তাহা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্ত্র হইতে এই হঠযোগপ্রসূত সে তন্ত্রশাস্ত্র কেমন উন্নতিশীল পদার্থ।

---

(৬)

পশ্বাদি সাধন।

অনেকানেক পশু শরীরে এমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, যাহার যৎসামান্য চিহ্ন মাত্র নর শরীরে দৃষ্ট হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে, অবস্থাভেদে যে জীবের যে অঙ্গের ব্যবহার অধিক হয়, সেই অঙ্গ সবল হইয়া থাকে—আর যে অঙ্গের ব্যবহার অল্প

হয়, সে অঙ্গ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যাহার ব্যবহার অধিক, তাহার সম্বর্দ্ধন এবং পোষণ, যাহার ব্যবহার অল্প, তাহার দৌর্ব্বল্য এবং ক্ষয় ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। এই নিয়ম জানিয়া মানুষের কর্ত্তব্য কি? কোন "গুণই" ত বিনষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগের সকলকেই জীবৎ বলবান এবং কার্য্যক্ষম রাখা মানুষের কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সকল জীবদেহের গুণ মনুষ্যদেহে আবির্ভূত করিবার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ মানুষের শরীর এমন হইবে যে, হস্তীর বা গণ্ডারের দেহের ন্যায় ইহা শীত বাত তপন-ক্লেশসহিষ্ণু হইবে, বানরের ন্যায় ইহা দীর্ঘ লম্ফ প্রদান ও স্বল্পাবলম্বনে অবস্থান করিতে পারিবে, ভেকের ন্যায় ইহা প্লুতগতিসমর্থ হইবে, পক্ষীর ন্যায় আকাশপথে উড্ডীন হইতে পারিবে, মৎস্যের ন্যায় জলমধ্যে বিচরণ করিবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে,মানুষের ঐরূপ ক্ষমতা আর তাহার শারীরিক কোন পরিবর্ত্তের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিজীবী হইয়াছে। মানুষের এখন যাহা কিছু করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা বুদ্ধিবল প্রয়োগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাই হইবে। মানুষ উড়িবে, কিন্তু বেলুন যন্ত্রের যোগে; নিজ শরীর হইতে পাখা বাহির করিয়া নয়; মানুষ জলতলে বিচরণ করিবে, কিন্তু ডাইবিং বেলের সহায়তায়, আপনার দেহভাগ হইতে স্বতন্ত্র কানক বাহির করিয়া নয়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কথাই যে সফল হইতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তান্ত্রিক 'হঠযোগ' শরীরকোষ হইতেই ঐ সকল অঙ্গের সৃষ্টি বা তাদৃশ অঙ্গের কার্য্যক্ষম অন্তর্বিধ কোন গুণ জন্মাইতে চায়।

এই বিষয়ে হঠযোগের বিচারপ্রণালী কিরূপ, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে। বিড়াল ব্যাঘ্রাদি রাত্রিকালে যেমন পরিষ্কার দেখিতে পায়—মানুষ তেমন পায় না। হঠযোগ বলে মানুষ সাধনা করিলে, অর্থাৎ যথোচিত চেষ্টা করিলে ঐ শ্বাপদদিগের ন্যায় রাত্রিদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে পারে। এ কথা যে অমূলক নয়, তাহা অনেকেই বলিতে পারেন। চৌকীদার প্রভৃতি যে সকল মানুষ রাত্রিতে অধিক চলা ফেরা

করে; তাহারা অন্যের অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক দেখিতে পায়। চক্ষুতে একটী গুণের আধিক্য হয়। উহাদিগের কণীনিকার দ্বার সমধিক পরিমাণে খুলে—সুতরাং অধিক আলোক গ্রহণ করিতে পারায় অন্ধকারেও স্পষ্ট দর্শন জন্মে। হঠযোগ বলে দ্রব্যগুণেও ঐরূপ হইতে পারে—কিন্তু দ্রব্যগুণের সাহায্য গ্রহণ করা অপেক্ষা সাধনের দ্বারা কোন কার্য্যে সিদ্ধ হওয়াই ভাল। বেলুনযোগে উড্ডীন হওয়া অপেক্ষা খেচরীমুদ্রার প্রয়োগ সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, ডাইবিং বেলের যোগে জলতলে বিচরণ করা অপেক্ষা কুম্ভকের সাহায্যে জলস্তম্ভ করা শ্রেয়ঃ।

এখন কথা এই—বেলুন, ডাইবিং বেল প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাদিগের দ্বারা মানুষের প্রয়োজন সাধনও হইতেছে। কিন্তু খেচরী মুদ্রা এবং জলস্তম্ভন ব্যাপার ত কখন দেখা যায় নাই—কেবল কথাতেই শুনা হইয়াছে। কাহার কাহার বিচারে এই কথাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায়—আর বিরুক্তির অবসর থাকে না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই ঐ কথাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না। আরও অনেকগুলি কথা বাকী থাকে। প্রথম কথা এই—পুঁথির লেখা যে মিথ্যা হইবেই হইবে, ইহা কি স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে? দ্বিতীয় কথা এই যে, খেচরী মুদ্রা এবং কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিতে করিতে আকাশ গমন এবং জলতলে বিচরণ হউক বা নাই হউক, শরীরের অন্য কোন বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে না কি? আর তৃতীয় কথা এই, হঠযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা শরীরসাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, যন্ত্রাদি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগ করিতে কি কেহ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখে? যদি তাঁহারাও অন্যান্য বিজ্ঞানবিৎদিগের ন্যায় অবাধে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ বা শক্তির প্রয়োগ করিতে পারেন এমন হয় এবং হঠযোগের অনুষ্ঠানে উত্তমরূপ শরীরসাধন হইতে পারে নিশ্চিত হয়, তবে হঠযোগও কাহার অগ্রাহ্য পদার্থ না হইয়া সকলেরই বিশেষ সমাদরেরই বস্তু হইবে। হঠযোগের পুস্তকোক্ত ফল সমস্ত যদিই অত্যুক্তি দূষিত হইয়া থাকে, তথাপি শরীরসাধনে উহার বিশিষ্ট উপকারিতা ত থাকিতে পারে।

গাছের ডালে পা আটকাইয়া মাথা নীচে করিয়া বাদুড়ের মত ঝুলিতে পারা, পদ্মাসনে বসিয়া বেঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতে পারা— জিহ্বাকে গো জিহ্বার ন্যায় দীর্ঘ করিয়া তদ্দ্বারা দাড়ি ছুঁইতে পারা— শৃগালের ন্যায় অন্ধকার রাত্রিতেও সুস্পষ্ট দর্শনশক্তি লাভ করা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুপ্রকার পশুসাধন আছে। এগুলিকে পশুসাধন বলিতে ইচ্ছা না হয়, বলিয়া কাজ নাই। ব্যায়ামচর্চ্চা এবং ইন্দ্রিয়সাধন বল। কিন্তু বস্তু একই হইবে, পৃথক্ হইবে না।

(৭)

জপপ্রণালী।

মনোবৃত্তি নিচয়ের শক্তিসম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্যক সে সমুদায় সাধনপ্রকরণের অন্তর্ভূত। সাধনের দুই অঙ্গ। এক, যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয়; অপর, যাহাতে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির তেজস্বিতা সম্পাদিত হয়। জপপ্রণালী প্রথমোক্ত অঙ্গের মুখভাগ। ইহা বাহ্যপূজা এবং সাধনের মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জপ কর ধরিয়া করিতে হয়, শরীর ঋজু এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া করিতে হয়, নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া করিতে হয়, এবং অভীষ্ট দেবতার মূর্ত্তি মানসচক্ষে দেখিতে দেখিতে করিতে হয়। কর ধরিয়া এবং শরীর ঋজু এবং উন্নত ভাবে রাখিয়া কেন জপ করিতে হয়, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিবার কারণও সহজে বুঝা যাইতে পারে। দৃষ্টি ঐরূপ করিতে গেলেই চক্ষুর এমত অবস্থান হয় যাহাতে চক্ষুগোলক পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া আইসে। চক্ষুগোলকদ্বয়ের নিকটাবস্থান মনের একাগ্রতার এবং বুদ্ধির প্রবেশচেষ্টার বিশেষ ব্যঞ্জক। সুতরাং অক্ষিগোলকদ্বয়ের নিকটাবস্থানের অভ্যাসে মনের একাগ্রতা এবং বুদ্ধির প্রবেশ শক্তির বৃদ্ধি হইয়া উঠে। অতএব ইহাও এক প্রকার মুদ্রা এবং বাহ্য পূজার অঙ্গ।

কিন্তু, মনে মনে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি স্থির ভাবে রাখিয়া ওষ্ঠে জপ করা, করে সেই জপের সংখ্যা নির্ণয় করা, নাসার অগ্রভাগে চক্ষুর

দৃষ্টি স্থির রাখা এবং শরীর উন্নত এবং ঋজুভাবে রক্ষা করা, এই সকলগুলি কাজ এক সময়ে করিবার আদেশ আছে। এরূপ আদেশে কি বুঝা যায়? এই বুঝা যায় যে, মনুষ্য যে যে বিশিষ্ট শরীর লক্ষণে বিভূষিত-শরীরের সেই সমস্ত লক্ষণ রক্ষা করিয়া জপের দ্বারা কাল এবং সংখ্যার জ্ঞান পরিস্ফুট করতঃ ধ্যানের দ্বারা রূপ এবং আকারের স্থির চিন্তায় নিবিষ্ট হইতে হয়, এবং এই বিধির অনুযায়ী কার্য্য করিলেই "কাল" 'সংখ্যা' এবং 'রূপ' এই তিন বিষয়ে মনের অভিনিবেশ আরম্ভ হইল। এই তিনটি বিষয় যে সমস্ত মানস ব্যাপারের ভিত্তিমূল স্বরূপ এবং সকল মানসব্যাপারেই ঐ ত্রিবিধ জ্ঞান বিশিষ্ট থাকে একথা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। বস্তুতঃ জপ প্রণালীকে যে অন্তর পূজার প্রারম্ভ বলা যায় তাহার কারণ ইহার ধ্যানভাগের গুণে রূপের এবং আকারের স্মরণ শক্তি সম্বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু, বিশুদ্ধ মানসজপে সংখ্যা এবং কালকেও মানস ব্যাপারের আয়ত্ত করিয়া লয়। মানসজপে কর ধরিয়া জপের সংখ্যা রাখিতে হয় না। মনের মধ্যেই একটী বর্ণময়ী মালার সৃষ্টি করিয়া রাখিতে হয় এবং ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে সেই মনোময়ী মালার দ্বারা জপের সংখ্যা করিয়া যাইতে হয়। মানুষের মন কোন এক সময়ে একাধিক কার্য্যে নিবিষ্ট হইতে পারে কি না, এই কথা লইয়া প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন যে এক সময়ে একাধিক কার্য্যে নিবিষ্ট হওয়া মনুষ্য মনের অসাধ্য। কিন্তু তান্ত্রিকেরা এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন মানুষ চলিয়া যাইতে যাইতে কোন বিষয় ভাবিতে পারে, করে জপের সংখ্যা রাখিতে রাখিতে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান করিতে পারে, মুখে কথা বলিতে বলিতে মনে মনে চিন্তা করিতে পারে। তাঁহারা বলেন, সাধন করিলে এক সময়ে দুই কাজ কেন, বহুসংখ্যক কাজ মনুষ্য মনে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। মনোময়ী মালায় জপের সংখ্যা রাখিতে রাখিতে অবিচ্ছেদে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করা অসাধ্য ব্যাপার নহে। প্রথমে কিছুদিন ধ্যানের ভঙ্গ হইতে থাকিবে, কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে আর কোন ব্যাঘাত হইবে না,

দুই কার্য্যই অবাধে এক সময়ে চলিবে। তন্ত্রের মতে কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিলেই তাহার শিক্ষা হয় না, স্মৃতিতে তাহার ধারণা হইয়া গেলেও শিক্ষা হয় না, শিক্ষণীয় ব্যাপারটি যতক্ষণ অভ্যাসগুণে মনের অঙ্গীভূত না হইয়া যায় অর্থাৎ যতক্ষণ বিনা জ্ঞানকৃত মনোযোগেও উহার সাধন না হয় ততক্ষণ শিক্ষার পূর্ণতা জন্মে না। এই কথাটী অতি সার কথা এবং আজি কালিকার শিক্ষাপ্রণালী এই কথাটীর অনুযায়ী কার্য্য না করায় অনেকানেক স্থলে বিপথগামিনী হইতেছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানাচার্য্যেরা এক্ষণে বলিতেছেন মস্তিষ্কের সর্ব্বনিম্ন অর্থাৎ পঞ্চম ভাগে শিক্ষিত বিষয় সমস্ত সংস্কাররূপে নিহিত হয় এবং সেই ভাগের বলে মনুষ্যেরা বিনা মনঃসংযোগেও অভ্যস্ত কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই প্রকৃত তথ্যের অনুসারে যদি এখানকার শিক্ষাপ্রণালী আবার সংঘটিত হয় তবে তান্ত্রিক মতবাদের সমাদর হইলে হইতে পারে। সম্প্রতি সেরূপ হইবার কোন প্রত্যাশাই করা যায় না। এখন শিক্ষকেরা মনে করেন ছেলেদিগকে শিক্ষণীয় বিষয়টী বুঝাইতে পারিলেই হইল, ছেলেরাও মনে করে একবার বুঝিতে পারিলেই সব হইল। এ প্রণালীর শিক্ষায় মনের প্রকৃত শক্তির বড় একটা বৃদ্ধি হয় না। রাশি রাশি গ্রন্থের আলোচনা হয় মাত্র। কোম্‌ত রাশি রাশি গ্রন্থাধ্যয়নে দোষ দিয়াছেন বটে, কিন্তু নব্য শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই যে ঐ রাশি রাশি গ্রন্থ পড়িবার ব্যবস্থা এবং ব্যবহার জন্মিয়া গিয়াছে, সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই। ইউরোপে ঐ দোষ সারিয়া যাইবে কিন্তু আমাদের দেশীয় শিক্ষার যে গুণ ছিল তাহা গিয়া যখন দোষ আসিল তখন তাহার সংশোধন হওয়া অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

---

(৮)

মানস পূজা।

মানস-পূজার ব্যাপারটী বাহ্যপূজা ব্যাপারেরই ছায়া। ইহার মধ্যে যে সকল ভাল ভাল কথা আছে, তাহা শুনিয়া ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবাও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হৃদয়রূপ পদ্মে ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান—নিজ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যে সঙ্কলন এবং তজ্জাত ধ্বনি তাহাই সে দেবতার সন্তোষকর নৃত্য গীত বাদ্য—ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলি ৺দেবপূজার ফুল—কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্ট বৃত্তি সকল দেবপূজার বলি—মানসপূজার এই প্রকার অনেকানেক রূপক বর্ণনায় অতি সুন্দর কবিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি যে অতি পবিত্রভাব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

কিন্তু কবিত্ব তন্ত্রশাস্ত্রের সার পদার্থ নয়। এই মানস পূজার অভ্যাসে কোন্ কোন্ মানসিক শক্তি কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা না দেখিলে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ হয় না। মানসপটে কল্পিত মূর্ত্তির জাজ্বল্যমান চিত্র প্রস্তুত করিবার শক্তি যে মানস-পূজার অভ্যাসে বিশিষ্ট-রূপেই উত্তেজিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। ধ্যানে যে কাজ হয়, মানস-পূজায় তাহা অনেক বাড়িয়া থাকে। তদ্ভিন্ন একটী মহৎ তথ্যেরও জ্ঞান ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে।

ক্রমে এই ভাবের উদয় হয় যে, বাহ্য ব্যাপার এবং আন্তরিক ব্যাপার, ইহারা পরস্পর অভিন্ন—অন্যোন্যের প্রতিরূপ মাত্র। মানস-পূজার একটী প্রধান অঙ্গ ষট্‌চক্র ভেদ। এই ব্যাপারে অনেকটা বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত করিয়া রাখিতে হয়, পর্য্যায়ক্রমে একের পর এক তাহার পর এক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয় মানসচক্ষুর সমক্ষে আনিতে হয়, এবং সমুদায়টীর কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ বা অস্ফুট রাখিবার যো থাকে না। এই অভ্যাস অস্ফুটভাব গ্রহণের নিতান্ত বিরোধী। এবং সেই জন্য প্রকৃতশিক্ষা-গ্রহণের অত্যন্ত উপযোগী। ষট্‌চক্রভেদ অভ্যস্ত হইলে আবছায়া মাত্র দেখিয়া আর তৃপ্ত হইবার পথ থাকে না—পরিষ্কাররূপে কিছু দেখিতে না পাইলে মনের কষ্টানুভব হয় এবং সেই কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে ষট্‌চক্রভেদ সাধন করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রম অর্থাৎ কার্য্যকারণ সম্বন্ধটী অতি স্পষ্টরূপেই হৃদ্গত হইয়া যায়। সকল ব্যাপারই এক মূল শক্তিতে পরিণত এই সংস্কার দৃঢ়তর হইয়া যায়। অতএব অতি সুস্পষ্টরূপে মানসচিত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা—বাহ্যব্যাপারকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেরই প্রতিরূপ স্বরূপ বোধ—

অস্ফুট মানসদৃষ্টিতে অসন্তোষ এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের দৃঢ়তা জ্ঞান, এই সমুদায় মানসপূজা অভ্যাসের ফল। অর্থাৎ মানস-পূজায় মনের স্থিরতা, অভিনিবেশ, সূক্ষ্মদর্শন, তাৎপর্য্য গ্রহণে আসক্তি এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্যক্‌রূপে মার্জ্জিত হওয়াতে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করিয়া তুলে।

তদ্ভিন্ন পূজাবিধির নিত্যত্ব থাকায় মনের চাঞ্চল্য একেবারেই নিবারিত হইয়া যায়। কোন কাজ ভাল লাগিলে করিব, ভাল না লাগিলে করিব না, পূজার অনুশীলনে এই চঞ্চলভাব একবারেই জন্মিতে পারে না। এক্ষণকার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এইরূপ চাঞ্চল্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশে অনেককালের শিক্ষাগুণে বিধিসমূহের নিত্যত্ব উপলব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সেই অভ্যাসের লোপ পাইয়া আসিতেছে। প্রয়োজন পড়িলেই করিব, বিনা সাক্ষাৎ প্রয়োজন বোধে কিছুই করিব না, এই পাশবভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি জানি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সমস্ত বৎসর ধরিয়া প্রায়ই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া পুস্তক আলোচনা করে না; পরীক্ষার সময়ে একেবারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়। পূজাদি নিত্যকর্ম্ম সাধনের প্রণালী যত দিন অবাধে প্রচলিত হইতেছিল, তত দিন এই দোষ জন্মিতে পায় নাই।

যিনিই যাহা বলুন, মানুষ অভ্যাসের দাস বই ত নয়। তন্ত্রশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে এই তথ্য স্বীকার করে এবং তাহা স্বীকার করিয়া মানুষের দেহ বুদ্ধি এবং নীতিকে এমতভাবে গঠিত করিতে চায়, যাহাতে শরীর সর্ব্ব কার্য্যক্ষম, বুদ্ধি তথ্য নিরূপণক্ষম এবং নীতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরাজয়ক্ষম হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের সাধনোপায় অভ্যাসবিধির নিত্যত্ব স্বীকার সাপেক্ষ। যাহারা বিধির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে হতাদর না হয়, তন্ত্র তাহাদিগকেই শিখাইতে পারে। খামখেয়ালির লোকেরা তন্ত্রের শিক্ষার বহির্ভূত পদার্থ—বোধ হয় তাহারা সকল শিক্ষারই বহির্ভূত। পূজা বিধি-পালনের নিত্যত্ব অভ্যাস করায়—এই জন্যই তাহার এত সমাদর।

(৯)

প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম হঠযোগেরই অঙ্গ। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য অতি বৃহৎ। ইহার সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ফুস্‌ফুসের পেশীগুলিকে ইচ্ছাবৃত্তির বশীভূত করা, পরম্পরা উদ্দেশ্য অমরত্বলাভ করা। যদি এই কথা শুনিয়া কেহ মনে করেন যে, প্রাণায়াম যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, লেখক তাঁহাতে কোন আপত্তি করিতে পারেন না। যখন এ পর্য্যন্ত কোন মানুষ কোথাও অমর হয় নাই তখন কেহ অমর হইতে পারে না, এ কথা বলিলে তাহার খণ্ডন করাও যায় না। কিন্তু অমরত্বসাধন না হউক, প্রাণায়াম যোগের প্রভাবে দীর্ঘজীবিতা সাধিত হয়। তাহা হইলেও ত অনেক হইল বলিতে হইবে। অতএব দেখা যাউক, প্রাণায়াম দীর্ঘজীবিতা সাধনের উপযোগী হইতে পারে কি না। প্রাণায়াম যোগের প্রথম প্রণালী এই।—নাসিকারন্ধ্রের এক মুখ এক অঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া তাহার অপর মুখ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ আস্তে আস্তে করিবে; মনে মনে মন্ত্রজপ করিতে করিতে করিবে; পরে নাসিকার উভয় রন্ধ্রই অঙ্গুলিদ্বারা বন্ধ করিয়া যত বার মন্ত্রজপ করিতে করিতে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলে তত বার সেইরূপে মন্ত্রজপ করিবে; অনন্তর নাসিকার যে রন্ধ্র প্রথমে বন্ধ করিয়াছিলে, তাহা উন্মুক্ত করিয়া যত বার মন্ত্রজপ সহকারে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলে, তত বার সেই প্রকারে মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিশ্বাস ছাড়িবে। মনে কর, যেন কোন মন্ত্রের দশবার করিয়া জপ করিতে করিতে এইরূপ প্রাণায়াম করিয়াছ এবং কয়েকদিন তাহা করায় ঐ কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে দ্বাদশবার করিয়া আরম্ভ কর। এবং তাহাও অনায়াসসাধ্য হইলে অল্পে অল্পে মন্ত্রজপের সংখ্যা বাড়াইতে থাক। মনে কর ক্রমে এক শত বার জপ করিতে পারিলে। তাহা পারায় তোমার কি হইল?—এই হইল যে, প্রথমে যতক্ষণ ধরিয়া দম লইতে এবং দম রাখিতে পারিতে এখন তাহার দশ গুণ অধিককাল ধরিয়া পার, তাহা কেন

পার? তোমার ফুস্‌ফুসের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার পরিচালক পেশীগুলি দৃঢ় হইয়াছে এবং তাহার অন্তঃস্থিত সকল বায়ুকোষগুলির কার্য্যকারিতা সম্বর্দ্ধিত হওয়াতে তাহারা সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। ফুসফুসের বল এইরূপে বর্দ্ধিত হওয়াতে আর কি হইয়াছে? হৃৎপিণ্ড হইতে সমধিক পরিমাণে রক্তস্রোত আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত হৃৎপিণ্ডকেও অধিক রক্ত ধারণ করিবার উপযোগী হইতে হইয়াছে। উহাও পূর্ব্বাপেক্ষায় বৃহত্তর হইয়াছে। লোকেও তোমাকে দেখিয়া বলে যে পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার ছাতি ফুলিয়া উঠিয়াছে। যাহাদিগের সহিত একত্র হইয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিতে এবং সাঁতার দিতে বা ডুবোডুবি খেলিতে তাহারা আর কেহ তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না। তুমি অধিকক্ষণ সাঁতার দিতে পার—অধিকক্ষণ ডুব দিয়া থাকিতে পার—শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড় না। বিশালবক্ষ, পরিশ্রমক্ষমতা, অক্লান্তি—এগুলি যদি বলের লক্ষণ হয়, এবং বলবত্তা যদি আয়ুষ্মত্তার লক্ষণ হয় তবে প্রাণায়াম যোগ তোমাকে বলবান এবং দীর্ঘায়ুঃ করিয়াছে বলিতে হইবে।

প্রাণায়ামযোগটী যেরূপে বর্ণিত হইল, এরূপে সকলেই করিতে পারে—জপের দ্বারা সময় ঠিক রাখিতে নিতান্তই অনিচ্ছা হয়, ঘড়ি ধরিয়া করিলেও এ যোগের কোন হানি হইবে না। কিন্তু ইহা নিত্য করা চাই—অল্পে অল্পে করা চাই এবং নিশ্বাস গ্রহণ, তাহার ধারণ এবং রেচন সমান সময়ে হওয়া চাই। এ সকল নিয়ম ব্যতিক্রম করিলে উপকার না হইয়া অপকারের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

কিন্তু প্রাণায়ামযোগে জপের সংখ্যা যদি পরিমিত না হইয়া আরও অধিক হয়, মন্ত্রের পূর্ণমাত্রা পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে আর ওরূপে নাসিকারন্ধ্রকে অঙ্গুলি দ্বারা সম্বদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয় না। নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া তাহার সংরোধ করিতে হয় এবং সেই অবস্থায় পূর্ণমাত্রা জপ করিতে হয়। এইরূপ কর্ম্মকে 'কুম্ভক' বলে। আমি এই ব্যাপারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই। তবে ইহার

বিবরণ শুনিয়াছিলাম বলিয়া কুমার-সম্ভবে মহাদেবের তপশ্চরণ বর্ণন অতি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

পর্য্যঙ্কবন্ধ-স্থির-পূর্ব্বকায়
ঋজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসং
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিষ্কম্প মিব প্রদীপং॥

'কুম্ভক' করিয়া যদি কেহ যথেচ্ছকাল থাকিতে পারে, তবে সেই অবস্থাকে 'সমাধি' বলা যায়। সত্যসত্যই কেহ 'সমাধি' করিতে পারেন কি না, অর্থাৎ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, হৃৎপিণ্ড স্থগিত করিয়া জীবন্মৃতবৎ হইয়া কেহ থাকিতে পারেন কি না, সে বিষয়ের অনুসন্ধান করা অসাধ্য। অনেক জীবদেহের ওরূপ অবস্থা আপনা হইতেই হয়। রণজিৎ সিংহের নিকট একজন সন্ন্যাসী দশ মাস ঐ ভাবে ছিল বলিয়া কোন কোন ইংরাজী পুস্তিকায় লিখিত আছে। কলিকাতার নিকট ভূকৈলাস নামক স্থানে একজন মহাপুরুষ সমাধি-যোগে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি এতদ্দেশে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সমাধিযোগ লাভ হউক বা নাই হউক সামান্য প্রাণায়াম যোগের যে শুভফল আছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ণাভিষেক।

(১০)

পূর্ণাভিষেক সংস্কারে কুলাচারপরায়ণ গুরুর একান্ত আবশ্যকতা। যদি অকুলাচার গুরুর স্থানে পূর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ হইয়া থাকে, তবে পূর্ণাভিষেকের সময় কুলাচারী গুরুর স্থানে আবার নিজ মন্ত্র শ্রবণ করিতে হয়। সেই কৌল গুরুকেও অপরাপর কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এই সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। পূর্ণাভিষেকের

শেষভাগে যে কয়েকটী উক্তি প্রত্যুক্তির বিধান আছে, তাহার তাৎপর্য্য অতি অসামান্য।

শিষ্য গুরুকে বলিবেন—

শ্রীনাথ জগতাংনাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরামৃত প্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথং॥

হে শ্রীনাথ! হে জগন্নাথ! হে দয়াময় মদীয়নাথ! আপনি পরমামৃত (ব্রহ্মানন্দপ্রদ মন্ত্র) প্রদান করিয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ করুন।

গুরু বলিবেন—

আজ্ঞা মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতং॥

হে প্রত্যক্ষ শিবরূপী কৌলগণ! আপনারা আদেশ করুন, আমি বিনীত সৎ শিষ্যতে পরমামৃত প্রদান করি।

কৌলেরা বলিবেন—

চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সচ্ছিষ্যং দেহ্যস্মৈকুলামৃতম্॥

হে কৌল কমল-ভাস্কর পরমেশ্বর! হে ষট্‌চক্রেশ! আপনি ঐ সৎশিষ্যকে কুলামৃত প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

পূর্ণাভিষেক হইলে নূতন নামকরণ হয়। সেই নামের শেষভাগে 'আনন্দনাথ' এই পদদ্বয় সংযুক্ত হইয়া থাকে। পূর্ণাভিষেক ব্যতিরেকে কেহ কুলাচারী হইতে পারেন না।

পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তির পক্ষে 'কর্ম্মত্যাগে' এবং 'কর্ম্মের অনুষ্ঠানে' পার্থক্যবোধ পরিত্যাজ্য। 'ঈশ্বর পূজা' যে 'লোকের হিতচেষ্টায়' পর্য্যবসিত ইহাই নিরন্তর চিন্তনীয়—এবং চক্রেশ্বর গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংন্যাস।

(১১)

তন্ত্রশাস্ত্রমতে আশ্রম প্রধানতঃ দুই প্রকার; গার্হস্থ্যাশ্রম এবং ভৈক্ষুকাশ্রম। কিন্তু এই দুই আশ্রমের বিভিন্নভাব পরস্পরে ভিন্নরূপে অনুস্যূত হওয়ায় অন্যান্যরূপ আশ্রম জন্মে। যথা—

(১) গৃহস্থাশ্রমী যদি ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক হয়েন তাঁহাকে যতি বা সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাদৃশ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মাবধূত বলা যায়।

(২) গৃহস্থাশ্রমী পূর্ণাভিষিক্ত হইলে তাঁহাকেও সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—তাঁহাকে শৈবাবধূত বলে।

(৩) ব্রাহ্মাবধূত এবং শৈবাবধূত পরিব্রাজক হইলে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে পরমহংস বলে।

গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতেই হইবে, তন্ত্রশাস্ত্রে এরূপ কোন বিধি নাই। তবে যদি কেহ স্বেচ্ছাতঃ পরিব্রাজক হইতে চাহেন, তাঁহাকে কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার বিধান আছে। পিতা মাতা ভার্য্যা শিশুসন্তান অথবা অন্য কোন অবশ্যপোষ্য বিদ্যমান থাকিলে কেহ পরিব্রাজক হইতে পারেন না। যাঁহার ঐ সকল নাই তিনি স্বজন এবং স্বগ্রামনিবাসীদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন। তাঁহাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী কোন শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর নিকটে গিয়া আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। শ্রাদ্ধবিশেষ দ্বারা পিতৃঋণ দেবঋণ এবং ঋষিঋণ পরিশোধিত করিতে হয়, হোম করিয়া শিখা এবং যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হয় এবং পরিশেষে পিতৃবর্গের সহিত আপনারও পিণ্ডদান গুরুচরণে প্রণত হইয়া করিতে হয়। *গুরু কি করিবেন তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত হইবে—

* এইরূপ শিক্ষায় শরীর ও মন দৃঢ় ও সংযত হইলে, ইচ্ছাশক্তি অতীব তেজস্বিনী হইলে—নিজের পিণ্ডদান করিয়া—প্রকৃতই ধীর গম্ভীর ভাবে জীবন উৎসর্গ পূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞায় যে ব্যক্তি—শুধু মুখে নয় সমস্ত প্রাণের বলের সহিত "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যংবা সাধয়েয়ং" বাক্য উচ্চারণ করিয়া কোন সৎকার্য্যে লোকহিত জন্য অগ্রসর হয় তাহার অসাধ্য কিছু আছে কি? ঐরূপ কয়েক শত লোক যে সমাজে প্রস্তুত হয় সেই সমাজই অক্লেশে মহামহিমান্বিত হইয়া পড়ে।

গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিমং
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোহং বিভাবয়।
আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসা গুরুং
নমস্তভ্যং নমোমহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমোনমঃ
ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোস্তুতে ॥

অর্থাৎ গুরু দণ্ডবৎপ্রণত শিষ্যকে উত্তোলন করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে এই কথা বলিয়া দিবেন—"হে মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি নিজেকে 'আমিই সেই' মনে করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদ চিন্তা কর।" শিষ্য তখন গুরুকে আত্মস্বরূপ মনে করিয়া অবনতশিরে এই বলিয়া প্রণাম করিবেন—'আপনাকে প্রণাম করি, আমাকে প্রণাম করি, আপনাকে ও আমাকে উভয়কেই প্রণাম করি, আপনিই "সেই" সেই, "আপনিই", বিশ্বরূপ আপনাকে প্রণাম।"

কুলাচার।

(১২)

কুলাচার সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের আদেশগুলি পাঠ করিলে নিতান্তই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

প্রথম আদেশ এই যে, কুলাচারে বীরভাব ধারণ করিতে হয়, পশুভাব এবং দিব্যভাব এ সময়ের উপযোগী নহে।

দ্বিতীয় আদেশ এই যে, যখন দেশে অধর্ম্মের আধিক্য, সামাজিক বন্ধনের শৈথিল্য, রাজা বৈদেশিক এবং লোকের অন্ন কষ্ট এবং পরস্পরে মনোবাদ, তাদৃশ কালেই সত্যনিষ্ঠ সত্যব্রত সাধুশীল ব্যক্তিরা কুলাচারী হইবেন।

তৃতীয় আদেশ এই, অপরাপর সময়ে কুলাচার গুপ্তভাবে নির্ব্বাহ করা বিধেয়, কিন্তু কলিজনিত দোষ প্রবল হইয়া উঠিলে কৌলাচার গোপন করায় দোষ বই গুণ নাই।

কুলাচারীর পক্ষে প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থান, গুরুর মানস পূজা, মলাদি ত্যাগ, প্রাতঃস্নান, আসন, প্রাণায়াম, ইষ্টদেবতার সাঙ্গ বাহ্য পূজা,

সাঙ্গ মানসপূজা, পঞ্চতত্ত্বের শোধন এবং তদনন্তর সস্ত্রীক ও সবন্ধুক হইয়া পান ভোজন করিবার ব্যবস্থা।

তন্ত্রে কুলশব্দের অর্থ প্রকাশিত আছে। কুল শব্দে নয়টী পদার্থকে বুঝায় (১) জীব (২) প্রকৃতিতত্ত্ব (৩) দিক্ (৪) কাল (৫) আকাশ (৬) ক্ষিতি (৭) অপ্ (৮) তেজ (৯) বায়ু। এই নবসংখ্যক পদার্থে কল্পশূন্য যে ব্রহ্ম-বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধির অনুচারিণী যে আচরণ তাহার নাম কুলাচার।

চক্রানুষ্ঠান।

(১৩)

চক্রানুষ্ঠান কৌলিকাচারের শিরোভূত ব্যাপার। চক্র প্রধানতঃ দুই— তত্ত্ব চক্র এবং ভৈরবী চক্র। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই তত্ত্ব চক্রের অনুষ্ঠানে অধিকারী। এই চক্রে যাঁহারা প্রবেশ করিবেন তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ কুলভেদ আচারভেদ থাকিবে না। সকলেই পরস্পর সমকক্ষ ভাবে একত্র হইয়া আপনাদিগের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা হইবে তাঁহাকেই চক্রেশ্বররূপে বরণ পূর্ব্বক সর্ব্বমধ্যস্থলে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়া তাঁহার অনুমত্যনুসারে কুলপূজা নির্ব্বাহপূর্ব্বক পান ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

ভৈরবী চক্রের নিয়মও ঐ প্রকার। তবে এই চক্রে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা অপেক্ষা করে না এবং সেই চক্রের নায়ক ব্যক্তিবিশেষেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু এ চক্রেও জাতি কুল এবং আচারের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য নিষিদ্ধ। চক্রপ্রবিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই ব্রাহ্মণ। চক্র হইতে নিবৃত্ত হইলেই তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ পুনঃপ্রবিষ্ট হইতে পারে। তন্ত্রের শিক্ষায় যেখানে জাতিভেদ নাই সেখানে ব্রাহ্মণ উপবীত ফেলিয়া শূদ্র হয় না। সেখানে উচ্চকার্য্যে একত্রীকৃত সকলেই পবিত্র ও দ্বিজোত্তমের অবস্থায় উন্নত। সকল উচ্চ কার্য্যেই এদেশীয় সকল বর্ণের লোকদিগের সম্মিলনজন্য ইহা কি সুন্দর ব্যবস্থা! সম্মিলন জন্য ব্রাহ্মণ শূদ্রে একত্রে খাইবার বা ছেলে মেয়ের বিবাহ দিবার প্রয়োজন

নাই। দেবীর কার্য্যসাধন জন্য "যখন" সকলে সম্পূর্ণ সম্মিলিত হইবে "তখন" তোমরা সকলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ!

পঞ্চ-মকার।

(১৪)

পঞ্চ-মকারের কথা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা পঞ্চ-মকারের উল্লেখ করিয়া ঐ শাস্ত্রের নিন্দা করেন, যাঁহারা তান্ত্রিক প্রণালীর অনুকূল পক্ষ তাঁহারা অনেকেই পঞ্চ-মকারের কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। গুরুমুখে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, পঞ্চ ম-কারের যথাযথ প্রয়োগে গুণ আছে, দোষ নাই এবং উহার প্রকৃত তাৎপর্য্যও শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত আসন মুদ্রা পূজা ধ্যান সাধনাদির সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলেই বোধ হইবে যে, এই শাস্ত্র অপরাপর ধর্ম্ম শাস্ত্রের ন্যায় কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহে শিক্ষা প্রদান করিয়া নিবৃত্ত হয় না। তন্ত্র, মনুষ্যের দেহ, মন, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, ব্যবহার, জ্ঞান, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দেয়। তন্ত্র, মনুষ্যের ধর্ম্মকে স্বতন্ত্র, জ্ঞানকে স্বতন্ত্র, দৈহিক কার্য্যকে স্বতন্ত্র, সামাজিক ব্যবহারকে স্বতন্ত্র এবং উহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবিহীন এরূপ মনে করিয়া শিক্ষাদান করে না। মানুষ এক এবং যাহার যাহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ তাহাও সুতরাং এক। অতএব প্রকৃত শিক্ষার অধীনে উহারা একদিকগামী এবং পরস্পরের বলবর্দ্ধক হইয়াই চলিবে, বিভিন্ন দিক্‌গামী হইবে না। কেহ কাহাকে দূষিত বা দুর্ব্বল করিবে না, ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত। তন্ত্র নিয়ম করাইবে, সংযম করাইবে, ইন্দ্রিয়দমন শিখাইবে, লোভ নিবৃত্ত করাইবে, ভয় উৎসাদিত করিবে, কামকে পরাজয় করাইবে। কিন্তু এ সকল কেন করাইবে? কেবল ইচ্ছাবৃত্তির সম্যক বলবত্তা সাধন করিবার নিমিত্ত—ইন্দ্রিয় গ্রামকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নয়—নিশ্চেষ্ট হইবার জন্য নয়, জড় ধর্ম্ম পাইবার অভিলাষে নয়। কিন্তু

উপায়ে মনুষ্যের আয়ু, আরোগ্য ও তেজ বল বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কি উপায়ে মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি প্রখরা হয়, কি উপায়ে মনুষ্য বলবান বিশুদ্ধচিত্ত অন্যের হিতসাধনে নিরত এবং মাতা পিতার প্রিয়কারী ও স্বদারনিষ্ঠ এবং দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র স্বজনাদির প্রতিপালক হয় এবং কিরূপে তাহারা প্রকৃত পরম জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া "আদর্শ মনুষ্যত্ব" বা নরদেহেই দেবত্ব বা মুক্তপুরুষত্বসম্পন্ন হইতে পারে এই সমুদায় উপায় ব্যক্ত করাই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তন্ত্রের এইরূপ উদ্দেশ্য অতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তও যে এই সকল উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, একথাও তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টাভিধানে কথিত হইয়াছে। তবেই বলিতে হইল যে তন্ত্রশাস্ত্র অন্যান্য আর্য্যশাস্ত্রের ন্যায় প্রবৃত্তি মার্গের নিষেধক এবং নিবৃত্তি মার্গের প্রবর্ত্তক নহে। অপর সকল আর্য্য শাস্ত্র হইতে তন্ত্র শাস্ত্রের এই বৈচিত্র্য। ইহা প্রবৃত্তির বিনাশ সাধনের নিমিত্ত যত্ন করে না। ইহা নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন করিয়া প্রবৃত্তিকেই চির বলশালিনী করিবার চেষ্টা করে। পঞ্চ মকারের সামান্য লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ যে নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। আবার তন্ত্রশাস্ত্র যে সকল প্রকার অনুষ্ঠানকেই এক মাত্র ইচ্ছাবৃত্তির তেজস্বিতা এবং স্বাধীনতা সাধনের সহকারী করিতে চায় ইহা মনে করিলেই, পঞ্চ মকার যে অবশ্যই কোন গূঢ় তাৎপর্য্যেরও সূচক হইবে তাহাও সম্ভবপর বোধ হইবে।

বস্তুতঃ যাহাকে পঞ্চ ম-কার বলে তাহাকেই পঞ্চ তত্ত্বও বলে। আদ্য ম-কার মদ্য, উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ অগ্নি। দ্বিতীয় মকার মাংস উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ বায়ু। তৃতীয় মকার মৎস্য উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ জল। চতুর্থ মকার মুদ্রা উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ পৃথিবী। পঞ্চম মকার মৈথুন, উহার তত্ত্বানুযায়ী অর্থ আকাশ।

সকল আর্য্য শাস্ত্রের বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে একটী মূল সিদ্ধান্ত মনে মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়। সে মূল সিদ্ধান্তটী এই যে মানুষের ধর্ম্ম মানুষের সামান্য প্রাকৃতিক অনুষ্ঠান সকল হইতে পৃথক্ভূত নয়। বার তিথি ঋতু ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিবার বিধি আছে সত্য কিন্তু সে সকল বিধি কেবল নিয়ম রক্ষার অভ্যাস করাইবার নিমিত্ত—বাহ্য পূজা মানস পূজা প্রভৃতির বিধি আছে সত্য কিন্তু সে সকল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত—আহার বিহারাদিও ধর্ম্ম নিয়ম দ্বারা দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য কিন্তু সে সকল নিয়মের উদ্দেশ্য পশুভাবের একান্ত অপনয়ন।

তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকৃতিতে এই বৈচিত্র্য কি জন্য জন্মিয়াছে? ইহা যে আর্য্যজাতীয়দিগের সম্বন্ধে নিতান্ত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, একথা বলা যায় না।

প্রাচীন বেদ শাস্ত্রের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রিয়াসাধন এবং ঐহিক সুখলাভই বৈদিক ঋষিদিগের বিলক্ষণ অভিলষিত ছিল। প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা যেরূপে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং তাঁহারা দেবতাদিগের স্থানে যে সকল ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত বরপ্রার্থনা করিতেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ সময়ে প্রবৃত্তির একান্ত নিরোধ আর্য্যজাতীয়দিগের অভিমত ছিল না। বস্তুতঃ অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপে নিবৃত্তিপূত প্রবৃত্তির প্রাবল্য আর্য্যদিগের মধ্যে হইয়াছিল। তাহার পর জ্ঞানের চর্চা, ভক্তির চর্চা, যোগ সমাধির অনুষ্ঠান, প্রবৃত্তির একান্ত নিরোধ, নিশ্চেষ্টতা দৌর্ব্বল্য এবং অধঃপাত। সেই অধঃপাতের পর তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাব, সুতরাং যাহাতে আর্য্যজাতীয়দিগের পুনর্ব্বার উত্থান সাধন হয় তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রকারদিগের অবশ্য অভিলষিত হইয়া থাকিবে। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে আবার উন্নতির অভিলাষ, আবার প্রবৃত্তির উত্তেজনা, আবার নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংস্করণের উপায়ের ভাবনা। এই জন্যই বঙ্গ সমাজের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারকর্ত্তা রামমোহন রায় তন্ত্রবিশেষকেই অবলম্বস্বরূপ করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই জন্যই তন্ত্রোক্ত অনেক কথার সহিত বৈদিক উপনিষদাদির ঐক্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। আধুনিক ব্রাহ্মেরা জানুন বা নাই জানুন, তন্ত্রশাস্ত্রই তাঁহাদিগের মতবাদের ভিত্তিমূল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মসংহিতায় এমন কোন সার কথা নাই যাহা তন্ত্র শাস্ত্র হইতে সমুদ্ধৃত

নহে। নব্য ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের শাস্ত্রকে প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ হইতে পৃথক্‌ভূত মনে করিয়া যে আপনাদিগের পদ্ধতির প্রকৃত ভাব রক্ষা করিলেন, কি জাতীয় ভাবের দৃঢ়তা সাধন করিলেন, কি সেই পদ্ধতিরই সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নতার অনুকূলতা করিলেন এরূপ বোধ হয় না। এই অসংখ্য দলে বিভক্ত আন্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন পরস্পর প্রতিকূলাচারী ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-মাৎসর্য্য-সমাকুল হিন্দু সমাজে অকারণে আর একটী দল বাড়াইলেন বলিয়াই ত বোধ হয়। শাস্ত্রে অতি সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে আগম বা তন্ত্রেরই প্রাধান্য—অন্য কোন বিধানের নয়। শাস্ত্রে ইহাও সুব্যক্ত আছে যে তন্ত্রের মধ্যে তন্ত্রবিশেষই সর্ব্ব প্রধান। ঐ তন্ত্রটী দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, তাহা হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অনার্য্যভাবে কলুষিত করিয়া কেন হিন্দু সমাজকে দুর্ব্বল করা হইতেছে? কি জন্য সনাতন ধর্ম্মের আধুনিকতা প্রতিপাদন করা হইতেছে? ইহার আনুপূর্ব্বিকতার লোপ করিয়া কি সদভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে? কোন কালে কোন দেশে কি ধর্ম্ম সংস্কার এরূপে সিদ্ধ হইয়াছে বা হইতে পারে? মানুষ ঐতিহাসিক জীব। মানুষ একেবারে পূর্ব্বভাব পরিহার করিয়া নূতন ভাব পরিগ্রহ করিতে পারে না। যেমন চলিবার সময় একপদ অগ্রবর্ত্তী হয় অপরপদ পূর্ব্বস্থানেই স্থির থাকে, সেইরূপ সংস্কার কার্য্যেও যে ভাব ছিল তাহা স্থিরতর রাখিয়া নূতন ভাবে অগ্রসর হইতে হয়। ব্রাহ্মেরা ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দু সমাজে সর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক উৎসাহশীল, তাঁহাদিগেরই মনে জাতীয় উন্নতি সাধনের ইচ্ছা জাগ্রৎ হইয়াছে, এক আধটুকু পরস্পর বন্ধনের চিহ্নও তাঁহাদিগেরই মধ্যে দেখা দিয়াছিল,—আর কি বলিব? তাঁহারা যে তন্ত্র শাস্ত্র হইতে আপনাদিগের মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সম্যক্ প্রাধান্য স্বীকার করুন সেই শাস্ত্র যে গুরু গ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধ করুন, স্ব স্ব প্রাধান্যের ইচ্ছা একেবারেই পরিহার করুন। তাহা করিলেই সাধারণ হিন্দু সমাজের গ্রাহ্য এবং সেই সমাজের অভাব মোচনের অভিপ্রায়ে সভূত এমন একটী সংস্কৃত শাস্ত্র ব্রাহ্মদিগের

দ্রাবিড়দ্বয় মূল হইবে, বশ্যতাই যে একতার মূল তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইবে এবং সম্মিলন যে প্রকৃত প্রাধান্য সাধনের একমাত্র উপায় তাহাও সপ্রমাণ হইয়া উঠিবে। উহাঁরা ইহা না করিতে পারেন সাধারণ হিন্দু সমাজ হইতেই অপরে সেই কার্য্যে যে অগ্রসর হইবে তাহাতে আস্তিক মাত্রেরই সন্দেহ নাই।

মদ্যমাংসাদি সেবন সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রের প্রকৃত অভিমত মনুসংহিতার একটী বচনে সমুদ্ধৃত আছে—

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

তন্ত্রশাস্ত্রও অবিকল তাহাই বলে, "প্রায়" বলিলাম না এই জন্য যে "একেবারে" প্রবৃত্তির নিরোধ প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রেরও উদ্দেশ্য ছিল না।

"সৌত্রামণ্যাং সুরাম্পিবেৎ" এই বিধি, 'যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ' এই প্রামাণিক বাক্য এবং 'ঋতৌভার্য্যামুপেয়াৎ' এই সকল অনুজ্ঞা বৈদিকশাস্ত্র সম্মত সুতরাং একেবারে প্রবৃত্তির নিরোধ বৈদিক কালের ব্যবস্থা নয়। অনুষ্ঠান বিশেষ সহকারে, চিত্তের সংযম সহকারে, মনের বিকৃতি নিরাকরণ সহকারে দেশ কাল পাত্রের যথাযথ বিচার সহকারে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুযায়ী আচরণে বহুল শুভ ফল সমাহিত হয় ইহাই মনুবচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য, তন্ত্রের ব্যবস্থাও তাই। আয়ুস্তেজ বলবুদ্ধি বিদ্যাশ্রী সম্বর্দ্ধনকর পঞ্চ-মকারের অনুষ্ঠান দূষ্য নহে। পূজাবিশেষ, অনুষ্ঠানাদিবিশেষ, ও ভাবনাদিবিশেষ সহকারে পঞ্চ-মকারের প্রয়োগে উপকার আছে। কিন্তু সেই উপকার লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে "বিজিতেন্দ্রিয়" কুলাচারী হইতে হয়। অসংযত অনধিকারীর উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারেই তন্ত্র শাস্ত্রের নিন্দা হইয়াছে।

দেবমূর্ত্তি।

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় অতি "স্থূল স্থূল" রূপে তৎসমুদায়ের নাম প্রকার এবং তাৎপর্য্য বলা হইয়াছে। এক্ষণে তন্ত্রবর্ণিত দেবমূর্ত্তিগুলির এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগুলির প্রকৃত এবং

উদ্দেশ্য অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ যত্ন করা আবশ্যক। কাহার কাহার বিবেচনা এরূপ যে, তাৎপর্য্যপ্রকাশে শাস্ত্রের প্রতি লোকের ভক্তি যায়, আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিলে শাস্ত্রের প্রতি প্রকৃত ভক্তির উদয় হইতেই পারে না। ইউরোপ খণ্ডের এক সম্প্রদায় খৃষ্টানেরা কহেন বলেন যে, প্রচলিত দেশভাষাগুলিতে বাইবেল গ্রন্থের অনুবাদ হওয়ায় ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে এবং ধর্ম্মবিষয়ে বিচার প্রবৃত্তিই বাড়িয়াছে। অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে, বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে বলিয়াই ইউরোপ খণ্ডের ধর্ম্মান্ধতা দূর হইয়াছে। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব কোন সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের একটি দুরূহ ভাগ বাঙ্গালায় অনুবাদিত করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার একজন সতীর্থ তাঁহাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দিলেন। আমারও একজন পরমাত্মীয় ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছেন যে, দেবমূর্ত্তি সকলের তাৎপর্য্য প্রকাশে কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত অপকারেরই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পক্ষান্তরে অপরাপর অনেকে বলেন যে শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ বুঝিবার চেষ্টা করায় লোকের অবকাশ এবং স্পৃহা ন্যূন হইয়া যাইতেছে, অতএব এ সময়ে তাহাদিগের শ্রমবিমুখতা দূর করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রের যে গূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহা কতক কতক দেখাইয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করা আবশ্যক। যাঁহারা স্বজাতীয় শাস্ত্র সমূহে স্বতঃই ভক্তিমান হইতে অভিলাষ করেন, কেবল বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে তাহা সমগ্র করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের কিছু সহায়তা করার প্রয়োজন আছে। ততটুকু করিলে অনধিকারীকে গূঢ় উপদেশ দেওয়ার দোষ ঘটে না—প্রত্যুত তাহা না করিলে বিদ্যার উপযুক্ত প্রকারে ব্যাঘাত ঘটে। দেবমূর্ত্তির রূপাদির যে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য্য আছে তাহা তন্ত্র শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং সরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌॥

অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্ত মিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্ব্বহু সমাধিভিঃ।
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যান প্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥ *

এই কয়েকটি শ্লোকে দেবমূর্ত্তিকল্পনার প্রয়োজনাদি পরিষ্কার-রূপেই বলা হইয়াছে, এবং স্থূল ধ্যান যে সূক্ষ্ম ধ্যান বুঝাইবার নিমিত্তই কথিত হইয়াছে, আর গুণ এবং ক্রিয়ার অনুসারেই যে স্থূল রূপের কল্পনা হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। **

সম্পূর্ণ

---

* সরূপ ও অরূপ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার। তোমার অরূপ ও অবাঙ্মনসোগোচর ধ্যান অব্যক্ত এবং সর্ব্বতোব্যাপ্ত। উহা এই এই প্রকার ইত্যাদি বলা যায় না। উহা অগম্য, কেবল কৃচ্ছ্রসাধ্য বহু সমাধি দ্বারাই যোগীদিগেরই গম্য হয়। মনে যাহাতে উহার ধারণা হয়, যাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐ সূক্ষ্মধ্যানের বোধ জন্মে, তজ্জন্য স্থূল ধ্যানের কথা আমি তোমাকে বলিতেছি। কালের মাতা, মহাদ্যুতি, অরূপা কালিকার রূপকল্পনা। গুণক্রিয়ানুসারেই করা হইয়া থাকে।

** আচার প্রবন্ধে কতক দেবমূর্ত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণই ছিল।